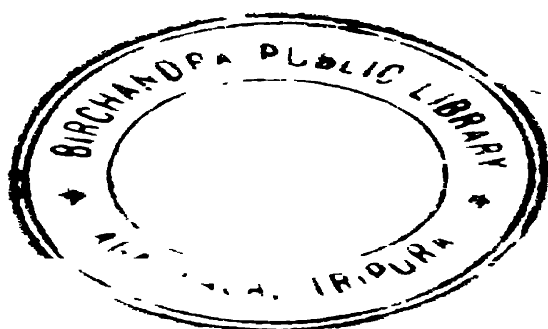
সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রনাথ রায়



সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী। কলকাতা ৬

স্বত্ব : সত্যেন্দ্রনাথ রায়

প্রথম প্রকাশ : ১ আষাঢ় ১৩৩৯

মূল্য :

সাধারণ ১০.০০

শোভন ১২.০০

প্রচ্ছদচিত্রী : ফণী সাহা

প্রকাশক : শ্যামাপদ ভট্টাচার্য। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।
৩৮ বিধান সরণী। কলকাতা ৬।

মুদ্রক : সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রিণ্ট উইং। ২০৯ সি বিধান সরণী।
কলকাতা ৬।

মা-কে

নিবেদন

ব্যক্তিবিশেষের সাহিত্যচিন্তাকে আমরা দু-ভাবে দেখতে পারি। এক, ব্যক্তিজীবনের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত ক'রে, দেশকালের সঙ্গে মিলিয়ে, সমাজ ও সংস্কৃতির বৃহৎ প্রেক্ষাপটে রেখে দেখা। দুই, চিন্তার প্রবাহ-রূপটার উপর জোর না-দিয়ে, তার ফল পরিণামের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, তাকে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে দেখা। প্রথম দেখাটাকে বলতে পারি, ঐতিহাসিকভাবে দেখা। দ্বিতীয় দেখা তত্ত্বগতভাবে দেখা দুই দেখা দুই জাতের। দুই দেখার প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র, দুই দেখার মূল্যও দু-রকমের। এর একটি অপরটির পরিপূরক হ'তে পারে, কিন্তু বিকল্প নয়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার তত্ত্বগত পরিচয়টাই বর্তমান গ্রন্থের উপজীব্য বিষয় এই সাহিত্যচিন্তার ঐতিহাসিক পরিচয়, এর উন্মেষ ও ক্রমপরিণতির কাহিনী কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ বা কম মূল্যবান নয়। কিন্তু তা স্বতন্ত্র গ্রন্থে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য।

যদিও অখণ্ড এবং সামগ্রিক পরিচয়ই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের আসল পরিচয় বর্তমান লেখকের লক্ষ্যও তাই, তবু বোধ-সৌকর্যের খাতিরে, চোখের সামনে একটা ধারণযোগ্য কাঠামো রক্ষা করার প্রয়োজনে এবং আলোচনার অন্য নানাবিধ সুবিধার জন্যও, বিষয়ের বিভিন্ন দিককে কেটে-কেটে ভাগ ক'রে নেবার প্রয়োজন হয়েছে এই বিভাগগুলি অল্পবিস্তর কৃত্রিম তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আলোচনার ক্ষেত্রে এদের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করারও প্রয়োজন আছে। এ স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রয়াসে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু-কিছু পুনরুক্তি — বিশেষত রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতির পুনরুক্তি অপরিহার্য হয়েছে। ভরসা করি সহৃদয় পাঠক একে অমার্জনীয় ত্রুটি ব'লে গণ্য করবেন না।

বিশ্বভারতী। শান্তিনিকেতন — সত্যেন্দ্রনাথ রায়

সংকেত

র : রবীন্দ্র-রচনাবলী ; জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)
সংখ্যার প্রথমটি খণ্ড-সূচক ; দ্বিতীয় বা তৎপরবর্তী সংখ্যা পৃষ্ঠা-সূচক।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	আছে	হবে
৩৩	৭	কল্পনাবোধের	কল্পনা বোধের
৪৫	১১	এই	তত্ত্ব
৬১	১	পথে	পক্ষে
৮০	৮	যুক্তি	মুক্তি
৮৫	১৩-৪	উৎসারিত ; মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহারই···	উৎসারিত ; মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহারই···
৯৬	৭	সদসদ্‌বলিক্ষণ	সদসদ্‌বিলক্ষণ
৯৯	৭	সাহিত্যের সত্যতা। এই রূপবাণীর সত্যতা সাহিত্যের	সাহিত্যের সত্যতা এই রূপবাণীর সত্যতা। সাহিত্যের
৩১	২৬	রূপের অভিমুখে ;	রূপের অভিমুখে নয়, রসের অভিমুখে।

সূচিপত্র

সাহিত্যতত্ত্ব

রবীন্দ্রদর্শন ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব । ১
সাহিত্যতত্ত্বের ভূমিকা : 'সাহিত্যের পথে' । ৬
সাহিত্যতত্ত্বের ভূমিকা : কল্যাণ-প্রসঙ্গ । ১৬
কল্পনাতত্ত্ব । ২৬
লীলাবাদ । ৪৪
ট্র্যাজেডি প্রসঙ্গে । ৫৯
সৃষ্টি ও অনুকরণ । ৭৮
সাহিত্যের সত্য । ৯১
সৌন্দর্য সামঞ্জস্য আনন্দ । ১১০
প্রকাশতত্ত্ব । ১২৫
সূত্র-সংকলন । ১৩১
কয়েকটি মন্তব্য । ১৪১
উপসংহার । ১৬১

সমালোচনাতত্ত্ব

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাতত্ত্ব । ১৭১
সমালোচনাতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য । ২০৪

পরিশিষ্ট

পাশ্চাত্য প্রকাশবাদ ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজিজ্ঞাসা । ২৩৫

সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ

প্রস্তাবনা

লেখকের উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের সুগ্রথিত, সুবিন্যস্ত এবং পূর্ণাঙ্গ রূপের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি বিশেষ রচনার মধ্যে মিলবে না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিষয়ক মতামতের অধিকাংশই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে, ভাষণে কবিতায়, চিঠিপত্রাদির মধ্যে নানা চেহারায় ছড়িয়ে আছে। সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ যা আছে, যেমন 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ' সবই প্রবন্ধ-সংকলন। প্রবন্ধগুলি সাহিত্যতত্ত্বের বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তার কোনো প্রশ্ন কেন্দ্রগত, কোনোটা-বা নিতান্তই প্রান্তিক আলোচনা কোনোটি সংক্ষিপ্ত, কোনোটা বা দীর্ঘায়ত। ফলে এইসব সংকলনগ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের সামগ্রিক রূপটিকে এক সঙ্গে অখণ্ড চেহারায় প্রত্যক্ষ করা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের এইসব বিচ্ছিন্ন বা আপাতবিচ্ছিন্ন রচনার অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্রের সন্ধান এবং সেই ঐক্যসূত্রের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের সামগ্রিক রূপটিকে যথাসাধ্য স্পষ্ট ক'রে তোলা, বর্তমান লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এইটেই।

এ-প্রসঙ্গে আরো-একটু বলার আছে। সকলেই জানেন, সাহিত্যতত্ত্ব জিনিসটা রসসাহিত্য নয়। তা যুক্তিনিষ্ঠ, মননমূলক বিষয়, সাহিত্য হ'লেও জ্ঞানাত্মক সাহিত্য এ-কথা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কেও প্রযোজ্য। কিন্তু এই পরিচয়টা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের একমাত্র পরিচয় নয়। তা কেবল জ্ঞানাত্মক নয়, ভাবাত্মক বটে। মননমূলক হ'য়েও তা আস্বাদনধর্মী। বস্তুত, রসসাহিত্য থেকে তা খুব দূরবর্তী নয়। তা কেবল বিবৃতই করে না, রূপও ফোটায়, ভাবও জাগায়। তার ভাষা অলজ্জিতভাবে রূপকল্পের ভাষা। সে-ভাষার ইঙ্গিত বাচ্যার্থকে ছাপিয়ে যায়। শুধু বাইরের রূপের কথা নয়, তার অন্তশ্চরিত্রের মধ্যেই কাব্য অনুপ্রবিষ্ট। দর্শনের কাঠামোতে ধরতে গেলে, বুদ্ধির প্রচলিত ছাঁচে ফেলতে গেলে তার মর্মসত্যের বিকৃতি ঘটবার সম্ভাবনা আছে। বর্তমান লেখকের উদ্দেশ্য, বিষয়টির মর্মসত্যকে সাধ্যমতো অবিকৃত রেখে যথাসম্ভব বুদ্ধির ভাষায় তাকে পুনর্বিন্যস্ত করা। কাজটা অনেকটা সংগীতকে স্বরলিপিতে পরিণত করার মতো।

বিষয়ের পূর্বাভাস

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজিজ্ঞাসার কেন্দ্রস্থ বিষয় হ'লো সাহিত্যসৃষ্টি, আর এই বিষয়ের একেবারে সারতম সত্য হ'লো আনন্দ। এ-আনন্দ বিশ্ব-বিষয়ের সঙ্গে লেখকের-পাঠকের মিলনের আনন্দ, বিষয় ও বিষয়ীর এক-হ'য়ে-যাওয়ার আনন্দ। এই এক-হ'য়ে-যাওয়াটাই মানুষের স্বধর্ম এবং এই এক-হ'য়ে-যাওয়ার আস্বাদটার নামই আনন্দ। যে-অনুভব যুগপৎ আত্মানুভব এবং বিশ্বানুভব, তা-ই আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বকে অনায়াসে আনন্দবাদী বলা যায়। শুধু মনে রাখতে হবে, আনন্দ এখানে দুঃখের বিপরীত নয়, আনন্দ অর্থ সুখ নয়। সুখ-দুঃখ লজ্জা-ভয় ক্রোধ-বিস্ময় সবই আনন্দ। সব অভিজ্ঞতাই আনন্দ, জীবনের সব দানই আনন্দ। আনন্দ অর্থ এখানে জীবনের আস্বাদ — কটু তিক্ত মিষ্ট কষায় স্নিগ্ধ উগ্র যে-কোনো আস্বাদ। এ-আনন্দবাদকে জীবনবাদ বললেই বরং ঠিক বলা হয়।

আনন্দ আর মিলন পৃথক্ নয়। ঠিক তেমনি, সৃষ্টিও পৃথক্ নয়। সৃজন আনন্দময়, তেমনি আনন্দও সৃজনধর্মী। রবীন্দ্রনাথের মতে, বিশ্ব-জগৎ যেমন এক সৃষ্টিলীলা, মানবজীবনও তেমনি এক সৃষ্টিলীলা, সাহিত্যও তাই। জগৎ ও জীবন যেমন মানুষকে তৈরি করে, মানুষও তেমনি তার জগৎকে তার জীবনকে তৈরি করে, নিজেকেও তৈরি করে। মানুষমাত্রেই সৃষ্টিকর্তা, মানুষমাত্রেই শিল্পী। সাহিত্য হ'লো সৃষ্টিকর্তা মানুষের এমন বিশেষ একটি সৃষ্টিক্ষেত্র যেখানে তার সৃষ্টিলীলা সম্পূর্ণ বাধাহীন।

সৃষ্টির অপরিহার্য শর্ত হ'লো, স্রষ্টার পক্ষে, তার নিজত্বের গণ্ডীকে পার হ'য়ে যাওয়া, নিজেকে বিস্তৃত করা, অপরের সঙ্গে মিলিত হওয়া — কল্পনার সাহায্যে, ভালোবাসার শক্তিতে, মানব-স্বভাবের তাগিদে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এটা সহজ নয়, সেখানে ব্যবহারিক প্রয়োজন এসে বাধা ঘটায়। সাহিত্যে সে-বাধা নেই। প্রয়োজনের জগতে মানুষ কাজের দাস, সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষ মুক্ত। সাহিতের জগৎ মানুষের মুক্তির জগৎ। প্রয়োজনবশ্যতায় মানুষের জৈবতা, মুক্তিতে মানুষের মনুষ্যত্ব।

বিষয় বিন্যাস

গ্রন্থের আলোচনা তিন ভাগে বিভক্ত; সাহিত্যতত্ত্ব, সমালোচনাতত্ত্ব এবং পরিশিষ্ট। যে-সব মূল প্রত্যয়কে অবলম্বন ক'রে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের ভিত্তিভূমি গ'ড়ে উঠেছে, যেমন ভাব কি কল্পনা কি সৃষ্টি, কিংবা ধরা যাক্ লীলা কি সত্য, কিংবা প্রকাশ কি আনন্দ, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের সেই মৌল প্রত্যয়গুলোই প্রথম ভাগের অর্থাৎ সাহিত্যতত্ত্ব অংশের আলোচনার প্রধান অবলম্বন। আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যয়গুলি স্বতন্ত্র, ভিন্ন প্রসঙ্গক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকেরই বিশিষ্টতা স্বীকৃত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে

অন্তরের ধর্মে এরা পরস্পরের অতি নিকটবর্তী — প্রায় অভিন্ন। বিশেষ-বিশেষ প্রসঙ্গ-ক্ষেত্রে এদের যে-বিশিষ্টতা সে কেবল সাহিত্যজিজ্ঞাসুর দৃষ্টিকোণের বিশিষ্টতার কারণেই, মূলত এরা পৃথক্ নয়। এই মৌল অভেদের সিদ্ধান্তই সাহিত্যতত্ত্ব অংশের আলোচনার অন্যতম প্রধান ফল-পরিণাম।

দ্বিতীয় ভাগ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাতত্ত্ব। সমালোচনা আমাদের বিষয়-পরিধির বহির্ভূত। তার কারণ তা তত্ত্ব নয়, প্রয়োগ। অপর পক্ষে, সমালোচনাতত্ত্ব প্রয়োগসচেতন হ'লেও তা তত্ত্ব। তা সাহিত্যতত্ত্ব থেকেই অনুসৃত, সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্বের মাঝখানের সংযোজক।

তৃতীয় ভাগে অর্থাৎ পরিশিষ্টে একটি আনুষঙ্গিক বিষয় : পাশ্চাত্য প্রকাশবাদ, সাহিত্যতত্ত্বে যা এক্স্‌প্রেশনিজম্ নামে পরিচিত, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশতত্ত্বের তুলনা। বিষয়টি প্রথম ভাগের প্রকাশতত্ত্ব শীর্ষক আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

১. *The Religion of Man*, p. 19

২. তদেব, Appendix II, p. 222

৩. তদেব

৪. তদেব

৫. *The Religion of Man*, p. 15

৬-৭. তদেব, '

৮. তদেব, Appendix II, p. 222

৯. "ভূমিকা", 'সাহিত্যের পথে', র৷১৪৷২৯১-৩

১০. বের্গসঁর মতে ইন্‌টুইশন বা বোধি হচ্ছে "instinct that has become disinterested, self-conscious, capable of reflecting upon its object and enlarging it indefinitely I" *Creative Evolution* (Tr. Arthur Mitchell), p. 176

১১. "সাহিত্য", 'সাহিত্য', র৷১৩৷৮৪২

১২. "ভূমিকা", 'সাহিত্যের পথে', র৷১৪৷২৯১

১৩. তদেব, র৷১৪৷২৯২

১৪. তদেব, র৷১৪ ২৯১

১৫-১৬. তদেব, র৷১৪,২৯২

১৭. *The Religion of Man*, p. 49

১৮. "ভূমিকা", 'সাহিত্যের পথে', র৷১৪,২৯২

সাহিত্যতত্ত্বের ভূমিকা : কল্যাণ প্রসঙ্গ

'সাহিত্যের পথে'র ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের সব উপলব্ধিই তুল্যমূল্য নয়। কোনো কোনো উপলব্ধি মূল্যবান, কোনো কোনোটি তা নয়। সাহিত্যে সেই উপলব্ধিগুলিকেই বেছে নিতে হবে যেগুলি যথার্থই মূল্যবান। যা মূল্যহীন, যা ক্ষতিকারক, যা কুপথ্য, তাকে বর্জন করতে হবে।

কিন্তু এর ঠিক আগের অনুচ্ছেদেই বলেছেন, "মানুষ নানারকম আস্বাদনেই আপনাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে বাধাহীন লীলার ক্ষেত্রে।" আরো আগে বলেছেন, মানুষ 'উপলব্ধির ক্ষুধায় ক্ষুধিত'। মানুষ বহু হ'তে চায়, বিচিত্র হ'তে চায়, সবরকম উপলব্ধির আস্বাদই সে পেতে চায়। বাস্তব জগতে যাকে সে সর্বতোভাবে বর্জনীয় ব'লে জানে, সাহিত্যে তাকেও সে পেতে চায়। "তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয় ; আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে।" আরো বলেছেন, সাহিত্যে মানুষের উপলব্ধির জগৎ বাধাহীন। এই 'বাধাহীন' কথাটার তাৎপর্য স্পষ্ট। তা হ'লো এই যে, সাহিত্যে কোনো উপলব্ধিই বর্জনীয় নয়, যদি তা সত্যই উপলব্ধি হয়। কোনো উপলব্ধিই মূল্যহীন নয়। কেননা, যেহেতু উপলব্ধি, সেই হেতুই তা আনন্দকর।

শেষ অনুচ্ছেদের বক্তব্য — অন্তত আপাতদৃষ্টিতে — এর প্রায় বিপরীত। অনুচ্ছেদটির আরম্ভেই তিনি বলেছেন, "কিন্তু এর মধ্যে [উপলব্ধির মধ্যে] মূল্যভেদের কথা আছে কেননা এ তো বিজ্ঞান নয়। আনন্দ-সম্ভোগে মানুষের নির্বাচনের কর্তব্য তো আছে।" — এইখানেই আমাদের প্রশ্ন। উপলব্ধি যদি সত্যই উপলব্ধি হয়, আনন্দ যদি সত্যই আনন্দ হয়, তাহ'লে সত্যিই কি তার মধ্যে নির্বাচনের কর্তব্য আছে? এই দাবি রবীন্দ্র-দর্শনের মূল প্রত্যয়সমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ব'লে মনে হয় না। ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদে দেখতে পাচ্ছি, উপলব্ধির ক্ষেত্রে নির্বাচন ব্যাপারটার উপর রবীন্দ্রনাথ খুব বেশি রকম জোর দিয়েছেন। সেই এক অনুচ্ছেদের মধ্যেই একটুখানি অগ্রসর হ'য়ে এসে আবার দ্বিতীয়বার তিনি উচ্চারণ করলেন, "কিন্তু আনন্দসম্ভোগে স্বভাবতই মানুষের বাছবিচার আছে।"

এইখানেই খট্‌কা। বাছবিচারটা হবে কোন্‌ দিকে দৃষ্টি রেখে? নির্বাচনটা হবে কোন্‌ মানদণ্ড দিয়ে? সমাজকল্যাণের? নীতিবোধের? লোকহিতের? আমরা দেখেছি, রবীন্দ্র-দর্শন বস্তুত উপলব্ধিরই দর্শন। যা যথার্থই উপলব্ধি, যার মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই, তা সব সময়ই আত্মোপলব্ধি এবং সব সময়ই আনন্দকর — অতএব সব সময়ই মূল্যবান। আনন্দমূল্যই তার চরম মূল্য, অপর কোনো মূল্যের প্রশ্নই ওঠে না। কেননা, আনন্দের বাইরে বা আনন্দের উপরে আর কিছু নেই। এই সিদ্ধান্তই রবীন্দ্র-দর্শন-সম্মত সিদ্ধান্ত। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন, "...আনন্দটিই হচ্ছে সব শেষের কথা, এর পরে আর কোনো কথা নেই। সেই আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব তখন এ-প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে, আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কি না।"[১]

আনন্দের মধ্যে যদি গুণগত ভেদ মানতে হয়, তাহ'লে যে-গুণের উপস্থিতিতে এক আনন্দ অপর আনন্দের থেকে উচ্চতর বা বেশী মূল্যবান ব'লে গণ্য, সেই গুণটাই সব শেষের কথা হ'য়ে দাঁড়ায়। তখন আর আনন্দকেই চরম ব'লে দাবি করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ আনন্দকেই চরম বলেছেন। সব উপলব্ধি অবশ্য সমান নিবিড় নয়, সমান তীব্র নয়, এবং সেই কারণে সব উপলব্ধিই সমান আনন্দকর নয়। উপলব্ধির মধ্যে এই পরিমাণগত ভেদ ছাড়া আর কোনো ভেদ রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করতে পারেন না। কোনো সত্য উপলব্ধিকেই রবীন্দ্রনাথ মূল্যহীন বলতে পারেন না, কুপথ্য বলতে পারেন না। কোনো সত্য আনন্দকেই রবীন্দ্রনাথ অপর কোনো আনন্দ থেকে ছোটো বা নীচু বলতে পারেন না। সাহিত্যে যা-কিছু নির্বাচন, তা আনন্দেরই জন্য। সেই আনন্দের মধ্যে আবার অন্যতর কোনো মানদণ্ড দিয়ে ছোটো-বড়োর ভেদ করা, ভালো-মন্দের ভেদ করা রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বের মূল প্রত্যয়কেই লঙ্ঘন করে।

কিন্তু, আগেই বলেছি, কথাটা উঠেছে তখনকার সাহিত্যের 'আধুনিক' প্রবণতাগুলির প্রসঙ্গে, চল্‌তি ফ্যাশানের প্রসঙ্গে, 'আধুনিকতার ভঙ্গিমা'র প্রসঙ্গে। কোনো রকম সাময়িক ফ্যাশান বা চল্‌তি উত্তেজনাকেই — তা সে আধুনিক মনস্তত্ত্বের উত্তেজনাই হোক, অথবা অপর কোনো রকম বৈজ্ঞানিক কৌতূহলেরই হোক, কি কোনো চল্‌তি মতবাদের উত্তেজনাই হোক, কোনো রকম সাময়িক উত্তেজনাকে বা হুজুগকে রবীন্দ্রনাথ 'চিরকালীন সাহিত্যের' মূল্য দিতে প্রস্তুত নন। এইসব ভঙ্গিমা-প্রধান আধুনিকতার কথা স্মরণে রেখেই রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধির মূল্যভেদের কথা বলেছেন। মনে হয়, তাঁর আসল বক্তব্য উপলব্ধির মূল্যভেদ নয়, উপলব্ধির ক্ষেত্রে

আসল আর নকলের ভেদ, খাঁটি আর ভেজালের ভেদ। এই যদি তাঁর আসল বক্তব্য হয়, তাহ'লে এ নিয়ে কারোই কোনো আপত্তি থাকতে পারে ব'লে মনে হয় না।

যে-কোনো আধুনিকতাই যে মূল্যবান, নিছক আধুনিক ব'লেই যে সে বেশি গৌরবজনক, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ মনে করেন না। এ-প্রসঙ্গ তিনি নানা জায়গায় উত্থাপন করেছেন এবং নানাভাবে আলোচনা করেছেন। 'সাহিত্যের পথে'র "সাহিত্যধর্ম" (১৯২৭), "সাহিত্যে নবত্ব" (১৯২৭), "সাহিত্যরূপ" (১৯২৮), "সাহিত্য সমালোচনা" (১৯২৮), "আধুনিক কাব্য" (১৯৩২) ইত্যাদি প্রবন্ধে এ-বিষয়ে তিনি বিস্তৃতভাবে তাঁর বক্তব্য বলেছেন। "সাহিত্যরূপ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন, "চলতি স্রোতে যা-কিছু সবশেষে আসে তারই যে সবচেয়ে বেশী গৌরব,...এমনতরো মনে করা চলে না। সকল দেশের সাহিত্যেই জীবনধর্ম আছে, এইজন্যে মাঝে মাঝে সে সাহিত্যে অবসাদ ক্লান্তি রোগ মূর্ছা আক্ষেপ দেখা দেয়...। কিন্তু, দূরে থেকে আমরা তার রোগকেও স্বাস্থ্যের দরে স্বীকার করে নিই।"[২]

রবীন্দ্রনাথের আপত্তি এইখানে। রোগটা রোগই, তা সে যতোই না কেন আধুনিক হোক, যতোই না কেন সাহেবী হোক। তাকে কখনোই স্বাস্থ্যের দরে স্বীকার ক'রে নেওয়া যায় না। অনেক বিকৃতিই ফ্যাশান হ'য়ে দাঁড়ায়, ভঙ্গিমাই সত্যকে আড়াল ক'রে দাঁড়ায়। অনেক সময় মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্র থেকে অযৌক্তিকভাবে সে নিজের সমর্থন ধার ক'রে নিয়ে আসে। যার মধ্যে আদৌ উপলব্ধির সত্যতা নেই, তাকেই আমরা সত্য উপলব্ধির মূল্য দিয়ে বসি। এইখানেই চিনে নেওয়ার, বেছে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা। নির্বাচন বটে, কিন্তু সে হ'লো সত্য আর ফাঁকির মিশ্রিত জনতা থেকে সত্য যা শুধু তাকেই নির্বাচন করা।

ভূমিকার অন্তিম অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মনস্তত্ত্বের কৌতূহল চরিতার্থ করা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাজ। সেই বুদ্ধিতে মাৎলামির অসংলগ্ন এলোমেলো অসংযম এবং অপ্রমত্ত আনন্দের গভীরতা প্রায় সমান আসন পায়। কিন্তু আনন্দসম্ভোগে স্বভাবতই মানুষের বাছ-বিচার আছে।" — একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবো, বাছাইটা এখানে আনন্দের মধ্যে নয়। 'মাৎলামির অসংলগ্ন এলেমেলো অসংযম'কে পৃথক করতে হবে 'অপ্রমত্ত আনন্দের গভীরতা' থেকে। প্রথমটিকে বাতিল করতে হবে, দ্বিতীয়টিকে গ্রহণ করতে হবে।

কোন্‌টা যে মাৎলামির অসংযম আর কোন্‌টা যে অপ্রমত্ত আনন্দ, কোন্‌টা যে সাময়িক উত্তেজনা আর কোন্‌টা যে চিরকালীন সত্য, তা নিয়ে অবশ্যই তর্ক থাকতে পারে। চিনে নেওয়া সব সময় খুব সহজ নয়, এ-কথা জানতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যে-

সব জিনিসকে আধুনিকতার ভঙ্গিমা বলেছেন, তার সবই নিছক ভঙ্গিমা, না তার মধ্যে সত্যও আছে, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের মতবিরোধও ঘটতে পারে। কিন্তু এই মতবিরোধ রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বগত সিদ্ধান্তকে স্পর্শ করে না। ফাঁকিকে ভানকে বিকৃতিকে আমরা নিশ্চয়ই সত্যের মূল্য দেবো না, তা সে যেটাই ফাঁকি হোক, আর যেটাই সত্য হোক।

আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে। অসুস্থতা আর ফাঁকি এক নয়। রবীন্দ্রনাথ 'মাৎলামির অসংলগ্ন এলোমেলো অসংযম'কে ফাঁকি বলেছেন আলংকারিক অর্থে। আক্ষরিক অর্থে ধরলে, তা-ও কিন্তু সত্য হতে পারে। অর্থাৎ তার পেছনেও সত্যিকারের উপলব্ধি থাকতে পারে। তা যেখানে আছে, সেখানে তাকেও বাদ দেওয়া চলবে না। কেননা, সাহিত্যে তা-ও আনন্দকর।

এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ কখনোই স্পষ্ট ক'রে উচ্চারণ করেননি। মনে হয়, মাৎলামিকে অসংযমকে বিকারকে তিনি কখনোই সত্য ব'লে মানতে প্রস্তুত নন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, মানুষ যেখানে আপন ক্ষুদ্রতাকে ছড়িয়ে যায়, সেইখানেই সে যথার্থ মানুষ, সেইখানেই তার সত্যতা। যেখানে তার হীনতা-দীনতা সেখানে সে সত্য নয়। সে তার একটা সাময়িক বিকার, আপাতদৃষ্টিতে তাকে সত্য মনে হ'তে পারে, কিন্তু তা সার্থক সত্য নয়। ঠিক যেমন জীবধর্ম মানুষের পক্ষে সার্থক সত্য নয়, আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তি সার্থক সত্য নয়। "এই প্রবৃত্তিতে মনুষ্যত্বের সার্থকতা মানুষ উপলব্ধি করে না।...মানুষের আহারের ইচ্ছা প্রবল সত্য, কিন্তু সার্থক সত্য নয়। পেট-ভরানো ব্যাপারটা মানুষ তার কলালোকের অমরাবতীতে স্থান দেয়নি।" [৩]

আপন মনুষ্যত্বে সার্থক মানুষই সত্য মানুষ, তারই স্থান কলালোকের অমরাবতীতে। মানুষের মহিমা নিয়েই সাহিত্য, দীনতা নিয়ে নয়। "...সকল হীনতা-দীনতা ছাড়িয়ে উঠে যে-সাহিত্যে সমগ্রভাবে মানুষের মহিমা প্রকাশ না হয় তাকে নিয়ে গৌরব করা চলবে না... ।...চিরকালের মানুষের মনে যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কাজ করছে তা অভ্রভেদী, তা স্বর্গাভিমুখী, তা অপরাহত পৌরুষের তেজে জ্যোতির্ময়। সাহিত্যে সেই পরিচয়ের ক্ষীণতা যদি কোনো ইতিহাসে দেখা যায় তা হলে লজ্জা পেতে হবে... ।"[৪] রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সাহিত্যে মানুষ নিজের সত্যতম রূপেরই পরিচয় দেয়। "এই পরিচয় সমস্ত জাতির জীবনযজ্ঞে জ্বালিয়ে-তোলা অগ্নিশিখার মতো; তারই থেকে জ্বলে তার ভাবীকালের পথের মশাল, তার ভাবীকালের গৃহের প্রদীপ।"[৫]

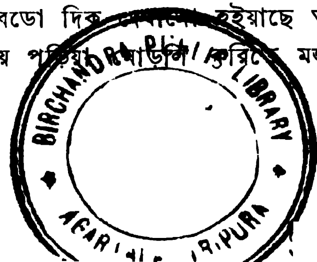
এই উক্তির আলোকে দেখলে মনে হয় যে, 'মাৎলামির অসংলগ্ন এলোমেলো

অসংযম'কে, বিকার বা পতনকে, মানুষের কোনো হীনতা-দীনতাকে রবীন্দ্রনাথ সত্য ব'লে মনে করেন না। এই উপলব্ধিকে তিনি সত্য উপলব্ধি ব'লেই মনে করেন না। মনে করেন না যে, কলালোকের অমরাবতীতে স্থান পাবার এর কোনো দাবি আছে। এইখানে, আশঙ্কা করি, আধুনিক সাহিত্যজিজ্ঞাসুদের অধিকাংশের সঙ্গেই তাঁর মতের অমিল ঘটবে।

কিন্তু তাঁর নিজের সাহিত্য-অভিজ্ঞতার সঙ্গে, নিজের সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গেই কি এ-কথার পুরোপুরি মিল হচ্ছে? মনে তো হয় না। তিনিই তো বলেছেন, "কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামচন্দ্রের নির্বাসন, মন্থরার উল্লাস, দশরথের মৃত্যু এর মধ্যে ভালো কিছুই নেই।...তবু এই ঘটনা নিয়ে কত কাব্য নাটক ছবি গান পাঁচালি বহুকাল থেকে চলে আসছে, আনন্দ পাচ্ছে সবাই। এতেই আছে বেগবান অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিপুরুষের প্রবল আত্মানুভূতি।"[৬] তিনিই তো বলেছেন, ভাঁড়ু দত্ত সাহিত্যের সামগ্রী। তিনিই বলেছেন, ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহান্ধতা তাঁকে অধর্মের পথে টেনে নিয়েছে, "এই ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য হারালেন, প্রাণাধিক সন্তানদের হারালেন, কিন্তু সাহিত্যের সিংহাসনে এই দিক্‌ভ্রান্ত অন্ধ তিনি চিরকালের জন্য স্থির রইলেন।"[৭] মহাভারতের চরিত্র-চিত্রশালার দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনিই বলেছেন, "কেউ-বা নীচ শকুনির মতো, মন্থরার মতো, কেউ-বা মহৎ ভীমের মতো, দ্রৌপদীর মতো — আশ্চর্য মানুষের অমর কীর্তি জীবনের চিরস্বাক্ষরিত।"[৮] তিনিই আমাদের শুনিয়েছেন, "...ওথেলোর অশান্তি সুন্দর নয়, মানবস্বভাবগত।"[৯]

উঁচু-নীচু ভালো-মন্দ শান্তি-অশান্তি সুখ-দুঃখ প্রীতি-হিংসা সব নিয়ে বিচিত্র জটিল যে-মানবজীবন, সেই জীবনরসের যিনি রসিক, তিনি ব্যাধি-বিকারকে, স্খলন-পতনকেই বা বাদ দেবেন কেন? মানবজীবনের বহুবিচিত্র রূপ যাকে মুগ্ধ করে, যিনি বলেন, "জীবন মহাশিল্পী",[১০] তিনি তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব থেকে জীবনের কোনো রূপকেই বাদ দেবার প্রস্তাব করতে পারেন না, মাৎলামির অসংযমকেও না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে এই রকম একটা প্রস্তাব আকস্মিক ব্যতিক্রমের মতো।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিল্পসৌন্দর্য "...অস্তিত্বমাত্রকেই মর্যাদা দান করে। যাঁহারা সাহিত্যবীর তাঁহারাও অস্তিত্বমাত্রের গৌরব-ঘোষণা করিবার ভার লইয়াছেন।"[১১] তিনি বলেছেন, সাহিত্যের কাজ অস্তিত্বমাত্রকে স্পষ্ট ক'রে তোলা, প্রত্যক্ষগোচর ক'রে তোলা। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, "কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ভাড়ুদত্তের যে-বর্ণনা আছে সে-বর্ণনায় মানুষের চরিত্রের যে একটা বড়ো দিক দেখানো হইয়াছে তাহা নহে; এইরকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়লি করিতে মজবুত



লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি। তাহাদের সঙ্গ যে সুখকর তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু কবিকঙ্কণ এই ছাঁদের মানুষটিকে আমাদের কাছে যে মূর্তিমান করিতে পারিয়াছেন তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে।"[১২] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সেই কারণ হচ্ছে অনাবশ্যক বাহুল্যের বর্জন। কারণ যা-ই হোক না কেন, যে-কোনো একটা রূপকে, যে-কোনো একটা ভাবকে — "দুঃখ-সুখ বিচ্ছেদ-মিলন লজ্জা-ভয় বীরত্ব-কাপুরুষতা"[১৩] — তাকে মূর্তিমান ক'রে তোলা, প্রত্যক্ষগোচর ক'রে তোলা এই হ'লো সাহিত্যের কাজ। সাহিত্যের এই প্রত্যক্ষগোচরতার মূল্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের দেশে এক প্রকারের সাহিত্যবিচার দেখি যাতে নানা অবান্তর কারণ দেখিয়ে সাহিত্যের এই প্রত্যক্ষগোচরতার মূল্য লাঘব করা হয়। হয়তো কোনো মানবচরিত্রজ্ঞ বলেন, শকুনির মতো অবিমিশ্র দুর্বৃত্ততা স্বাভাবিক নয়, ইয়াগোর অহৈতুক বিদ্বেষবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহদ্‌গুণ থাকা উচিত ছিল; বলেন, যেহেতু কৈকেয়ী বা লেডী ম্যাক্‌বেথ, হিড়িম্বা বা শূর্পনখা নারী, 'মায়ের জাত', এইজন্যে তাদের চরিত্রে ঈর্ষা বা কদাশয়তার অত নিবিড় কালিমা আরোপ করা অশ্রদ্ধেয়। সাহিত্যের তরফ থেকে বলবার কথা এই যে, এখানে আর কোনো তর্কই গ্রাহ্য নয় — কেবল এই জবাবটা পেলেই হল, যে-চরিত্রের অবতারণা হয়েছে তা সৃষ্টির কোঠায় উঠেছে, তা প্রত্যক্ষ।"[১৪] তিনিই জীবনরসিক যিনি সমস্ত কিছুকে অস্তিত্বগৌরবে দেখতে জানেন। এই দেখাই সাহিত্যের দেখা। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি:

"জঙ্গলে আবিষ্ট ভাঙা মেটে পাঁচিলের গা থেকে বাগ্‌দি বুড়ি বিকেলের পড়ন্ত রৌদ্রে ঘুঁটে সংগ্রহ করে আপন ঝুড়িতে তুলছে, আর পিছনে পিছনে তার পোষা নেড়ি কুকুরটা লাফালাফি করে বিরক্ত করছে, এই ব্যাপারটি যদি বিশিষ্ট স্বরূপ নিয়ে আমাদের চোখে পড়ে, একে যদি তথ্যমাত্রের সামান্যতা থেকে পৃথক্ করে এর নিজের অস্তিত্বগৌরবে দেখি, তা হলে এ-ও জায়গা নেবে ভাবের নিত্যজগতে।

"বস্তুত আর্টিস্টরা বিশেষ আনন্দ পায় এই রকম সৃষ্টিতেই।"[১৫]

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে মানবমহিমা প্রকাশ করার কথা বলেছেন। এখন দেখতে পাচ্ছি, লৌকিক নীতিবিধানের মাপকাঠি দিয়ে তাকে মাপা যায় না। জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য সমস্ত জটিলতা নিয়েই, সমস্ত স্খলন পতন নিয়েই — মহত্ত্ব এবং হীনতা, বীরত্ব এবং কাপুরুষতা, সব নিয়ে মহাশিল্পী জীবন মানবমহিমাকে প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব সাহিত্যের বাইরের অপর কোনো মানদণ্ড দিয়ে সাহিত্যের বিষয়কে ছাঁটাই-বাছাই করার সাহিত্যতত্ত্ব নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সাহিত্যে সমগ্রভাবে মানুষের মহিমা" প্রকাশ পায়। 'সমগ্রভাবে' কথাটা এখানে খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

সমগ্রভাবে প্রকাশ করে ব'লেই তার মধ্যে পতনও স্থান পায়। পতন না থাকলে তার উত্তরণ অর্থহীন হ'য়ে যেতো, উত্থান মূল্যহীন হ'য়ে পড়তো। এ-ও হয়তো নৈতিক বিচারেরই কথা, সাহিত্যের নিজস্ব কথা নয়। সাহিত্যের নিজস্ব কথা হ'লো এই যে, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থাতেই মানবযাত্রী যুগ-যুগ-ধাবিত। মানুষের সত্য কোনো টুকরো সত্য নয়। যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রীদলের সত্যই মানুষের সত্য। এই কথাই রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্ব-সম্মত কথা।

তাহ'লে কি শেষ পর্যন্ত আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হলাম যে, রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে নীতিবোধের কোনো স্থান নেই, নৈতিক ভাল-মন্দের বিচার সাহিত্যে অচল? সাহিত্যের প্রসঙ্গে মঙ্গল, কল্যাণ এ-সব কথা সম্পূর্ণ অবান্তর? এর উত্তর আমরা রবীন্দ্রনাথের মুখেই পেয়েছি। সাহিত্যে উপলব্ধিই — অর্থাৎ আনন্দই সব থেকে বড়ো কথা। "...আনন্দটিই হচ্ছে সব শেষের কথা, এর পরে আর কোনো কথা নেই।...এ-প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে, আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কি না।"[১৬] কিন্তু সাহিত্যের প্রসঙ্গে কল্যাণ-আদর্শের কথা বা হিতসাধনের কথা রবীন্দ্রনাথ যে কখনোই তোলেননি, তা নয়। এ-কি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের অসতর্ক আত্ম-বিরোধ? রবীন্দ্রনাথ কি আনন্দ এবং মঙ্গল এই দুটো মাপকাঠির কখনো এটাতে, কখনো ওটাতে বিশ্বাসী? অথবা একসঙ্গে দুটোতেই বিশ্বাসী? তা যদি হবে তাহ'লে অতো জোর দিয়ে বলবেন কেন যে, আনন্দই হ'লো সব শেষের কথা?

রবীন্দ্রনাথ দুটো মাপকাঠিতে বিশ্বাস করেন না। মাপকাঠি একটাই। কোনটা? বলা বাহুল্য, আনন্দ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন, সত্য থেকে মঙ্গলকে, সুন্দর থেকে মঙ্গলকে এবং আনন্দ থেকে মঙ্গলকে তিনি কিছুতেই পৃথক্ করতে পারেন না। এ-কথা নিশ্চয় যে, মাপকাঠি একটাই। কিন্তু তা যেমন আনন্দের মাপকাঠি, তেমনি তাকে ইচ্ছা করলেই আমরা সুন্দরের বা সত্যের মাপকাঠি বলতে পারি। এবং সেই একই কারণে, মঙ্গলের মাপকাঠিও বলতে পারি। তা সংকীর্ণ অর্থে লৌকিক নীতি-শাস্ত্রের মাপকাঠি না হ'তে পারে, কিন্তু নীতি কথাটাকে যদি অযথা সংকুচিত না করি, যদি সুবিস্তৃত বা সু-উচ্চ অর্থে ধরি, তাহ'লে তাকে নৈতিক মাপকাঠি বলতেও বাধা নেই। কেননা সমস্ত নীতিবিধানেরই শেষ লক্ষ্য হচ্ছে কল্যাণ।

রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন, বিচিত্রের মধ্যে যে ঐক্য, তারই নাম সামঞ্জস্য। তারই নাম সত্য। আবার তারই নাম কল্যাণ। সেই সামঞ্জস্যই সৌন্দর্য, এবং সেই সামঞ্জস্যেই আনন্দ। সুতরাং যা আনন্দকর তা কল্যাণকর হ'তে বাধ্য, যা

কল্যাণকর তা আনন্দকর হ'তে বাধ্য। সেইসঙ্গে এ-ও বলতে পারি, যা নিরানন্দকর তা অবশ্যই অকল্যাণকর, এবং যা অকল্যাণকর তা অবশ্যই নিরানন্দকর। এ-সিদ্ধান্ত আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞার সঙ্গে মেলে কি না, সে-প্রশ্ন অবশ্য উঠতে পারে। আপাতত সে-প্রশ্ন তুলবো না, কারণ সে-প্রশ্ন আনন্দ ও কল্যাণের অভিন্নতার তত্ত্বের বিরুদ্ধেই চ্যালেঞ্জ। আনন্দ আর কল্যাণের অভেদকে যদি মেনে নিই, যেমন রবীন্দ্রনাথ মেনেছেন, তা'হলে এই সিদ্ধান্তকে আমাদের মেনে নিতেই হবে।

এ-সিদ্ধান্তকে মেনে নিলেও একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। একই বিষয় — তাকে এক দিক থেকে দেখে বলি সত্য, অন্যদিক থেকে দেখে বলি মঙ্গল, সামগ্রিকভাবে দেখলে তাকেই বলি আনন্দ। এই দেখাটাই সাহিত্যের দেখা, আর্টের দেখা। এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আনন্দের মধ্যেই প্রকাশের তত্ত্ব। বলেছেন, "আনন্দটিই হচ্ছে সব শেষের কথা, এরপরে আর কোনো কথা নেই।"

রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য সব সময়ই কল্যাণকর, তা সব সময়ই হিতসাধন করে। কিন্তু করে কি করে না, করছে কি করছে না, সেটা দেখার দায়িত্ব সাহিত্যের নয়। আনন্দের প্রশ্নটাই সাহিত্যের নিজস্ব প্রশ্ন, অন্য যে-কোনো প্রশ্নই তার পক্ষে অবান্তর। এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "...এ প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে, আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কি না।" কিন্তু, আর্ট কোনো হিতসাধন করলো কি না এই প্রশ্নটাকে যদি অর্থহীন ব'লে দাবি করি, তাহ'লে আর্ট অহিতসাধন করলো কি না এই প্রশ্নও সমানই অর্থহীন হ'য়ে পড়ে। তাহ'লে রচনাবিশেষের বিরুদ্ধে অহিতকারিতার আপত্তিও তোলা যায় না। কল্যাণের প্রশ্নটাকে যদি সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে অবান্তর ব'লে বাদ দিতে চাই, তাহ'লে আমাদের সামনে মাত্র দুটি বিকল্প পথই খোলা থাকে।

এক, আনন্দ ও কল্যাণকে মনে মনে অভিন্ন জেনে, কার্যক্ষেত্রে আনন্দকে মাপকাঠি ক'রে নেওয়া, এবং সেই সঙ্গে এই কথা বলা যে, সাহিত্য কখনোই অহিতকারী হ'তেই পারে না — যা অহিতকারী তা আসলে সাহিত্যই নয়।

দুই, আনন্দ ও কল্যাণের অভেদকে অস্বীকার ক'রে সরাসরি এই কথা বলা যে, সাহিত্য যদি অহিতসাধন করেও, তবু তা মূল্যবান। আনন্দ-মূল্যই চরম মূল্য — অন্তত আর্টের ক্ষেত্রে, অকল্যাণ হয় যদি, হোক। তা নিয়ে আর্টের কোনো জবাব-দিহি নেই।

Art for Art's sake মতবাদের আরম্ভটা প্রথম বিকল্প পথে, পরিণতিটা দ্বিতীয় বিকল্প পথে।

অকল্যাণ যদি হয় তো হোক, এমন সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে খুব প্রীতিপ্রদ নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাই, হিতকারিতার না হোক, অন্তত অহিতকারিতার প্রশ্নটিকে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অবহেলা করতে পারেননি। যেমন পারেননি 'সাহিত্যের পথে'র ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদটিতে। উল্লিখিত দুই বিকল্প পথের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথমটিকেই গ্রহণ করেছেন। সাহিত্যে তিনি আনন্দবাদী, কল্যাণবাদী নন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন, যা সত্যই অহিতকর তা সাহিত্য নয় — অকল্যাণকর আর্টের অস্তিত্বই নেই।

এইখানেই আমাদের প্রত্যক্ষ সাহিত্য-অভিজ্ঞতার কথা ওঠে। আমরা কি সাহিত্যে কুরুচি অশ্লীলতা ইত্যাদির কোনো পরিচয়ই জানি না? আমরা কি অবক্ষয়ের সাহিত্যের সন্ধান রাখি না, প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্য কোথাও দেখিনি? রবীন্দ্রনাথ কি নিজেই বিদ্যাসুন্দরকে অবক্ষয়ের সাহিত্য ব'লে নিন্দা করেননি? এগুলিকে সরাসরি অ-সাহিত্য ব'লে রায় দিই কী ক'রে? মুশকিল এই যে, কোন্‌টা হিতকর কোন্‌টা হিতকর নয় তা প্রমাণ করা যতো সহজ, কোন্‌টা সাহিত্য আর কোন্‌টা সাহিত্য নয়, তা প্রমাণ করা ততো সহজ নয়। যাকে সাহিত্য নয় বলছি, কল্যাণের দোহাই দিয়ে নয়, সাহিত্যিক যুক্তি দিয়েই তো প্রমাণ করতে হবে যে সে অ-সাহিত্য। এ-কাজটা খুব সহজসাধ্য নয়। তাহ'লে হিতসাধন এবং আনন্দকে অভিন্ন ব'লে মানি কেমন ক'রে?

আসলে হয়তো মাপকাঠি একটা নয়, দুটোই। কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত এবং সমন্বিত — পরস্পরের থেকে অচ্ছেদ্য। হয়তো দেখা যাবে জীবনের গভীরে কোথাও তাদের একটা সাধারণ ভূমিও আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে-কথা বলেননি। তিনি আনন্দ ও কল্যাণের অভেদেই বিশ্বাসী। শুধু আনন্দ ও কল্যাণের ক্ষেত্রে নয়, কোনো রকম মৌলিক ভেদেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী নন।

১. “সাহিত্য”, ‘সাহিত্যের পথে’, ব।১৪।৩১১
২. “সাহিত্যরূপ”, ‘সাহিত্যের পথে’, ব । ১৪ । ৪০১
৩. “সাহিত্যধর্ম”, ‘সাহিত্যের পথে’, র । ১৪ । ৩২৯
৪. “সাহিত্যের তাৎপর্য”, ‘সাহিত্যের পথে’, ব । ১৪ । ৩৭৫
৫. তদেব, ব । ১৪ । ৩৭৫
৬. “সাহিত্যতত্ত্ব”, ‘সাহিত্যের পথে’, র । ১৪ । ৩৫৮
৭. “সাহিত্যের চিত্রবিভাগ”, ‘সাহিত্যের স্বরূপ’, ব । ১৪ । ৫২৪
৮. তদেব, ব । ১৪ । ৫৩৬
৯. “মানবপ্রকাশ”, ‘সাহিত্য’, ব । ১৩ । ৮৫৪
১০. “সাহিত্যের মূল্য”, ‘সাহিত্যের স্বরূপ’, ব । ১৪ । ৫৩৩
১১. “সৌন্দর্য ও সাহিত্য”, ‘সাহিত্য’, ব । ১৩ । ৭৭৫
১২. তদেব, ব । ১৩ । ৭৮০
১৩. “সাহিত্যের স্বরূপ”, ‘সাহিত্যের স্বরূপ’, র । ১৪ । ৫১০
১৪. “সাহিত্যতত্ত্ব”, ‘সাহিত্যের পথে’, ব । ১৪ । ৩৬০
১৫. “সাহিত্যের তাৎপর্য”, ‘সাহিত্যের পথে’, র । ১৪ । ৩৭৪
১৬. “সাহিত্য”, ‘সাহিত্যের পথে’, ব । ১৪ । ৩১১

কল্পনাতত্ত্ব

রবীন্দ্র-দর্শনে রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বে উপলব্ধিই সত্য, উপলব্ধিই সত্যের প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় উপলব্ধিকে বলেছেন অনুভূতি। বলা বাহুল্য, এ-অনুভূতি নিছক ফীলিং নয়। ফীলিং অবশ্যই থাকবে, কিন্তু মাত্র ফীলিংই নয়, সেই সঙ্গে গভীর-তর আরো একটা কিছু। রবীন্দ্রনাথ বলেন, অনুভূতি হ'লো হ'য়ে ওঠা। "অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্য কিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা,...অন্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা।"[১] এই যে অন্য কিছুর অনুসারে হ'য়ে ওঠা, একেবারে অন্য কিছু হ'য়ে যাওয়া, এইটে সম্ভব হয় যে-শক্তির সাহায্যে, রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন কল্পনা। প্রত্যেক অনুভূতির মধ্যেই কল্পনার ক্রিয়া আছে; কল্পনার সহযোগিতাতেই উপলব্ধি সত্যিকারের উপলব্ধি হ'য়ে ওঠে। উপলব্ধির মধ্যে বিষয় ও বিষয়ী এক হ'য়ে যায়। সুতরাং উপলব্ধিকে আমরা ঐক্যবোধও বলতে পারি। উপলব্ধি মাত্রেই আনন্দ। ঐক্যবোধ এবং আনন্দ পৃথক্ নয়। পুনশ্চ, মিলনের আনন্দ, ঐক্যের আনন্দ, একেই রবীন্দ্রনাথ প্রেম বলেছেন। ঐক্য, আনন্দ, প্রেম, যে-নামেই বলি না কেন, তা সত্য হ'য়ে ওঠে কল্পনার ক্রিয়াশীলতায়।

কল্পনার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "...যে-শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের হয়ে ওঠে সে-শক্তি হচ্ছে কল্পনা-শক্তি; এই কল্পনার শক্তিতে মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ ক'রে তোলে, যা কিছু আমাদের থেকে পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা সম্ভবপর হয়...।"[২] কল্পনার প্রসাদেই আমরা "সমগ্র ক'রে, একান্ত ক'রে, স্পষ্ট ক'রে" দেখতে পাই। কল্পনার দৃষ্টিই সত্য দৃষ্টি। কেননা, ঐক্যই সত্য। "আমাদের কল্পনার দৃষ্টি ঐক্যকে সন্ধান করে এবং ঐক্য স্থাপন করে।"[৩] সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথের মতে কল্পনা হ'লো অন্য কিছুকে আপন এবং আপনাকে অন্য কিছু করার শক্তি, স্পষ্ট ক'রে এবং সমগ্র ক'রে দেখার শক্তি, ঐক্য সংস্থাপনের শক্তি। রবীন্দ্রনাথের মতে এ-শক্তি সব মানুষের মধ্যেই আছে। মানুষের মধ্যে এই শক্তি কখনোই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে না। উপলব্ধি মানুষের স্বভাব-ধর্ম — মানুষের সমস্ত জ্ঞান সমস্ত

কর্ম অনুভব সংমিশ্রিত এবং সেই কারণে মানুষের প্রত্যেক চিন্তাতে, প্রত্যেক কর্মে — বস্তুত মানুষের সমগ্র চৈতন্যের মধ্যেই সব সময় এই শক্তি অল্পবিস্তর ক্রিয়াশীল।

সহজেই বোঝা যায়, এটা কল্পনা কথাটার প্রচলিত অর্থ নয়। কল্পনা বলতে আমরা সাধারণত সেই শক্তিকেই বুঝি যার সাহায্যে স্মৃতির টুকরোগুলিকে খুশিমতো জোড়া দিয়ে, খুশি মতো সাজিয়ে গুছিয়ে যে-কোনো রকমের ছবি বা কাহিনী রচনা করা যায়। প্রচলিত ধারণায়, কল্পনা হ'লো বস্তুর মানস-প্রতিবিম্ব রচনার শক্তি, ইমেজ নির্মাণের, ইমেজ সংগঠনের শক্তি। কল্পনার ক্ষেত্রে মূল উপাদানে আমাদের স্বাধীনতা নেই, স্বাধীনতা আছে কেবল সংগঠনের বেলায়। এই রকম একটা মানস-প্রতিবিম্ব রচনার শক্তি যে আমাদের মধ্যে আছে তাতে সন্দেহ নেই। তাকেই যদি আমরা কল্পনা বলি, তাহ'লে মানতেই হবে, কল্পনা পুরোপুরি স্মৃতিনির্ভর। পরবর্তীকালের পরিভাষায় এর নাম দেওয়া হয়েছে reproductive imagination, পুনর্গঠনমূলক কল্পনা।

প্রাচীনকালে এই স্মৃতিনির্ভর পুনর্গঠনশক্তির বাইরে অপর কোনো কল্পনাশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা হ'তো না। প্রাচীন সাহিত্যতত্ত্বে এই পুনর্গঠনের শক্তিকে বলা হয়েছে ফ্যাণ্টাসি। সাহিত্যে যে ফ্যাণ্টাসির স্থান আছে তা অস্বীকার করা হয়নি বটে, কিন্তু তাকে খুব বেশি গুরুত্বও দেওয়া হয়নি। পরবর্তীকালে, বিশেষ ক'রে রোমান্টিক কবি-শিল্পীদের কাছে আমরা পুনর্গঠন বৃত্তির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক আর-এক রকম শক্তির কথা শুনতে পেলাম। তাকে বলা হয়েছে সৃজনশীল কল্পনা। এ-শক্তি স্মৃতি-নির্ভর নয়। এ-কল্পনা পুনর্গঠন করে না, রূপকল্প নিয়ে খেলা করে না। কী উপাদান, কী সংগঠন সব দিক থেকেই এ-কল্পনা স্বাধীন। শিল্প-সাহিত্য এই কল্পনারই সৃষ্টি। একেই বলা হয়েছে 'কবিকল্পনা'। রোমান্টিক মতে কবিকল্পনাই যথার্থ কল্পনা। স্মৃতি-নির্ভর পুনর্গঠনের শক্তি কল্পনা নামেরই অযোগ্য। সাহিত্যে তার ভূমিকাও নগণ্য।

রবীন্দ্রনাথ যে-কল্পনার কথা বলেছেন, তা স্মৃতি-নির্ভর পুনর্গঠনশক্তি নয়। সে-কল্পনাও একটা সৃজনশীল শক্তি। কবিকল্পনা — সচরাচর যাকে কবিকল্পনা বলি — তা এই শক্তিরই একটা অংশ বা অঙ্গ, এই শক্তির একটা বিশিষ্ট প্রকাশ। প্রচলিত অর্থে কবিকল্পনার থেকে রবীন্দ্র-কথিত কল্পনা অনেক ব্যাপকতর শক্তি। এর সৃজনশীলতাও অনেক ব্যাপক। এ-কল্পনা কেবল কবি বা শিল্পীর সম্পত্তি নয়, সর্ব-মানবের সাধারণ ধর্ম। এ-কল্পনা প্রেমের অপরিহার্য সহায়, সত্যবোধের —, সত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। এরই সাহায্যে মানুষ নিজের জগৎকে সৃষ্টি করে এবং নিজেকে সৃষ্টি করে। যেহেতু সৃজনশীলতা মানুষের স্বধর্ম, সেই হেতু এ-কল্পনাও সার্বভৌম।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের মতে সব মানুষই আর্টিস্ট : "...man by nature is an artist।"[৪] মানুষ মাত্রেরই এই-যে স্রষ্টার ভূমিকা, এই স্রষ্টৃত্বের মধ্যেই কল্পনার ক্রিয়াশীলতা অব্যাহত। "...the world of our personality grows in area with a large and deeper experience of our personal self in our own universe through sympathy and imagination।"[৫] যদিও এখানে সহানুভূতি এবং কল্পনার কথা আলাদাভাবেই বলা হয়েছে, তা হ'লেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে এরা সব সময়ই এক সঙ্গে সমন্বিত। রবীন্দ্রনাথের বিচারে প্রেম, সহানুভূতি ও কল্পনা একেবারে অচ্ছেদ্য। সহানুভূতি ভিন্ন কল্পনা অচল। কল্পনা ছাড়া সহানুভূতি হয় না। এবং কল্পনা ও সহানুভূতি ছাড়া প্রেম নেই।"[৬]

আগেই দেখেছি, কল্পনার সাহায্যে আমরা অপরের মনের মধ্যে প্রবেশ করি, অপরের সঙ্গে এক হ'য়ে যাই, অপরের মতন ক'রে অনুভব করি। এই-যে অপরের মনের মধ্যে প্রবেশ করবার ক্ষমতা, এই ক্ষমতার প্রাবল্যই যে কবিকে কবি ক'রে তোলে, এই ধরণের একটা প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সের রচনাতেও দেখতে পাওয়া যায়। "চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "মর্মের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যে-কল্পনা আবশ্যক করে তাহাই কবির কল্পনা...।"[৭] এখানে কবিত্ব ও কল্পনা প্রায় সমার্থক। "নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব।"[৮] দেখতে পাচ্ছি, এখানে কল্পনা আর কবিকল্পনার পরিধি একই, কল্পনা আর কবিকল্পনা সম্পূর্ণ অভিন্ন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় কল্পনার পরিধি অনেকখানি প্রসারিত হ'য়ে সৃজনশীল মানব-স্বভাবের সঙ্গে এক হ'য়ে গিয়েছে। তখন থেকে কল্পনা আর কেবল কবিকল্পনা নয়। তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে কল্পনা মানবস্বভাবগত একটি মৌল শক্তি, কবিকল্পনা সেই সার্বভৌম মানব-কল্পনার একটি বিশিষ্ট শাখা। অপরের প্রাণের মধ্যে প্রবেশের শক্তি শুধু কবির নয়, সকলের। এই শক্তির কারণেই মানুষ স্রষ্টা, মানুষ মানুষ।

অপরের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করার এই ক্ষমতাকে বুদ্ধি বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ এর কল্পনা ছাড়া আর একটি নাম দিয়েছেন। বলেছেন, অনুভব। এ-রকম বলার তাৎপর্য এই যে, অনুভবের মধ্যেকার মূল কারয়িত্রী শক্তিই যখন কল্পনা, তখন উভয়কে এক নামে অভিহিত করলেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। অনুভব রবীন্দ্রনাথের কাছে সব সময়ই সম-অনুভব, সহমর্মিতা। বের্গসঁ অনেকটা এই ধরণের শক্তিকেই ইন্‌টুইশন নাম দিয়েছেন।[৯] অপরের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দেবার এই শক্তিকে

সহানুভূতি বললে এর পুরো পরিচয় হয় না: সহানুভূতির ক্ষেত্রে আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের বোধটা একেবারে নিঃশেষে মিলিয়ে যায় না। কেবল সহানুভূতিতে নিজেকে হারানো যায় না, গাছের সঙ্গে গাছ, নদীর সঙ্গে নদী হওয়া যায় না। তার জন্য একদিকে যেমন সম্পূর্ণ আত্মবিগলন দরকার, অন্যদিকে তেমনি অপরের মধ্যে নবজন্ম লাভের দরকার। কল্পনার সেই শক্তি আছে। জার্মান ভাষায় যাকে বলা হয়েছে Einfühlung, ইংরেজিতে যাকে বলা হয়েছে empathy, কেউ কেউ বলেছেন inner mimicry — যাকে বলতে পারি 'feeling into', এ অনেকটা সেই জাতের শক্তি।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। অপরের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলাতেই কল্পনার শেষ নয়। আবার নিজেকে ফিরে পাওয়াও দরকার। তা না হ'লে মিলন অর্থহীন হ'য়ে যাবে। কল্পনা কেবল সিম্প্যাথিও নয়, কেবল এম্প্যাথিও নয়, কেবল ইন্টুইশনও নয়, এর সবই। এমন-কি বুদ্ধি এবং বাস্তববোধও এর থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত নয়। এ হ'লো 'দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়ার' অন্তহীন প্রক্রিয়া। রবীন্দ্রনাথ গূঢ় অর্থে একেই বলেছেন সৃষ্টিলীলা। এই লীলাই মানুষের। 'কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র অনুভব', নিজেকে বহুর মধ্যে বিচিত্রের মধ্যে অনুভব, বিশ্বকে নিজের মধ্যে এবং নিজেকে বিশ্বের মধ্যে — বিশ্বময় অনুভব করা, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এই লীলাই মানুষের। রবীন্দ্রনাথের লীলাবাদ থেকে তাঁর কল্পনাতত্ত্বকে পৃথক করা যায় না। এইখানেই তাঁর কল্পনাতত্ত্বের বিশিষ্ট গুরুত্ব। এর স্বকীয়তাও বোধকরি এইখানেই। এই কারণে বিষয়টিকে একটু বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে রেখে দেখা দরকার।

একটা কথা প্রথমেই স্পষ্ট ক'রে নেওয়া দরকার। কল্পনার সঙ্গে কল্পনাতত্ত্বকে যেন আমরা গুলিয়ে না ফেলি। কল্পনা একটা শক্তি, তা সর্বদেশের, সর্বকালের, সর্বমানবের। এ-শক্তি আগেও ছিলো, পরেও থাকবে। কল্পনাতত্ত্ব তা নয়। তত্ত্ব হিসেবে এর ইতিহাস মানব-চিন্তার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। প্রেক্ষাপটটা কল্পনার নয়, কল্পনাতত্ত্বের। অর্থাৎ প্রেক্ষাপটের বিবেচনা নিতান্তই ঐতিহাসিক বিবেচনা, তার বেশি নয়।

যদিও কল্পনা প্রত্যয়টি আজকাল খাঁটি ভারতীয় প্রত্যয় ব'লেই গণ্য হ'য়ে থাকে, এর তত্ত্বগত সারাংশকে কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব থেকেই আমদানি ক'রে নিয়েছি। ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রে অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞার কথা আছে। অনুমান করতে পারি, এই প্রজ্ঞা কল্পনারই অনুরূপ একটা সৃজনী-শক্তি। ভারতীয় সাহিত্য-শাস্ত্রে কবিপ্রতিভার কথাও আছে। যতোদূর মনে হয়, প্রতিভা বলতে ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রীরা কল্পনার মতো একটা শক্তিকেই বুঝেছিলেন। কিন্তু এই

শক্তির বিচার-বিশ্লেষণ তাঁরা করেননি, এই শক্তির কোনো রকম রহস্য-উদ্‌ঘাটনে তাঁরা ব্রতী হননি। একে নিয়ে তাঁরা কোনো তত্ত্ব গ'ড়ে তোলেননি। কল্পনা কথাটাও — রচনা করা বা সম্পাদন করা অর্থে — খাঁটি স্বদেশী কথাই বটে, কিন্তু বর্তমানে যে-তত্ত্বকে আমরা কল্পনাতত্ত্ব ব'লে থাকি, তা মোটেই ভারতীয় সাহিত্য-শাস্ত্রের নিজস্ব জিনিস নয়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে কল্পনার স্থান অতি উচ্চে। পাশ্চাত্য রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্বেও তাই। পাশ্চাত্য রোমান্টিক কল্পনাতত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতত্ত্বের মিলও সুগভীর। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতত্ত্বকে যদি পাশ্চাত্য-প্রভাবিত ব'লে বর্ণনা করি, তাহ'লে মোটের উপর খুব ভুল কথা বলা হবে না।

সাধারণভাবে কথাটা হয়তো ভুল নয়, কিন্তু তার তাৎপর্যকে বেশি দূর টানতে গেলে বিভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। প্রভাবের সাধারণ সত্যকে অস্বীকার করছি না, কিন্তু এই প্রভাবের অনেকটাই যে উদ্‌বেজনা-জাতীয়, এবং এর মধ্যে যে যুগ-পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক ভাব-পরিমণ্ডলের সাম্যজনিত চিন্তাসাম্য, ভাবসাম্যও অনেকখানি আছে, সে-কথা ভুললে চলবে না। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতত্ত্বের আসল ভিত্তি যে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি-অভিজ্ঞতা সে-কথাও স্মরণ রাখতে হবে। সেই সঙ্গে এ-ও স্মরণ রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতত্ত্ব পাশ্চাত্য রোমান্টিক কল্পনাতত্ত্বের ঐতিহাসিক পরিণতি-ধারাকে অনুসরণ করেনি, সে তার নিজের পথেই অগ্রসর হয়েছে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতত্ত্ব তাঁর সামগ্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত যে, কোনো বাইরের প্রভাবের পক্ষেই এ-রকম নিবিড় সংযোগ সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতত্ত্ব তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব ও লীলাবাদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে এমন একটি সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, পাশ্চাত্য রোমান্টিকদের — বিশেষ ক'রে ইংরেজ রোমান্টিকদের কারো ক্ষেত্রেই তার তুলনা মিলবে না, এমন-কি কোল্‌রিজের ক্ষেত্রেও না।

পাশ্চাত্য চিন্তায় আজকাল কল্পনার যে-মর্যাদা দেখতে পাওয়া যায়, তা একেবারেই আধুনিক কালের ব্যাপার। ক্লাসিক্যাল যুগের দর্শনে বা সাহিত্যতত্ত্বে কল্পনার কিছুমাত্র মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়নি। ক্লাসিক্যাল যুগের উত্তর-পর্বেও তাই।[১০] এ-ব্যাপারে মধ্যযুগও এই ঐতিহ্যকেই বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ ক'রে এসেছে। এমন-কি রেনেসাঁসের প্রথম পর্বেও কল্পনার সম্পর্কে মনোভাবের কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। সৃষ্টি কথাটার উপর যখন থেকে জোর পড়েছে, তখন থেকেই কল্পনার মর্যাদাবৃদ্ধি ঘটতে শুরু করেছে। অন্যদিক থেকে এ-রকমও বলা যায় যে, অনুকরণ

কথাটার যখন থেকে মর্যাদাহানি ঘটতে শুরু করেছে, তখন থেকেই কল্পনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। তার আগে নয়।

ক্লাসিক্যাল মতে কল্পনা হ'লো ইমেজ-গঠনের বা মানস-প্রতিবিম্ব সংরচনের শক্তি। শক্তিটা কিছু কাজের নয়, নিতান্তই একটা খামখেয়াল, রূপকল্প নিয়ে অর্থহীন খেলা — মিথ্যার বেসাতি করা। সাহিত্য বা শিল্প মিথ্যার বেসাতি করে না। ক্লাসিক্যাল মতে সাহিত্যের কাজ হ'লো অনুকরণ। এই কারণেই, সাহিত্যরচনায় কল্পনার কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সম্ভব নয়। ফ্যাণ্টাসির হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিলে তা আর যা-ই হোক, সৎসাহিত্য হবে না। আদৌ সাহিত্য হবে কি না, সে-প্রশ্নও উঠতে পারে।

পরিবর্তনের সূত্রপাত রেনেসাঁসের প্রথম পর্ব থেকেই ধরা যায়। তবে তা এতো ক্ষীণ. এতো দ্বিধাগ্রস্ত যে, তাকে সাধারণত পরিবর্তন ব'লে গণ্যই করা হয় না। আসল কথা, অনুকরণবাদ তখনো প্রবল প্রতাপান্বিত। এ-প্রসঙ্গে স্ক্যালিজার বা সিড্নির নাম উল্লেখ করা যায়। দুজনেই কবিকে স্রষ্টা ব'লে স্বীকার করেছিলেন, অথচ দুজনেই খাঁটি অনুকরণবাদী। কবি যদি অনুকরণকারীই হন, তাহ'লে আর তাঁর স্রষ্টা হবার সুযোগ কতোটুকু? কাব্য যদি নিছক অনুকরণই হয়, তাহ'লে সেখানে সৃজনশীল কল্পনার অধিকার যে খুব বেশি থাকতে পারে না, এ তো সহজেই বোঝা যায়।

সাহিত্যতত্ত্বে কল্পনার প্রতিষ্ঠালাভের প্রথম ধাপ বোধকরি বেকনই রচনা করেছেন। তাঁর মতে কাব্যের ক্ষেত্রে কল্পনারই একাধিপত্য। বেকন স্পষ্টই বলেছেন, ইতিহাস স্মৃতি-মূলক, দর্শন বিচার-মূলক আর কাব্য কল্পনামূলক। তা হ'লেও বেকনের কল্পনাতত্ত্ব এম্পিরিক্যাল কল্পনাতত্ত্ব। বেকনের মতে কল্পনার কাজ পুনর্গঠন। সে অনেক রকম মজাদার বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু কখনোই সত্যকে দিতে পারে না। কাব্য — যেহেতু তা কল্পনা-মূলক, সে কেবল লঘু ধরণের কিছু আনন্দই মাত্র দিতে পারে, আর কিছু পারে না। কাব্যকে বেকন সত্য ব'লে স্বীকার করেননি। বলেছেন, অসত্য-মূলক ইতিহাস 'feigned history'। বেকনের সাহিত্যতত্ত্বে সাহিত্যের গৌরবহানির ফলে কল্পনার গৌরবও শেষ পর্যন্ত অর্থহীন হ'য়ে পড়েছে।

নিও-ক্লাসিক্যাল পর্বে ঝিমিয়ে-পড়া অনুকরণবাদ আবার আরো শক্তিশালী হ'য়ে দেখা দিয়েছে। তার ফলে কল্পনা কাব্যরাজ্য থেকে প্রায় নির্বাসিত হ'য়ে পড়েছে। জনসন তো স্পষ্টই বলেছেন, "All predominance of fancy [কল্পনা] over reason is a degree of insanity"। নিও-ক্লাসিক্যাল পর্বের মাঝখানেই একটা ভিন্নতর সুরের মৃদু আভাসও কিন্তু শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। তবে তা অনুকরণবাদের

পরিধিকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। এ্যাডিসন, ইয়ং কি রেনল্ড্‌স, এঁরা সকলেই কল্পনার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন, কিন্তু কেউই কল্পনাকে সত্যদ্রষ্টা ব'লে দাবি করেননি। প্রি-রোমান্টিকেরা অল্পবিস্তর সকলেই কল্পনা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কিন্তু কেউই পুরোপুরি দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এ-দ্বিধার সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছে রোমান্টিক রিভাইভ্যালের পর্বে।

এটা অবশ্য বিশেষ ক'রে সাহিত্যের এবং সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রেরই কথা। বিশুদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রে কল্পনার প্রতিষ্ঠালাভ এর অনেক আগেই ঘ'টে গিয়েছে। যে কারণেই হোক, ইংরেজি সাহিত্যতত্ত্বে কল্পনার ব্যাপারে ইংরেজ দার্শনিকদের প্রত্যক্ষ প্রভাব-পাত খুব একটা লক্ষ করা যায় না। কিন্তু জার্মান সাহিত্যতত্ত্বে তখনকার জার্মান দার্শনিকদের প্রভাব সুপ্রত্যক্ষ। জার্মান রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্ব সরাসরি জার্মান দর্শনের পালাবদলের সঙ্গে যুক্ত। ইংরেজি সাহিত্যতত্ত্বে রোমান্টিকতার প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রে জার্মান রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্বের দান অনেকখানি। এই দান নানাদিকে। তার মধ্যে প্রথমেই বোধকরি কল্পনাতত্ত্বের নাম করা যায়। সন্দেহ নেই যে, মেজাজের মৌলিক পার্থক্যের কারণে জার্মান রোমান্টিকদের কল্পনাতত্ত্ব ইংল্যাণ্ডে এসে অনেকখানি পরিবর্তিত আকার ধারণ করেছে, তবু উভয়ের যোগসূত্র অতি ঘনিষ্ঠ। এর উৎস খুঁজতে হ'লে আমাদের কাণ্টের দর্শনে গিয়ে পৌঁছতে হবে।

কাণ্টের পূর্বে হিউম তাঁর দর্শনে কল্পনাকে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিয়েছেন সন্দেহ নেই। বস্তুত দর্শনের ক্ষেত্রে কল্পনার মর্যাদালাভের প্রসঙ্গে হিউমের নামই সকলের আগে করা প্রয়োজন। কিন্তু হিউম-দর্শনের কল্পনাতত্ত্ব সাহিত্যচিন্তাকে সরাসরিভাবে প্রভাবিত করেনি। যুক্তির শূন্য আসনে হিউম কল্পনাকে এনে বসিয়েছিলেন। হিউমের মতে কল্পনাই মনের শৃঙ্খলাবিধায়িনী শক্তি। তবে, বলাই বাহুল্য, সে-শৃঙ্খলার সঙ্গে সত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। কল্পনা সত্যদ্রষ্টা নয়। হিউমের পক্ষে অবশ্য এই রকম বলাটাই স্বাভাবিক। তার কারণ হিউমের দর্শনে খুব পরিমিত এবং সুনির্দিষ্ট একটা সীমানার বাইরে, সত্য ব্যাপারটাই নিরুদ্দিষ্ট। সংশয়ই সেখানে শেষ কথা। কল্পনার যা-কিছু ক্রিয়া-কর্ম তা-ও সবই সন্দেহের দ্বারা স্পৃষ্ট। রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্বে এই মতবাদের কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব থাকা স্বাভাবিক ব'লেও মনে হয় না।

কী জ্ঞানের ক্ষেত্র এবং কী অনুভবের অর্থাৎ শিল্পের ক্ষেত্র, এই উভয়ক্ষেত্রেই কল্পনার ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই মতবাদ কাণ্টই প্রথম যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাণ্টের মতে জ্ঞান এবং অনুভব, দুই ক্ষেত্রেই কল্পনা সৃজনশীল। যে-সত্যে

মানুষের অধিকার, সে-সত্য মানুষ কল্পনার সাহায্যেই পেয়ে থাকে। কান্টের মতে কল্পনা ভিন্ন জ্ঞান অসম্ভব। প্রত্যেকটি জ্ঞান-ব্যাপারে কল্পনা ক্রিয়াশীল। তার কাজ জ্ঞানের বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত উপাদানসমূহকে সংহত করা, তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বিধান করা। এইখানেই শেষ নয়। অনুভবের ক্ষেত্রেও, সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্রেও, সৌন্দর্যচেতনার ক্ষেত্রেও কল্পনা অপরিহার্য। শুধু অপরিহার্য নয়, এখানে কল্পনারই প্রভুত্ব। জ্ঞানের ক্ষেত্রে কল্পনা সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, সেখানে কল্পনাবোধের (understanding) অনুগামী ; কিন্তু শিল্পচেতনা সৌন্দর্য-চেতনার ক্ষেত্রে বোধই কল্পনার অনুগামী। এই কল্পনা পুনর্গঠনকারী নয় — স্বাধীন, স্বয়ংক্রিয়, স্বয়ংসিদ্ধ। কল্পনাশক্তির অবাধ সৃজনশীলতাকে মুক্ত ক্রীড়া ব'লে বর্ণনা করা যেতে পারে। কান্ট বলেছেন, 'free play'। রাবীন্দ্রিক পরিভাষায় বলতে পারি, লীলা।

কান্টের পরে এই তত্ত্ব যথোপযুক্ত বিবর্তনের ধারা অনুসরণ ক'রে জার্মান রোমান্টিক দর্শনে ও সাহিত্যতত্ত্বে, এবং সেখান থেকে স্থানকালোপযোগী পরিবর্তন পরিবর্ধনের মধ্যে দিয়ে ইউরোপের নানা দেশের সাহিত্যচিন্তায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। প্রধানত কোল্‌রিজ মারফৎই কল্পনা-কেন্দ্রিক রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্ব ইংরেজি সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে বসে।

ইংরেজ রোমান্টিকদের মধ্যে কল্পনাতত্ত্বের প্রসঙ্গে একদিকে ব্লেকের নাম এবং অন্যদিকে কোল্‌রিজের নাম ও তৎসহ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্লেকের কল্পনাতত্ত্ব প্রবলভাবে অন্তর্মুখী, একান্তভাবে অহংকেন্দ্রিক। এবং কার্যক্ষেত্রে এই তত্ত্ব প্রচণ্ডভাবে বাস্তব-বিমুখ। কোল্‌রিজের কল্পনাতত্ত্ব অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত এবং অপেক্ষাকৃত অনুগ্র। এর মধ্যে কোনো বাস্তব-বিমুখী উত্তেজনার অবকাশ নেই। এই কল্পনাতত্ত্ব সূক্ষ্মভাবে কান্ট-অনুসারী এবং প্রত্যক্ষভাবে শ্লেগেল-ভ্রাতৃদ্বয়ের কল্পনাতত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত। শেলি এবং কীট্‌স এঁদের কারো কল্পনাতত্ত্বই খুব সুপরিণত নয়। কার্যত এঁরা ব্লেক এবং কোল্‌রিজ এই দুই ধারার মধ্যবর্তী। রোমান্টিকতার পরবর্তী পর্যায়ে কল্পনাতত্ত্বের প্রসঙ্গে হ্যাজ্‌লিট, রাস্কিন এবং 'ইস্থেট্'গোত্রের রোমান্টিকদের নাম উল্লেখযোগ্য। যে-কথা এখানে আমাদের প্রয়োজনের দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তা হ'লো এই যে, এই সব ইংরেজ কবি ও সাহিত্যশাস্ত্রীদের রচনার সঙ্গে উনবিংশ শতকের বাঙালী কবি-সাহিত্যিকেরা সকলেই অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত ছিলেন। কথাটা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সরাসরি জার্মান সাহিত্য থেকেই হোক, অথবা ইংরেজ রোমান্টিকদের কাছ থেকেই হোক, কিংবা একই সঙ্গে যে-কোনো একাধিক পথেই হোক, মোট কথা হ'লো

এই যে, উনবিংশ শতকের অন্তত মাঝামাঝি কালেই — অর্থাৎ রবীন্দ্র-পূর্ব যুগেই পাশ্চাত্য কল্পনাতত্ত্বের ঢেউ বাংলা সাহিত্যের তটে এসে লেগেছিল। মধুসূদনে এবং বঙ্কিমচন্দ্রে তার অনেক প্রমাণ মিলবে। কিন্তু তত্ত্ব হিসেবে এর যথোপযুক্ত প্রসার — এবং এর যথার্থ স্বাঙ্গীকরণ রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেই মিলবে, তার পূর্বে নয়। কাণ্ট যে-কল্পনার কথা বলেছিলেন, তা কেবল কবিশিল্পীর সম্পত্তি নয়, তা সর্ব-মানবের। এবং তা সর্ব-জ্ঞানে, সর্ব-অনুভবে উপস্থিত। অর্থাৎ তা প্রচলিত অর্থে কবিকল্পনা নয় — একটা সর্বজনীন শক্তি। কোল্‌রিজ বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও কল্পনাকে অনেকটা এই রকম ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও তাই।

কোল্‌রিজের মতো রবীন্দ্রনাথও কল্পনাকে ঐক্যবিধায়ক শক্তি, বিপরীত-গলানো বিরোধ-মেলানো শক্তি ব'লে মনে করেন। কোল্‌রিজ যেমন কল্পনা আর ফ্যান্সির মধ্যে স্পষ্ট একটা ভেদরেখা টেনেছেন, রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও স্থানবিশেষে কল্পনা ও কাল্পনিকতার মধ্যে সেই রকম একটা ভেদ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে: "কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকার-বদ্ধ — কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র, কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসঙ্গতরূপে স্ফীতকায়।...যাহাদের ক্ষমতা অল্প তাহারা সাহিত্যের প্রায় এই প্রধূমিত কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়া থাকে...।" (র।১৩।৮৯৫)

ইংরেজী সাহিত্যতত্ত্বে কোল্‌রিজের যে-রকম প্রতিপত্তি, তাতে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতত্ত্বে কোল্‌রিজের প্রভাব না-থাকাটাই বিচিত্র, থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুয়ের মধ্যে কেবল যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের চিহ্ন নেই তাই নয় ঝোঁকের ভিন্নতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে মতের ভিন্নতাও বেশ লক্ষ করা যায়।

কোল্‌রিজ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানকে (perception) অথবা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের মূলীভূত শক্তিকে বলেছেন, 'প্রাথমিক কল্পনা' (Primary Imagination) এবং লোকে যাকে কল্পনা বলে সেই সৃজনশীল কল্পনাকেই বলেছেন, 'দ্বিতীয় স্তরের কল্পনা' (Secondary Imagination)। কোল্‌রিজ প্রত্যক্ষ এবং কল্পনা উভয়কেই সমজাতীয় ব'লে বর্ণনা করেছেন এবং দ্বিতীয়টিকে অর্থাৎ কল্পনাকে প্রথমটির অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অনুগামী ব'লে সিদ্ধান্ত করেছেন। কোল্‌রিজের মতে প্রথমের সঙ্গে দ্বিতীয়টির পার্থক্য শুধু মাত্রা বা পরিমাণের এবং কর্ম-পদ্ধতির ('differing only in degree, and in the mode of operation')। এই রকম বিভাগ, বা এই বিভাগের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, এর কিছুই রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতত্ত্বে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কল্পনার শক্তি এবং ক্রিয়া সম্পর্কে কোল্‌রিজ যা বলেছেন, তার অনেকটাই রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু কিছু আপত্তিরও ক্ষেত্র আছে। কোল্‌রিজ বলেছেন, "It [কল্পনা] is essentially vital even as all objects (*as* objects) are essentially fixed and dead" ।[১১] এই বাক্যের প্রথমাংশ রবীন্দ্রনাথ সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করবেন। কিন্তু শেষের অংশ "...all objects (*as* objects) are essentially fixed and dead", একে রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই সমর্থন করতে পারবেন না। কারণ, এ-কথা রবীন্দ্র-চিন্তার সম্পূর্ণ বিরোধী — রবীন্দ্র-দর্শনের মৌল তত্ত্বেরই প্রতিকূল।

কাণ্ট, কিংবা কোল্‌রিজ-ওয়ার্ডসওয়ার্থ, অথবা রবীন্দ্রনাথ, এঁরা যে-কল্পনার কথা বলেছেন, তা বিশিষ্ট অর্থে কবিকল্পনা নয়, সর্বসাধারণের কল্পনা। কিন্তু ব্লেক কল্পনা বলতে বিশিষ্ট অর্থে কবিকল্পনাকেই বুঝেছিলেন। কাণ্টের সঙ্গে তুলনা করলেই ব্লেকের বক্তব্যের মর্মটা স্পষ্ট বোঝা যাবে। কাণ্ট এবং ব্লেক উভয়েই মনে করেন, জ্ঞানে কল্পনা অপরিহার্য। কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞান কথাটার অর্থ এক নয়। কাণ্ট যে-জ্ঞানের কথা বলেছেন, তা সর্বসাধারণের লভ্য জ্ঞান, কাণ্টের জ্ঞান-জগৎ আমাদের পরিচিত বাস্তব জগৎ। আর ব্লেক যাকে জ্ঞান বলেছেন, তা হ'লো দিব্যজ্ঞান, পরম জ্ঞান। সে আর যা-ই হোক না কেন, আমাদের পরিচিত বস্তু-জ্ঞান নয়।

ব্লেকের মতে তথাকথিত বস্তুজ্ঞান জ্ঞানই নয়। তা দিব্যজ্ঞানের বিরোধী। তথাকথিত বাস্তব দিব্যসত্যের বিরোধী। বাস্তব-জগৎ কল্পনার জাত-শত্রু। নিজের প্রসঙ্গে ব্লেক বলেছেন, "Natural objects always did and now do weaken, deaden and obliterate imagination in me."। ব্লেক মনে করেন, "Imagination is spiritual sensation", এবং কেবল কবিশিল্পীরাই এই আধ্যাত্মিক দিব্যানুভূতির অধিকারী, কেবল তাঁরাই হলেন, "man of Imagination"। ব্লেকের বক্তব্য হ'লো, "···to the eyes of the man of Imagination, Nature is Imagination itself" এবং "One power alone makes a poet : imagination, the divine vision"। ব্লেকের কাছে কেবল কল্পনা নামক দিব্যানুভূতির অধিকারীরাই কবি। রবীন্দ্রনাথের কাছে সব মানুষই স্রষ্টা, সব মানুষই কবি।

সাহিত্যতত্ত্বে কোল্‌রিজের স্থান যতোই উচ্চ হোক না কেন, সাধারণভাবে এ-কথা বলা চলে যে, ইংরেজ রোমান্টিক কবি-সাহিত্যিকদের কল্পনাতত্ত্ব শেষ পর্যন্ত কোল্‌রিজ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নির্দেশিত পথ ধ'রে চলেনি, বরং অল্পবিস্তর ব্লেকের পথকেই অনুসরণ করেছে। শুধু ইংল্যাণ্ডে নয়, প্রায় সর্বত্রই রোমান্টিকচিন্তা একই ধরনের পরিণামের

দিকে ঝুঁকেছে। কল্পনা যেন একটা দিব্য জ্যোতি, একটা অলৌকিক আবির্ভাব, একটা রহস্যময় জাদুশক্তি। যিনি এই জাদুশক্তির অধিকারী, যাঁর জীবনে এই অলৌকিক আবির্ভাব ঘটেছে, তিনি ভাগ্যবান। তিনিই কবি, তিনিই সত্যদ্রষ্টা। বাকিরা চোখ থেকেও অন্ধ। কল্পনার এই দিব্যদৃষ্টিই সৌন্দর্যদৃষ্টি। যা-কিছু এই দৃষ্টিতে — কল্পনাদৃষ্টি বা সৌন্দর্যদৃষ্টিতে ধরা পড়ে, তা-ই সত্য। এবং কেবল তা-ই সত্য যা এই দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত। তথাকথিত বাস্তবদৃষ্টি দিয়ে যা-কিছু দেখি সব মিথ্যা।

কীট্‌সের কল্পনাতত্ত্বেও এই কবি-কল্পনার উপরেই জোর পড়েছে। একটি চিঠিতে কীট্‌স বেশ স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন, "I am certain of nothing but of the holiness of the Heart's affection and the truth of Imagination — What the Imagination seizes as Beauty must be truth — whether it existed before or not..." [*Letters*]। অপর একটি চিঠিতে, "I never can feel certain of any truth, but from a clear perception of its Beauty." [*Letters*]। কীট্‌স যখন বলেন, "Beauty is truth, truth beauty", তখন তাঁর আসল জোর কথাটার প্রথম অংশের উপর। এখানে আসলে তিনি সৌন্দর্যদৃষ্টি বা কবি-কল্পনারই গুণগান করছেন। কীট্‌সের কথার ব্যঞ্জিত অর্থ হ'লো : সবার উপরে সৌন্দর্যই সত্য, তাহার উপরে নাই। তাহার বাইরেও নাই। সৌন্দর্য ছাড়া আর সব মিথ্যা। যা কবিকল্পনায় উদ্ভাসিত হয় কেবল তা-ই সত্য — ব্লেকের মতো কীট্‌সেরও এই কথা।

রবীন্দ্রনাথও প্রায় অনুরূপ কথাই বলেছেন, কিন্তু তাঁর মর্মার্থটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি কীট্‌সের এই উক্তি একাধিকবার উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তিনি কীট্‌সের কথার শেষ অংশটাকেই আগে বসিয়েছেন। তাঁর জোর এই অংশটার উপরেই : Truth is Beauty। রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্যটাই আগে। সত্য যেহেতু আনন্দ-দায়ক, তাই তাকে সুন্দর বলি। রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্যমাত্রেই সুন্দর, অর্থাৎ অসুন্দর কিছুই নেই। কীট্‌স করেছেন দৃষ্টিবিশেষের মাহাত্ম্যকীর্তন। আর রবীন্দ্রনাথ করেছেন সত্তামাত্রের গৌরবঘোষণা। রবীন্দ্রনাথের কথার অর্থ হ'লো এই যে, অস্তিত্বমাত্রেই আনন্দময়।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতত্ত্বের তুলনায় উত্তর-পর্বের পাশ্চাত্য রোমান্টিক কল্পনাতত্ত্ব অনেক সংকীর্ণ। এই সংকীর্ণ সংকুচিত কল্পনাতত্ত্বেরই অন্যতম ঐতিহাসিক পরিণাম হ'লো 'ইস্থেট্ কাল্ট', সৌখিন সৌন্দর্যপূজা, শীর্ণ সুকুমার অতিললিত সৌন্দর্যবাদ। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতত্ত্ব রোমান্টিক কল্পনাতত্ত্বের স্বাভাবিক পরিণামকে স্বীকার করেনি।

ইস্থেট্‌দের সৌন্দর্যবিলাসকে রবীন্দ্রনাথ যে কিছুমাত্র সমর্থন করতে পারেননি, এ-কথা আমাদের সকলেরই সুবিদিত। পাশ্চাত্য রোমান্টিক কল্পনাতত্ত্বে সর্বত্রই প্রত্যক্ষ বাস্তবের প্রতি একটা অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধার ভাব লক্ষ করা যায়। এর কারণটা সম্ভবত সমাজগত, অর্থাৎ ঐতিহাসিক। বাস্তবের প্রধানতম সত্য যেখানে ধনতান্ত্রিক যন্ত্রসভ্যতা, হৃদয়হীন কল-কারখানা, যান্ত্রিক জীবনযাত্রা, সেখানে এই নিষ্ঠুর বাস্তবের দ্বারা প্রতিহত কবির পক্ষে এই ধরনের অভিমানী প্রতিক্রিয়া বোধ করি অস্বাভাবিক নয়।

কারণটা যা-ই হোক না কেন, প্রতিক্রিয়াটাকে সুস্থ বলা যায় না। জীবনের প্রতি এই ক্ষুব্ধ, সন্দিগ্ধ এবং প্রতিকূল মনোভাব সাহিত্য এবং সাহিত্যতত্ত্ব উভয়কেই সংকুচিত এবং আত্মমগ্ন ক'রে ফেলে। রোমান্টিক কল্পনাতত্ত্বের অতিরিক্ত অন্তর্মুখিতা এবং রুগ্ন জীবনবিমুখিতার মূল সম্ভবত এইখানেই।[১২] রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতত্ত্বে এই ক্ষুব্ধ অভিমানের, এই পলায়নী ভাববিলাসের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। তার মধ্যে অসুস্থতার আভাস মাত্র নেই। আর যা-ই বলি, তাকে বাস্তব-বিমুখ বলা চলবে না।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতত্ত্ব বাস্তব-বিমুখ নয়, এ-কথা বললে তর্ক উঠতে পারে। কথাটা কী-অর্থে এবং কেন বলছি তা খুলে বলা দরকার। সাহিত্যের প্রসঙ্গে বাস্তব কথাটাকে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়ই খুব অশ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন। বস্তুতান্ত্রিক বলতে যে-ধরনের সাহিত্যকে আমরা সচরাচর বুঝে থাকি, যার মধ্যে প্রকাশের নগ্নতা ও স্থূলতা উচ্চকণ্ঠে নিজের বাস্তবিকতাকে ঘোষণা করতে থাকে, সেই ধরনের বস্তুতান্ত্রিকতাকে যে রবীন্দ্রনাথ কখনোই সমর্থন করেননি, তা আমরা সকলেই জানি। সাহিত্য যে বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত, এ-কথাও রবীন্দ্রনাথ বার-বার বলেছেন। একে কি বাস্তব-বিমুখিতা বলা যায় না?

গোলমাল বাস্তব কথাটাকে নিয়ে। বাস্তব কথাটার নানান্ মানে, নানান্ অভিব্যঞ্জনা। রবীন্দ্রনাথও নানান্ সময় কথাটাকে নানান্ অর্থে ব্যবহার করেছেন। কোন্ অর্থটাকে এখানে ধরবো? রবীন্দ্রনাথ বাস্তব-বিমুখ, এই কথাটায় যখন আপত্তি করি, তখন বাস্তব বলতে আমরাই বা ঠিক কি বুঝি? বাস্তবতা বলতে যদি একান্ত বস্তুলগ্নতা বুঝি, তাহ'লে সে-বাস্তবতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে বিমুখতা ছিলো তা মানতেই হবে। সে-অর্থ এখানে আমরা গ্রহণ করছি না। জীবনপ্রেমিক মাত্রেই যে-অর্থে বাস্তবমুখী, আমরা সেই অর্থেই রবীন্দ্রনাথকে বাস্তবমুখী বলতে চাই। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতত্ত্ব জীবন ও জগৎ-মুখী কল্পনাতত্ত্ব, জীবনপ্রেমিকের কল্পনাতত্ত্ব।

সমকালীন ইউরোপীয় সাহিত্যে এবং বাংলা সাহিত্যের তরুণদের মধ্যে বস্তুবাদ বা বস্তুতান্ত্রিকতার নাম ক'রে যে-ধরনের সাহিত্যের বহুল প্রচলন হয়েছিলো, রবীন্দ্রনাথ তার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের আসল আপত্তি সেই প্রচলিত ফ্যাশনের বিরুদ্ধে। কিন্তু তার পেছনে যে-তত্ত্ব অন্তর্নিহিত, তাকে রবীন্দ্রনাথ যথোপযুক্তভাবে বিশ্লেষণ ও বিচার করেননি। বস্তুতান্ত্রিকতা কেবল বিষয় নিয়ে নয়। অথবা, আদৌ বিষয় নিয়েই নয়। বস্তুতান্ত্রিকতা বিষয়কে দেখার বৈশিষ্ট্যে, প্রকাশ করার বৈশিষ্ট্যে। বস্তুতান্ত্রিকতা একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং একটি বিশেষ প্রকাশ-রীতি। রবীন্দ্রনাথের মতে, বস্তুতান্ত্রিকতা বিষয়কে অতি-নৈকট্যে স্থাপিত করে, তার দৃষ্টি আসক্তি-বিজড়িত। স্পষ্ট ক'রে এ-কথা না বললেও, সহজেই বুঝতে পারি এইখানেই রবীন্দ্রনাথের আসল অভিযোগ।

সাহিত্যে রিয়ালিজম্ কথাটার পরিধি অতি বিস্তৃত। স্থূল বস্তু-লগ্ন যথাযথতা, বিষয়কে অতি-নৈকট্যে স্থাপিত ক'রে লৌকিক উত্তেজনাকে উপভোগ করা, বস্তু-আসক্ত ন্যাচারালিজম্, এই ধরনের সংকীর্ণ-সীমানার বস্তুতান্ত্রিকতাকেও আমরা রিয়ালিজম্ বলি ; আবার গভীর এবং মর্মগত জীবনসত্যের প্রকাশ, বস্তুর অব্যবহিত যথাযথতাকে প্রয়োজনমতো লঙ্ঘন ক'রে তার ভাবসত্যকে প্রতিষ্ঠা করা, তাকেও আমরা রিয়ালিজম্ বলি। বাস্তব-সত্য উভয়েরই লক্ষ্য। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে অতি-নৈকট্যের দরুণ, সম্ভবত আসক্তির দরুণ বস্তুভার প্রবল হ'য়ে বাস্তব-সত্যকে বিকৃত ক'রে দেয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা করে না। রবীন্দ্রনাথের আপত্তি প্রথম ক্ষেত্রের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয়ের বিরুদ্ধে নয়।

রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়ই প্রচলিত বস্তুতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করেছেন। তখন বাস্তব কথাটাকে তিনি স্থূল অর্থেই গ্রহণ করেছেন, যান্ত্রিক বস্তু–বাদীরা সাধারণত যে-অর্থে গ্রহণ ক'রে থাকেন সেই অর্থে। দুঃখের কথা, এই আপত্তির সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ যুক্তি খুব কমই প্রয়োগ করেছেন, এখানে তাঁর প্রধান অস্ত্র উপমা এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। এবং সে-উপমা সে-ব্যঙ্গ বস্তুবাদের মূল তত্ত্বকে প্রায় কখনোই স্পর্শ করেনি, স্খলনকেই মাত্র তিরস্কৃত করেছে। সে যা-ই হোক, যখনই তিনি বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিকদের বাড়াবাড়িকে তিরস্কার করেছেন, তখনই তিনি বাস্তব কথাটাকে সংকীর্ণ অপ-প্রযুক্ত অর্থে গ্রহণ করেছেন। এবং তখনই তিনি তথ্য ও সত্যের মধ্যেকার কৃত্রিম সীমারেখাকে বড়ো ক'রে চূড়ান্ত ক'রে দেখেছেন। আবার যখনই তিনি বস্তুতান্ত্রিকদের কথা ভুলে গিয়ে নিজের কথা বলেছেন, তখনই তিনি বাস্তবকে সত্যের সঙ্গে এক ক'রে দেখেছেন। তখনই তিনি তথ্য ও সত্যের কৃত্রিম

ভেদরেখাকে মুছে ফেলে বলেছেন যে, তথ্যের পাত্রেই সত্যের আবির্ভাব হয়, তথ্য না-থাকলে সত্যও থাকতে পারে না। তখনই তিনি বলেছেন, "যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সু-নির্দিষ্ট আকারবদ্ধ।" যথার্থ বাস্তব, অর্থাৎ সত্য অর্থে বাস্তব, আর স্থূল বস্তুবদ্ধতার বাস্তব, এই দুই বাস্তবে তফাৎ কোথায়? আসল তফাৎ আসক্তিতে। রবীন্দ্রনাথের মতে স্থূল বস্তু-বদ্ধ বাস্তব আসক্তি-বিজড়িত বাস্তব। অর্থাৎ সত্যের বিকার। কথাটাকে একটু স্পষ্ট করা দরকার।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ঘটনা যখন বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তীর্ণ হয় তখনই আমাদের মনের কাছে তার সাহিত্য হয় বিশুদ্ধ ও বাধাহীন।" [১৩] এ-কথার অর্থ কী? 'বাস্তবের বন্ধন' কথাটার তাৎপর্য কী? বাস্তব কি নিজেই একটা বন্ধন? সে কাকে বেঁধে রাখে? ঘটনাকে? ঘটনা কি অবাস্তব? যদি বলি ঘটনা হ'লো সত্য, তাহ'লেও প্রশ্ন: সত্য কি তথ্য ছাড়া থাকে? তথ্য কি সত্যের বন্ধন? তথ্যের পাত্র ছাড়া সত্যের প্রকাশ হয় না, বাস্তবের ভূমি ছাড়া সত্য ঠাঁই পায় না। এরা বন্ধন নয়। যদি বলি অবলম্বন, তাহ'লেও ভুল বলা হয়। বাস্তব ও সত্য অবিচ্ছেদ্য। এ-সিদ্ধান্ত আমাদের মন-গড়া নয়, এ-সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথেরই। তাহ'লে 'বাস্তবের বন্ধন' কাকে বলবো? সে কি দেশ-কালের বন্ধন? কিন্তু দেশ-কাল যে নিজে কোনো বন্ধন নয়, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পারলে দেশ-কালের তথাকথিত বন্ধনের মধ্যেই যে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ লাভ করা যায়, এ-কথা রবীন্দ্রনাথই তো আমাদের শিখিয়েছেন। দৃষ্টিটা প্রেমের হ'তে হবে, আসক্তির নয়, এই হ'লো রবীন্দ্র-নাথের কথা। তাহ'লে বাস্তব নয়, আসক্তিই বন্ধন। বন্ধন বাইরে নেই, ঘটনায় নেই, আছে যে দেখে তার দৃষ্টিতে। ঘটনাকে বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত করার অর্থ, দৃষ্টি থেকে আসক্তির আবরণকে সরিয়ে দেওয়া। তাতে ঘটনা অবাস্তব হয় না, তার বাস্তবতা আরো উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ এখানে আসক্তির আবরণকেই বাস্তব বলেছেন। এ-রকম প্রয়োগ কিছু বিভ্রান্তিকর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনাতত্ত্বে তথ্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, তথ্যের অতীত কোনো স্বতন্ত্র সত্যের কথা বলেননি। কল্পনা পরিচিত বাস্তবকে বাতিল করে না, সে পরিচিত বাস্তবকেই শুদ্ধতর এবং পূর্ণতরভাবে প্রকাশ করে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ দৃষ্টি থেকে অভ্যস্ত-তার আবরণকে উন্মোচন করার কথা বলেছেন। উদ্দীপ্ত মুহূর্তবিশেষে শেলিও সেই কথাই বলেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখতে পাই, বিষয়ীর আত্মতার দিকে অতিরিক্ত নজর দেওয়ার ফলে রোমান্টিকেরা শেষ পর্যন্ত বিষয়ের আত্মতাকে প্রভূত পরিমাণে উপেক্ষা করেছেন। ফলে তাঁদের কাব্য যেমন বিষয়ী-কেন্দ্রিক, তাঁদের কল্পনাতত্ত্বও

তেমনি বিষয়ী-কেন্দ্রিক হ'য়ে পড়ছে। কার্যক্ষেত্রে দেখতে পাই, সেখানে বিষয়ী নিজেই যেন দৃষ্টির উপর একটা অনচ্ছ আবরণ রচনা করেছে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতত্ত্বে বিষয় এবং বিষয়ী একাত্ম। সেখানে কোনো দিকের আত্মতাই উপেক্ষিত নয়। দৃষ্টি থেকে সমস্ত রকম আবরণকে, সমস্ত আসক্তির ঠুলিকে সরিয়ে ফেলা, বিষয়-বিষয়ীর যুগনদ্ধ সত্যকে সমগ্রভাবে লাভ করা, বাস্তবকেই সত্যে পরিণত করা, অথবা বলি বাস্তবকে সত্যরূপে দেখা, এই হ'লো রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতত্ত্বের সার কথা। একে বাস্তব-বিমুখ বলার কোনো হেতু দেখি না।

রবীন্দ্রনাথ কল্পনার অন্তত তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেছেন। প্রকৃত-পক্ষে ভূমিকা তিনটি স্বতন্ত্র নয়, কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য তাদের আমরা আলাদাভাবেও বর্ণনা করতে পারি।

এক, কল্পনা অপরের মর্মের মধ্যে প্রবেশ করায়। একই সঙ্গে অপরের অপরত্ব এবং নিজের নিজত্ব, এই দুই অর্ধ-সত্যের বিগলন ঘটিয়ে তাদের অন্তর্নিহিত ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। সেই পূর্ণতর সত্যে নিজেকেও আবার ফিরে পাওয়া যায়, অপরও হারায় না।

দুই, কল্পনা খণ্ডকে সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত ক'রে বিচ্ছিন্নের মধ্যে ঐক্য এনে দেয়, সমস্ত বিরোধ-বৈপরীত্যকে বৃহৎ সামঞ্জস্যে বিধৃত করে। লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, কল্পনার প্রথম ও দ্বিতীয় ভূমিকা কার্যত ভিন্ন নয়।

তিন, কল্পনা ব্যবহারের বস্তুকে, ভোগের বস্তুকে প্রেমের বস্তুতে পরিণত করে, জ্ঞানের বস্তুকে ভাবের বস্তুতে পরিণত করে, জানাকে পাওয়ায় পরিণত করে। কল্পনা তথাকথিত তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশ ঘটায়. তথাকথিত বাস্তবকে যথার্থ বাস্তবে পরিণত করে।

তিনটি ভূমিকারই ন্যূনতম শর্ত আসক্তিবর্জন। যতোক্ষণ আসক্তি আছে, ততোক্ষণই আমরা স্বতন্ত্র, ততোক্ষণই আমরা খণ্ডিত, ততোক্ষণই আমরা প্রয়োজনবদ্ধ। ঘটনাকে বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত করা অর্থ আমাদের নিজেদের মধ্যেকার স্বাতন্ত্র্যের বোধকে, খণ্ডতার বোধকে, প্রয়োজনবশ্যতার ভাবকে বিদূরিত করা। তারই নাম আসক্তির আবরণ মোচন।

আগেই বলেছি, আসল বিভ্রান্তি এসেছে বাস্তব কথাটার দুই রকম অর্থে প্রয়োগের ফলে। কখনো মনে হয়, বাস্তবতা রবীন্দ্রনাথের কাছে অতিশয় নিন্দনীয়। আবার কখনো মনে হয়, বাস্তবতাই রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট। দুই বাস্তবতা যে আলাদা তা আমরা তলিয়ে দেখি না। শুধু তাই নয়, আরো একটু কথা আছে। এই দুই বাস্তবতা

যে আলাদা হ'য়েও আলাদা নয়, এদের মধ্যে যে একটা গূঢ় যোগ আছে, এই সত্যটা রবীন্দ্রনাথ নিজেও সব সময় স্মরণ রাখেননি, আমাদেরও বিস্মৃত হবার সুযোগ বা দুর্যোগ ক'রে দিয়েছেন। 'সাহিত্যের স্বরূপ' বইটির "সত্য ও বাস্তব" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যেখানে মানুষের আত্মপ্রকাশে অশ্রদ্ধা সেখানে মানুষ আপনাকে হারায়। তাকে বাস্তব নাম দিতে পারি, কিন্তু মানুষ নিছক বাস্তব নয়। তার অনেকখানি অবাস্তব, অর্থাৎ তা সত্য।" এই বাস্তবকে যদি ধরি, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতত্ত্ব নিশ্চয়ই বাস্তব-বিমুখ কল্পনাতত্ত্ব।

আবার সেই 'সাহিত্যের স্বরূপ' বইয়েরই "সাহিত্যের স্বরূপ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "...সত্যে তখনই সৌন্দর্যের রস পাই, অন্তরের মধ্যে যখন পাই তার নিবিড় উপলব্ধি — জ্ঞানে নয় স্বীকৃতিতে। তাকেই বলি বাস্তব।"—এ কোন্ বাস্তব? 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের "সাহিত্যতত্ত্ব" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "যে-কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব।" এই গ্রন্থেরই "রূপকার" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "...রূপকার বাস্তবকে আমার অতি কাছে এনে দেন, রিয়্যালিটির চেতনা আমার মধ্যে উজ্জ্বল ক'রে তোলেন।...আর্ট আমাদের মনে বাস্তবের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, আমাদের সত্তার সঙ্গে তার নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করে গভীর আনন্দের চেতনা এনে দেয়।" এইখানে রবীন্দ্রনাথ যে-বাস্তবের কথা বলেছেন, তাকে যদি ধরি, তাহ'লে মানতেই হবে যে, রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতত্ত্ব নিঃসংশয়ে বাস্তবমুখী কল্পনাতত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বও তাই, সেই সাহিত্যতত্ত্ব যা অকুণ্ঠিতভাবে রিয়ালিটির চেতনা উজ্জ্বল ক'রে তুলবার কথা বলে।

আগেই বলেছি, সমগ্র রবীন্দ্র-চিন্তার আলোকে যদি দেখি, রবীন্দ্র-চিন্তার কেন্দ্রস্থ তত্ত্বের আলোকে যদি দেখি, তাহ'লে দেখতে পাবো, দুই বাস্তবের মধ্যে — তথ্য ও সত্যের মধ্যে আত্যন্তিক কোনো বিরোধ নেই। তথ্যকে অনাবৃত দৃষ্টিতে দেখলেই সে সত্য হ'য়ে ওঠে। সাহিত্য এইভাবেই দেখায়। সত্যের এই অনাবৃত প্রকাশ শুধু যে সাহিত্যেই হয় তা নয়, বাস্তবজীবনেও হ'তে পারে। আসক্তি-বর্জিত দৃষ্টিতে যখন জীবনের দিকে তাকাই, তখন সেখানেও আবরণ ঘুচে যায়, তখন দেখি জীবনের তথ্য-গুলোই সত্য হ'য়ে উঠেছে।

আবরণটা জীবনের নয়, আবরণটা দৃষ্টির। আসলে আমাদের দৃষ্টিরই আবরণ ঘোচে, চিত্তেরই পূর্ণ জাগরণ ঘটে। চিত্তেরই আবরণভঙ্গ হয়। 'রসগঙ্গাধরে' জগন্নাথ একেই বলেছেন, 'ভগ্নাবরণা চিৎ'। জীবনকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলে জীবনই সাহিত্য হ'য়ে ওঠে। তখন বুঝতে পারি, আমাদের এই পরিচিত বাস্তব জগৎই লীলার জগৎ।

এই মুক্ত দৃষ্টির দেখাই কল্পনার দেখা। এ-দেখা ব্যবহারিক জীবনের দেখার, জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখার খণ্ডনও নয়, বিকল্পও নয়। তা এই দেখারই সংশোধন, সম্প্রসারণ এবং পরিপূরণ। কল্পনার দৃষ্টিই পূর্ণ দৃষ্টি, কল্পনার দৃষ্টিই ইস্থেটিক দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের মতে ইস্থেটিক দৃষ্টি কোনো বিশিষ্ট ধরনের স্বতন্ত্র দৃষ্টি নয়, কোনো অধিকারীবিশেষের দৃষ্টি নয়, কোনো রহস্যময় জাদুদৃষ্টি নয়। তা ধ্যানদৃষ্টি নয়, মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টিই ইস্থেটিক দৃষ্টি। আবরণ স'রে গেলে এই চর্মচক্ষুর দেখাই ইস্থেটিক দৃষ্টি হ'য়ে ওঠে। কথাটা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি। 'শান্তিনিকেতন' ভাষণাবলীর "দেখা" থেকে উদ্ধৃত করছি।

"তুমি কি ভাবছ, চোখ বুজে ধ্যানযোগে দেখবার কথা আমি বলছি? আমি এই চর্মচক্ষে দেখার কথাই বলছি।...আমি বলছি, এই চোখ দিয়েই, এই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা — তাই যদি না থাকত তবে আলোক বৃথা আমাদের জাগ্রত করেছে, তবে এত বড়ো এই গ্রহ-তারা-চন্দ্র-সূর্য-খচিত প্রাণে-সৌন্দর্যে-পরিপূর্ণ বিশ্বজগৎ বৃথা আমাদের চারিদিকে অহোরাত্র নানা আকারে আত্ম-প্রকাশ করছে।...

"...কাকে দেখবে? তাঁকে, যাকে ধ্যানে দেখা যায়? না তাঁকে না, যাঁকে চোখে দেখা যায় তাঁকেই। সেই রূপের নিকেতনকে, যাঁর থেকে গণনাতীত রূপের ধারা অনন্তকাল থেকে ঝরে পড়ছে। চারিদিকেই রূপ — কেবলই এক রূপ থেকে আর-এক রূপের খেলা; কোথাও তার আর শেষ পাওয়া যায় না...।...সেই অপরূপ অনন্তরূপকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যেই যখন দেখব তখন পৃথিবীর আলোকে একদিন আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে...।"

১ "সাহিত্যতত্ত্ব", 'সাহিত্যের পথে', র। ১৪। ৩৫৩

২ "সাহিত্যের তাৎপর্য", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৩৬৯

৩ তদেব, পৃ. ৩৭০

৪ *The Religion of Man*, p 131

৫ তদেব

৬ এই প্রসঙ্গে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সেই বিখ্যাত পংক্তিগুলি এখানে স্মরণ করতে পারি :

> The spiritual love acts not, nor can exist
> Without imagination, which in truth
> Is but another name for absolute power
> And clearest insight, amplitude of mind,
> And reason in her most exalted mood. (*Prelude*)

৭ 'সমালোচনা', র।১৩।৬২৭

৮ "চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি", 'সমালোচনা', র।১৩,৬২৭

৯ বের্গসঁর মতে ইনটুইশন হ'লো "the *intellectual sympathy* by which one places oneself within an object in order to coincide with what is unique in it and consequently inexpressible". *Introduction to Metaphysics*, tr. T. E. Hulme, p 23.

১০ একমাত্র অনামী গ্রীক গ্রন্থ *Peri Hypsous* (রচয়িতা Longinus ব'লে কথিত , রচনাকাল অনিশ্চিত , খ্রী ১ম শতক থেকে ৩য় শতকের মধ্যে) বোধকরি এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

১১ *Biographia Literaria*, ch 13, 1, 202

১২ প্রসঙ্গত নীট্শের সেই বিখ্যাত উক্তি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, "Romantic art is only an emergency exit from defective 'reality' " । *The birth of Tragedy*, tr. C. Fadiman, p 269

১৩ "সাহিত্যের তাৎপর্য", 'সাহিত্যের পথে', বা।১৪।৩৭০

লীলাবাদ

জগৎ-সংসারকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন লীলা। জীবন তাঁর কাছে জীবনসংগ্রাম নয়, জীবনলীলা। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রবাক্য স্মরণ ক'রে 'সাহিত্যের পথে'র ভূমিকায় তিনি লীলাময় ঈশ্বরের কথাও উত্থাপন করেছেন। "সৃষ্টিকর্তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে লীলাময়। অর্থাৎ তিনি আপনার রসবিচিত্র পরিচয় পাচ্ছেন আপন সৃষ্টিতে।"

সৃষ্টিকর্তার প্রসঙ্গে শাস্ত্র যা-ই বলুক না কেন, এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্যও কিছু আছে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সৃষ্টি থেকে আলাদা সৃষ্টিকর্তা নেই। সৃষ্টি এবং স্রষ্টা একই। সৃষ্টিকর্তা নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন, অথবা করছেন। সৃষ্টি নিজেই নিজের সৃষ্টিকর্তা। রবীন্দ্রনাথের মতে জগৎ-স্রষ্টার মতো মানুষও সৃষ্টিকর্তা। "মানুষও আপনার মধ্যে থেকে আপনাকে সৃষ্টি করতে করতে নানা ভাবে, নানা রসে আপনাকে পাচ্ছে। মানুষও লীলাময়।"[১] মানুষ নিজেকে সৃষ্টি করে, নিজের জগৎকে সৃষ্টি করে, আবার বিশিষ্ট অর্থে আমরা যাকে আর্ট বলি, সাহিত্য বলি, তা-ও সৃষ্টি করে। নিজেকে সৃষ্টি করার কারণেও মানুষ লীলাময়, আবার আর্ট বা সাহিত্যকে সৃষ্টি করার কারণেও মানুষ লীলাময়। এই দ্বিতীয় কারণটার উপর রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "মানুষও লীলাময়। মানুষের সাহিত্যে আর্টে সেই লীলার ইতিহাস অঙ্কিত হয়ে চলেছে।"[২] রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে বলেছেন মানুষের "বৃহৎ বিচিত্র লীলা-জগতের সৃষ্টি।"[৩] রবীন্দ্রনাথের দর্শনতত্ত্ব যে-কারণে লীলাবাদী দর্শনতত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বও ঠিক সেই কারণেই লীলাবাদী সাহিত্যতত্ত্ব। আসলে রবীন্দ্রনাথের কাছে কারণ দুটো পৃথক নয়। জীবনে যেমন মানুষ অবিরত নিজেকে সৃষ্টি ক'রে-ক'রে চলে, সাহিত্যেও তাই। উভয়ক্ষেত্রেই মানুষ আত্মসৃজন-পরায়ণ। যে-সৃজনশীলতা জীবনে, সেই একই সৃজনশীলতা সাহিত্যে। এই সৃজনশীলতাই মানুষের স্বধর্ম।

যাঁরা আর্টিস্ট ব'লে পরিচিত, কেবল তাঁরা নন, রবীন্দ্রনাথের কাছে সব মানুষই সৃষ্টিকর্তা। মানুষের গোটা জীবনটাই একটা ছেদহীন সৃজনক্রিয়া। এ-সৃজন কেবল ব্যক্তি-মানুষের নয় — সর্ব-মানবের, মানব-সমগ্রতার। সমাজ সংসার সবই তার সৃষ্টি। মানব-বিশ্ব তারই সৃষ্টি। মানবতাও তাই। মানবতা তো আলাদা কিছু নয়। মানবতাই নিজেকে সৃষ্টি করতে-করতে চলে। রবীন্দ্রনাথের লীলাবাদকে

বুঝতে হ'লে তাকে এই সৃজনশীল মানব-সমগ্রতার, এই মহাশিল্পী মানবব্রহ্মের প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে।

পাশ্চাত্য লীলাবাদ—অথবা লীলাবাদের কাছাকাছি যে-সব থিয়োরি পাশ্চাত্য সাহিত্যশাস্ত্রে প্রচলিত আছে, যেমন ক্রীড়াবাদ, ইলিউশনবাদ ইত্যাদি— এর কোনো-টির সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের লীলাবাদের কোনো মর্মগত মিল নেই। অন্যপক্ষে, ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রে লীলাবাদ বস্তুটিই নেই। সুতরাং প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোনো সাহিত্যশাস্ত্রেই রবীন্দ্রনাথের লীলাবাদের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে না।

লীলাবাদকে পেতে হ'লে আগে লীলাকে পেতে হবে। লীলাকে তো ভারতীয় জীবনে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে সর্বত্রই পাওয়া যাবে। কিন্তু সেখানে লীলা কোনো 'বাদ' বা তত্ত্ব নয়। ভারতীয় জীবনের সাধারণ ক্ষেত্রে লীলা একটি বহু-অভিব্যঞ্জনাযুক্ত, বহু-প্রচলিত, অ-পারিভাষিক শব্দ। এই হিসেবে লীলাকে পাবো — ঠিক যাকে লীলাবাদ বলা যেতে পারে সেই বস্তু—তাকে পাবো, ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রে নয়, দর্শনে ও সাধন-তত্ত্বে। তাহ'লে এখানেই কি রবীন্দ্রনাথের লীলাবাদের উৎস? বলা কঠিন। ভারতীয় দর্শনে ও সাধনমার্গে যে সুচিহ্নিত ক্ষেত্রের মধ্যে লীলা কথাটির প্রয়োগ সীমাবদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের লীলাবাদ সেই সীমাকে লঙ্ঘন ক'রে বহু দূরে চ'লে যায়।

কোনো একক উৎসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে ভুল করবো। উৎস একাধিক। কিন্তু যে উৎস থেকেই এর যতোটুকু সংগৃহীত হ'য়ে থাকুক না কেন, সমগ্রভাবে দেখলে রবীন্দ্রনাথের লীলাবাদ একান্তভাবেই রাবীন্দ্রিক তত্ত্ব। এ-তত্ত্বের বিশিষ্টতাকে বুঝতে হ'লে সব থেকে আগে লীলা কথাটার অর্থের দিকটাতেই একটু ভালো ক'রে দৃষ্টি দিতে হবে।

লীলা ভারতীয় দর্শন ও সাধনমার্গের একটি সুপরিচিত তত্ত্ব। সেখানে কথাটির অর্থ অনেকখানি সুনির্দিষ্ট। সাহিত্যে বা জীবনে লীলা কথাটির অর্থ অতোখানি সুনির্দিষ্ট নয়। আভিধানিক অর্থে লীলা হচ্ছে যে-কোনো অনায়াস-সাধিত কর্ম, অথবা যে-কোনো আনন্দাত্মক ক্রিয়া। লীলা অর্থ খেলা। অথবা, যে-কোনো ক্রীড়াধর্মী ব্যাপার। লীলা অর্থ, বিশেষভাবে, শৃঙ্গার রসাত্মক ক্রীড়া। অথবা, লীলা অর্থ যে-কোনো সরস ছলনা, ভঙ্গি, বিভ্রম। সাহিত্যে ও জীবনে লীলা কথাটা এই ধরণের নানা অর্থেই ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। এই অর্থগুলির সবের মধ্যেই যে আয়াসহীনতার ও সরসতার ভাব আছে — স্পষ্ট কথায় যে-মুক্তি ও আনন্দের ভাব আছে, ভারতীয় দর্শনে সেইটেই লীলা কথাটার প্রাণবস্তু।

দর্শনে লীলা অর্থ হ'লো আনন্দময় কর্ম। আরো স্পষ্ট ক'রে বললে, আনন্দের প্রেরণায়, আনন্দের প্রয়োজনে কর্ম। অর্থাৎ এমন কর্ম, যার পেছনে কোনো প্রবৃত্তির তাড়া নেই, সামনে কোনো উদ্দেশ্যসাধনের দায়িত্ব নেই। এমন কর্ম, আনন্দ ছাড়া যার আর কোনো দায়ই নেই। কথাটাকে একটু ব্যাখ্যা ক'রে বলা দরকার। সাধারণত আমরা দেখতে পাই, সব কর্মই প্রবৃত্তি-চালিত এবং সব কর্মই প্রয়োজন-সাধক। পাগলের কোনো কোনো কর্ম অবশ্য প্রয়োজন-সাধক নয়। কিন্তু তা-ও প্রবৃত্তি-চালিত। সে-প্রবৃত্তি উন্মত্ত প্রবৃত্তি, এইটুকু পার্থক্য। সাধারণভাবে বলা যায়, মানুষের সব কর্মই প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত — হয় স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দ্বারা, না-হয় উন্মত্ত প্রবৃত্তির দ্বারা, আর না-হয়, গীতায় যেমন বলা হয়েছে, নিবৃত্তি-শোধিত প্রবৃত্তির দ্বারা। কর্ম হ'লেই তাকে প্রবৃত্তি-চালিত হ'তে হবে, অল্পবিস্তর প্রয়োজন-সাধকও হ'তে হবে।

কিন্তু এমন কর্ম কি সত্যিই নেই, যা এর কোনোটাই নয়? যা প্রবৃত্তি-চালিতও নয়, প্রয়োজন-সাধকও নয়? যদি থেকে থাকে, সেই কর্মকে কী নাম দেবো? শাস্ত্র বলেছেন, তারই নাম লীলা। শাস্ত্র বলেন, তেমন কর্ম মাত্র একটিই আছে। তা হ'লো সৃষ্টিকর্তার জগৎ-সৃষ্টি। এই একটি কর্মই লীলা। শাস্ত্রমতে জগৎ-সৃষ্টিতে নিজের বাইরে আর কোনো লক্ষ্য নেই, আর কোনো নিমিত্ত নেই। জগৎ-সৃষ্টি একটা দায়দায়িত্বহীন, মুক্ত, রসাত্মক ক্রিয়া। অন্য সব কর্মই কোনো-না-কোনো অভাবের সূচক, কেবল এই কর্মটি তা নয়। আনন্দেই এর আরম্ভ, আনন্দেই এর শেষ। এ হ'লো স্রষ্টার পূর্ণতার প্রকাশ, প্রাচুর্যের অভিব্যক্তি। সৃষ্টিকর্তা যিনি, জগৎ তাঁর খুশির খেলা। তিনি লীলাময় এবং সে এই খুশির খেলার মধ্যে দিয়েই।

ব্রহ্মসূত্রে জগৎকে সৃষ্টিকর্তার আনন্দ-প্রাচুর্যের প্রকাশ ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। কথাটাকে স্পষ্ট করবার জন্য প্রশ্ন তোলা হয়েছে: কেমন ক'রে সৃষ্টি সম্ভব হ'তে পারে, স্রষ্টার যখন কোনো অভাব বা কোনো প্রয়োজন নেই? উত্তরে বলা হয়েছে, "ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ" (২।১।৩১) — প্রয়োজনের জন্য নয়। জগৎ-সৃষ্টি কেবলই লীলা। "লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্" (২।১।৩৩)। শাস্ত্রমতে লীলা বাধাহীন আনন্দানুভব, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দক্রিয়া। উপনিষদের যে-সব সূত্রে ব্রহ্মকে আনন্দ বলা হয়েছে, যেমন তৈত্তিরীয়ের "রসো বৈ সঃ" (২।৭) অথবা "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" (৩।৬), কিংবা বৃহদারণ্যকের "আনন্দং ব্রহ্ম" (৩।৯।২৮।৭) — এই সব সূত্রের সঙ্গে মিলিয়েই শাস্ত্রীয় লীলাবাদকে বুঝতে হবে।

ভারতীয় ভক্তিবাদী সাধনাধারায় বিশেষ ক'রে মাধুর্যমার্গের সাধনাধারায়,

লীলার গুরুত্ব অসাধারণ। শৃঙ্গারকে অবলম্বন ক'রে লীলা যে কতো ব্যাপ্তি, কতো বৈচিত্র্য লাভ করতে পারে, তা বৈষ্ণব পদাবলীর পাঠকমাত্রেরই সুবিদিত। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। বৈষ্ণবতত্ত্বে যে-শৃঙ্গারলীলা, সে-শৃঙ্গার ঈশ্বরের — নিজের সঙ্গেই তাঁর শৃঙ্গার। মানুষ এ-লীলায় সমান শরিক নয়। অথবা খুব গৌণ অর্থেই শরিক। সে কেবল দর্শক, সেবক, কেবল পুষ্টিসাধক। এইখানেই বৈষ্ণব লীলাবাদের সঙ্গে রাবীন্দ্রিক লীলাবাদের মৌল পার্থক্য।

রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় অনেক গানে লীলার মধ্যে শৃঙ্গার-মাধুর্যের সঞ্চার দেখতে পাই। মানুষ এর প্রত্যক্ষ শরিক। প্রেমের গৌরবে, প্রেমের দুঃসাহসী স্পর্ধায় মানুষের হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে বলতে পারেন, "আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে"।[৪] দীক্ষিত বৈষ্ণব এমন স্পর্ধার কথা উচ্চারণ করবেন না। এমন ভাবাটাও তাঁর পক্ষে অবিনয়।

রবীন্দ্র-কাব্যে ভগবৎ-প্রেমের মধ্যে মানুষের যে স্পর্ধিত স্বাধিকারের ভাবটি ফুটে উঠেছে, তার রমণীয়তাকে অস্বীকার করি না। কিন্তু এর মেজাজটা ঠিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মেজাজ নয়। তফাৎটা কিন্তু কেবল মেজাজ বা কবিদৃষ্টিতে নয়, আসল তফাৎটা তত্ত্বের গভীরে। এটা একেবারে গোড়া-ঘেঁষা তফাৎ। রবীন্দ্রনাথের লীলাবাদকে বুঝতে হ'লে এই তফাতের কথাটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

ভারতীয় ভক্তিবাদী সাধনার কোনো ধারাতেই মানুষ ঠিক সেই অর্থে লীলাময় নয়, রবীন্দ্র-তত্ত্বে যে-অর্থে মানুষ লীলাময়। শাস্ত্রমতে লীলা স্বয়ং ঈশ্বরের, মানুষ লীলাময়ের লীলার প্রকাশ মাত্র। ঈশ্বর এবং জীবের সম্পর্ক সেখানে এমনভাবে কল্পিত যে, কী ব্যক্তি-মানব, কী মানব-সমগ্রতা, কারো পক্ষেই নিজের লীলাময় হ'য়ে ওঠার কোনো সুযোগ নেই।[৫] শঙ্করাচার্যের ক্ষেত্রটা অবশ্য আলাদা। শঙ্করাচার্য ব্রহ্ম ও জীবের সম্পূর্ণ অদ্বৈতে বিশ্বাসী। যে-সুযোগ ব্রহ্মের আছে, সে-সুযোগ মানুষেরও আছে, কেননা স্বরূপত মানুষ ব্রহ্মই। সেই শঙ্করাচার্যও কিন্তু মানুষকে লীলাময় বলেননি। বলেননি, তার কারণ তিনি ব্রহ্মকেও লীলাময় বলেননি। তাঁর কাছে ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্তা নন। সৃষ্টি, লীলা ইত্যাদি সব-কিছু তাঁর কাছে নিম্নতর ধাপের ব্যাপার। জগৎ-সৃষ্টি ব্যাপারটাই নিম্নতর স্তরের সত্য, পারমার্থিক স্তরের নয়। যাঁকে আমরা ঈশ্বর বলি, সৃষ্টিকর্তা বলি, সেই ঈশ্বর, তাঁর জগৎ সৃষ্টি এবং সৃষ্ট-জগৎ, এর কোনোটাই পারমার্থিক স্তরের সত্য নয়। শঙ্করের মতে কেবল ব্রহ্মই সত্য। ব্রহ্ম জ্ঞানমাত্র, জ্ঞাতা নয়। ব্রহ্ম নিঃশক্তিক এবং নিষ্ক্রিয়। সৃষ্ট জগৎ যেমন মায়া, স্রষ্টা ঈশ্বরও তেমনি মায়া।[৬] লীলা এই স্তরেই। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ক্ষেত্রে লীলার প্রশ্নই ওঠে না। বস্তুত শঙ্কর আদৌ

লীলাবাদী নন। শঙ্করের উপনিষদ্-ভাষ্যকে গ্রহণ করলে—শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদকে স্বীকার ক'রে নিলে রবীন্দ্রনাথের লীলাবাদের একটি কথাকেও আমরা গ্রহণ করতে পারবো না।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর লীলাবাদকে খাঁটি ঔপনিষদিক উত্তরাধিকার হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছে লীলার মূল কথাটা হচ্ছে আনন্দ, বা বলতে পারি, আনন্দক্রিয়া, যার অপর নাম সৃজনশীলতা। গোটা জীবনটাই একটা আনন্দক্রিয়া। পাশ্চাত্য দেশে বলা হয় জীবনসংগ্রাম। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, সমগ্রভাবে দেখলে জীবনটা কেবল লড়াই-ই নয়, কেবল সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব বা দুঃখ নয়, বরং তার উল্টো। সত্তা আনন্দময়, এইটেই রবীন্দ্রনাথের লীলাবাদের মূল কথা। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের "কবির কৈফিয়ৎ" প্রবন্ধে এই কথাটাকেই তিনি বেশ বিস্তৃত ক'রে বুঝিয়েছেন।

"আমরা যে ব্যাপারটাকে বলি জীবলীলা পশ্চিম সমুদ্রের ওপারে তাকেই বলে জীবন-সংগ্রাম।...

'লীলা' বলিলে সবটা বলা হইল, আর 'লড়াই' বলিলে লেজামুড়া বাদ পড়ে।...

"...জীবনের মধ্যে বাঁচিবার একটা অহেতুক ইচ্ছা আছে। সেই ইচ্ছাটাই চরম কথা। সেইটে আছে বলিয়াই আমরা লড়াই করি, দুঃখকে মানিয়া লই। সমস্ত জোর জবরদস্তির সবশেষে একটা খুশি আছে — তার ওদিকে আর যাইবার জো নাই, দরকারও নাই।...

"...জগতে শক্তির লড়াইটাকে প্রধান করিয়া দেখা অবচ্ছিন্ন দেখা — অর্থাৎ, গানকে বাদ দিয়া সুরের কসরৎকে দেখা। আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণ দেখা। এ কথা আমাদেরই দেশের সবচেয়ে বড়ো কথা। উপনিষদের চরম কথাটি এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত বাঁচে, আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে।

"এই যদি উপনিষদের চরম কথা হয় তবে কি ঋষি বলিতে চান জগতে পাপ নাই, দুঃখ নাই, রেষারেষি নাই।...

"উপনিষৎ ইহার উত্তর দিয়াছেন—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কেই-বা শরীরের চেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করিত (অর্থাৎ কেই-বা দুঃখধন্দা লেশমাত্র স্বীকার করিত) আনন্দ যদি আকাশ ভরিয়া না থাকিত। অর্থাৎ আনন্দই শেষ কথা বলিয়াই জগৎ দুঃখদ্বন্দ্ব সহিতে পারে।...তোমরা যখন দুঃখকেই স্বীকার কর তখন আনন্দকে বাদ দাও, কিন্তু আনন্দকে স্বীকার করিলে দুঃখকে বাদ দেওয়া হয় না। অতএব তোমরা যখন বল হানাহানি করিতে করিতে

যাহা টিঁকিল তাহাই সৃষ্টি, সেটা একটা অবচ্ছিন্ন কথা, ইংরাজিতে যাকে বলে অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌শন; আর আনন্দ হইতেই সমস্ত হইতেছে ও টিঁকিতেছে, এইটেই হইল পূরা সত্য।"

লীলাবাদ খাঁটি ভারতীয় বস্তু। রবীন্দ্রনাথের লীলাবাদও মূলত তাই। এর মধ্যে কোথাও হয়তো পাশ্চাত্য ভাবের ছোঁয়াও লেগে থাকতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্র-চিন্তায় লীলাবাদ যে বিশিষ্ট রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, ভারতীয় বা পাশ্চাত্য কোনো প্রচলিত লীলাবাদের সঙ্গেই তাকে পুরোপুরি মেলানো যাবে না, রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তাই তাকে এমন ভাস্বর ক'রে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে মানুষকেই সৃষ্টি-কর্তা বলেছেন, বিশ্ব-জগৎকে যেভাবে মানব-বিশ্ব অর্থাৎ মানব-সৃজিত বিশ্ব ব'লে দাবি করেছেন, এবং মানব-সমগ্রতার তত্ত্বকে যেভাবে এর ভিত্তিভূমিতে এনে স্থাপিত করেছেন, তা সম্পূর্ণভাবে রাবীন্দ্রিক। লীলাকে যেভাবে তিনি জগৎ-ব্যাখ্যায় প্রযুক্ত করেছেন, তার সঙ্গে পাশ্চাত্য চিন্তার মিল নেই। অপর পক্ষে, সেই লীলাকেই তিনি যেভাবে শিল্পব্যাখ্যা সাহিত্যব্যাখ্যার কাজে লাগিয়েছেন, ভারতীয় চিন্তায় তার উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে না। কার্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের লীলাবাদ একান্তভাবেই রাবীন্দ্রিক লীলাবাদ।

ভারতীয় লীলাতত্ত্ব শুধু জগৎ-সৃষ্টিকেই ব্যাখ্যা করে; কোনো মানবিক কর্মের ক্ষেত্রে লীলা কথাটির প্রয়োগ করা যাবে না। লীলা পূর্ণতার প্রকাশ। যিনি পূর্ণ একমাত্র তিনিই লীলার অধিকারী। মানব-রচিত শিল্প সাহিত্য কাব্য আদৌ লীলা-নয়। বিশ্বজগৎকে যদি 'দেবস্য কাব্যম্' বলি, তাহ'লে সেই আলংকারিক অর্থে জগৎ-কাব্যরসকে লীলারস বলতে পারি। কিন্তু তার দরুণ মনুষ্য-রচিত কাব্যকে লীলা বলবার কোনো দাবি জন্মায় না। রবীন্দ্রনাথ সেই দাবিই করেছেন। কিন্তু সে-কোনো আলংকারিক অর্থে নয়, শাদা অর্থে। করতে পেরেছেন এই জন্য যে, তাঁর মতে, মানুষ নিজেই লীলাময়। সর্বত্রই — জীবনেও, সাহিত্যেও।

বৈষ্ণব গোস্বামীরা জীবনরসকে সাহিত্যরসের সঙ্গে এবং সাহিত্যরসকে লীলারসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেই চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে-সাহিত্যরস নামেই সাহিত্যরস। বৈষ্ণব গোস্বামীদের দেখা ভক্তের দেখা, সাধকের দেখা, সাধারণ সাহিত্যরসিকের দেখা নয়। সাহিত্য তাঁদের কাছে ভগবৎ সাধনারই অঙ্গ। সাহিত্যের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, স্বকীয় মূল্য নেই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অতলে যাঁরা ডুব দিয়েছেন, তাঁদের কাছে সবই সেই ভক্তিরসসিন্ধুর তরঙ্গ। সাহিত্যও তাই। বৈষ্ণব গোস্বামীদের মতে বিশ্বজগতের সব-কিছুই কৃষ্ণ লীলারস। তাঁরা বলেন রাধা-

কৃষ্ণের অদ্বয়তত্ত্বই একমাত্র তত্ত্ব, একমাত্র সত্য। তত্ত্বগতভাবে অদ্বয় হ'লেও, তা 'লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ'। লীলারসটি যাঁর, আস্বাদনও তাঁর। গোস্বামীদের মতে সব রসই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের লীলারস। শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রসের অধিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণই সব রসের আশ্রয়। দাস্য হোক, সখ্য হোক, বাৎসল্য হোক আর মঞ্জরী-ভাবাপন্ন ভক্তের বহুরসমিশ্রিত কৃষ্ণসেবারসই হোক, সব রসই শেষ পর্যন্ত সেই উজ্জ্বল রসের পুষ্টিসাধক। এর বাইরে রস নেই। সাহিত্য রসরাজের লীলারসের আখ্যান। বৈষ্ণব গোস্বামীদের কাছে ভক্তিশাস্ত্রই রসশাস্ত্র, 'উজ্জ্বলনীলমণি'ই সাহিত্য-শাস্ত্র। যিনি ভক্ত নন, সাধক নন, যিনি সরাসরি সাহিত্য-রস-পিপাসু, সরাসরি সাহিত্যজিজ্ঞাসু, তাঁর কোনো প্রশ্নের উত্তর বৈষ্ণব লীলাবাদে মিলবে না।

ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রে রসবাদ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মত। রসবাদী সাহিত্যতত্ত্বের মূল কথাও আনন্দ। আনন্দ, কিন্তু লীলা নয়। লীলার বিশিষ্ট ভাবানুষঙ্গ সেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। রসের প্রসঙ্গে ব্রহ্মাস্বাদের কথাও বলা হয়েছে, কিন্তু লীলার মধ্যে যে বহু শাখায়িত বহুবিচিত্র মাধুর্যের ব্যঞ্জনা আছে, রসবাদীরা তাঁদের আলোচনাকে তার দিকে প্রসারিত করেননি। লীলাবাদী জগৎ-তত্ত্ব আমাদের সুপ্রাচীন উত্তরাধিকার, কিন্তু লীলাবাদী সাহিত্যতত্ত্ব তা নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে জগৎ-তত্ত্ব এবং সাহিত্যতত্ত্ব একই। দুয়েরই মূলে মানবসত্য, আর্টিস্ট মানুষ, লীলাময় মানুষ। মানবসত্যের বাইরে অপর কোনো সত্যকে, মানুষের বাইরে অপর কোনো লীলাময়কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ খুব ব্যাপৃত নন।

পাশ্চাত্য সাহিত্যশাস্ত্রে লীলাবাদ সুপ্রাচীন না হ'লেও আজকাল মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত। রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্বের আদি উৎসগুলির সঙ্গে এর জন্মসূত্রে যোগ আছে। কিন্তু তা হ'লেও মানবসত্যে এর ভিত্তি কতোখানি দৃঢ় সেইটে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পাশ্চাত্য ভাষায় লীলার কোনো সার্থক প্রতিশব্দ নেই। পাশ্চাত্য লীলাবাদ সাধারণত ক্রীড়াবাদ বা প্লে-থিয়োরি নামেই বেশি পরিচিত। খেলার আনন্দের মধ্যে একটা অপ্রয়োজনের ভাব আছে, সাংসারিকতার হাত থেকে ছুটি পাওয়ার ভাব আছে, দায়দায়িত্বহীন একটা খোলামেলা ভাব আছে। খেলার আনন্দ, খেলার মুক্তি, এর সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। এই আনন্দই সাহিত্যের আনন্দ, আরো ঘনীভূত, আরো বিশুদ্ধ। এইটেই পাশ্চাত্য ক্রীড়াবাদের মূল কথা। পাশ্চাত্য ক্রীড়াবাদীরা অবশ্য সকলেই এক গোত্রের নন। খেলা জিনিসটাকে এক এক জন এক এক ভাবে দেখেছেন। কারো জোর অপ্রয়োজনের উপর, ক্রীড়াকে তাঁরা

জৈববৃত্তির ঊর্ধ্বে বলে মনে করেছেন। আবার কেউ কেউ-বা ক্রীড়াবৃত্তিকে জীববৃত্তিরই সম্প্রসারণ ব'লে মনে করেছেন। এঁদের অধিকাংশের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের মিল যৎসামান্য, অমিল সুগভীর।

রবীন্দ্রনাথ খেলাকে লীলার সার্থক প্রতিনিধি ব'লে মনে করেন না। তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব লীলাবাদী, কিন্তু ক্রীড়াবাদী নয়। তিনি বলেন, "...খেলার বৃত্তি আর প্রয়োজন-সাধনের বৃত্তি মূলত একই।...খেলার ক্ষেত্র জীবনযাত্রা ক্ষেত্রের প্রতিরূপ।"[৭] ডারউইন অথবা হার্বার্ট স্পেনসারের মতো যাঁরা মানুষের সমস্ত কিছুকেই বিবর্তনবাদের প্রেক্ষাপটে রেখে দেখতে অভ্যস্ত, খেলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যকে তাঁরা মেনে নেবেন, কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতকে মানবেন না। অর্থাৎ খেলাকে তাঁরা জৈব ব'লেই মানবেন, কিন্তু সাহিত্যকেও তাঁরা অ-জৈব বলতে রাজি হবেন না। তাঁদের মতে দুই-ই অভিন্ন জৈব-শক্তির প্রকাশ। তাঁদের কাছে কিছুই জীবনযুদ্ধের বাইরের নয়, সবই জৈবতার রূপান্তর। তাঁরা সাহিত্যতত্ত্বে ক্রীড়াবাদী, কিন্তু লীলাবাদী নন। তাঁদের মতে সাহিত্য মানুষের উদ্‌বৃত্ত শক্তির সৃষ্টি, কিন্তু সে উদ্‌বৃত্ত শক্তি অজৈব নয়। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের আপত্তি। সাহিত্যকে তিনিও উদ্‌বৃত্ত শক্তির প্রকাশ ব'লে মনে করেন। কিন্তু সে উদ্‌বৃত্ত শক্তি জৈব নয়। সাহিত্য জীবনযাত্রাক্ষেত্রের সম্প্রসারণ নয়। সাহিত্য মানুষের বিশুদ্ধ আনন্দকে, বিশুদ্ধ মুক্তিকে—এক কথায় বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বকে প্রকাশ করে। ওই উদ্‌বৃত্তেই মানুষের মনুষ্যত্ব, তার স্বধর্ম। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ মানুষকে বলেছেন Angel of Surplus।

যা স্বধর্ম তাকে উদ্‌বৃত্ত বললে ভুল বুঝবার খুবই আশঙ্কা থাকে। তবে, উদ্‌বৃত্ত কথাটা শাস্ত্রানুমোদিত। অর্থব বেদে একেই উচ্ছিষ্ট বলা হয়েছে। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "...মানব-ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি প্রকৃতির প্রয়োজন সে পেরিয়ে, সে আসছে অতিরিক্ততা থেকে।...সেই অতিরিক্ততাতেই উৎপন্ন হচ্ছে স্বাস্থ্য আনন্দ শক্তি, সেই অতিরিক্ত-তাতেই অধিকার ক'রে আছে সৌন্দর্য, সেই অতিরিক্ততাতেই প্রসারিত ভূত ভবিষ্যৎ।...এ সমস্তই বিশ্বমানবমনের ভূমিকায়, যারা একে স্বীকার করে তারাই মনুষ্যত্বের পদবীতে এগোতে থাকে।...তার যোগে আমরা যদি আমাদের জীবধর্মের অতিরিক্ত সত্তাকে অনুভব করি তবে বলতে হবে, সে সত্তা কখনোই অমানব নয়, তা মানবব্রহ্ম।"[৮]

ফ্রয়েডের সাহিত্য সম্পর্কিত মতকেও মোটামুটিভাবে ক্রীড়াবাদের সগোত্র ব'লে

গণ্য করা যায়। ফ্রয়েডের মতে সাহিত্য বা শিল্প এক ধরণের ফ্যাণ্টাসি রচনা। স্বপ্নের সঙ্গে তার মিল আছে। খেলার সঙ্গেও। সাহিত্যের মূলে আছে ইচ্ছাপূরণ শক্তির ক্রিয়া। সাহিত্যের কাজ হ'লো সেই রকম একটি বিকল্প-বাস্তবের রচনা করা, সেই রকম একটি স্বপ্নের ভুবন নির্মান করা, যেখানে অতৃপ্ত তৃষ্ণার প্রেতভূমিবাসীদের জন্মান্তর ঘটে, যেখানে তারা ঊর্ধ্বায়িত হ'য়ে দিব্যদেহ ধারণ করে এবং নতুনতর পরিতৃপ্তির অবকাশ পায়। এই মতে, সূক্ষ্মভাবে দেখলে, স্বপ্ন আর খেলা আর আর্ট — তিনই মূলত সমধর্মী। অর্থাৎ মূলত তিনটেই জৈব ব্যাপার, এবং তিনটেই সমানভাবে প্রয়োজনসাধক। তিনের ক্রিয়া তিন রকম, এই যা তফাৎ। ক্রীড়াবাদী হ'তে পারে, কিন্তু এই মতকে লীলাবাদী ব'লে নিশ্চয়ই কেউ ভুল করবে না। এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের লীলাবাদের প্রসঙ্গে ফ্রয়েডের ক্রীড়াবাদের আলোচনাকে আমরা অনায়াসে পাশ কাটিয়ে যেতে পারি।

এই প্রসঙ্গে বরং কন্‌রাড লাঙ্গে-র মতবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। লাঙ্গে শুধু ক্রীড়াবাদী নন, হাল্‌কা অর্থে ধরলে তাঁকে লীলাবাদীও বলা যায়। আর্ট এবং খেলার সাধারণ ধর্ম হিসেবে লাঙ্গে তিনটি ব্যাপারের উপর জোর দিয়েছেন। এক, অপ্রয়োজনের আনন্দ — যুগপৎ নিরাসক্তি এবং সম্ভোগ। দুই, ফ্যাণ্টাসি বা ইলিউশন রচনা, মায়াজগৎ নির্মাণ, স্বপ্নের ভুবন সৃষ্টি করা। তিন, সজ্ঞান আত্মছলনা — যাকে যা নয় ব'লে জানি ইচ্ছা ক'রেই তাকে তাই ভাবা, মিথ্যাকে সত্য ব'লে ভেবে নেওয়া। লীলা, ক্রীড়া এবং ইলিউশন বা মায়া, এই তিনই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ন তৃতীয়টি — মায়াজগৎ নির্মান। কারণ এইখানেই এ-মতবাদের বিশিষ্টতা। লীলাবাদ বা ক্রীড়াবাদের থেকেও ইলিউশনবাদ ব'লেই মতটি বেশি পরিচিত।

লীলাবাদ ও ইলিউশনবাদের মধ্যে কোনো নিত্য সংযোগ নেই। সাহিত্য যে-মায়াজগতের নির্মাণ, সে-জগৎ যে দেশ-কাল অনালিঙ্গিত, অ-লৌকিক, তা যে অবাস্তব, এ-রকম মত লীলাবাদের বাইরেও অনেক মিলবে। প্লেটোর শিল্পতত্ত্বও এক ধরণের ইলিউশনবাদ। খাঁটি ইলিউশনবাদীর আসল জোর ছলনার উপর, আর্টের জগৎ যে সর্বৈব মিথ্যা, সর্বৈব অবাস্তব এই ব্যাপারটার উপর। আর্টে যিনি সত্যের সন্ধানী তিনি খাঁটি ইলিউশনবাদী নন। প্লেটো এবং তাঁর শিষ্য এ্যারিস্টট্‌ল দু-জনেই অনুকরণবাদী, কিন্তু সত্যের প্রশ্নে দু-জনের বক্তব্য দু-রকম। প্লেটোর মতে আর্ট মিথ্যাচারী, এ্যারিস্টট্‌লের মতে আর্ট সত্যসাধক। প্লেটো ইলিউশনবাদী, এ্যারিস্টট্‌ল খাঁটি ইলিউশনবাদী নন। ঠিক তেমনি অনেকটা একই কারণে রবীন্দ্রনাথও ইলিউশনবাদী

নন। কারণ তাঁর কাছে সাহিত্যের মায়াজগৎ মায়া হ'য়েও মিথ্যা নয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে সাহিত্য ছলনা হ'য়েও ছলনা নয়। তিনি বলেছেন, কবি শিল্পী এঁরা স্বপ্নের ভুবন রচনা করেন। তিনি নিজেও তাই করেন। তিনি বলেছেন, স্রষ্টার মানস-গগন ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ। বলেছেন :

একা-একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।[৯]

রবীন্দ্রনাথের কাছে এই স্বপ্নের ভুবন সম্পূর্ণ সত্য, তথাকথিত বাস্তবের থেকে সত্যতর, বাল্মীকির মনোভূমির রাম অযোধ্যার ঐতিহাসিক রাজকুমারের থেকে যেমন সত্যতর।

সাহিত্য হয়তো খেলার জগতের মতো, স্বপ্নের জগতের মতো, নিউরটিকের জগতের মতো অথবা উদ্দাম উন্মাদের জগতের মতো সত্যিই একটা মায়াজগৎ নির্মাণ করে। সত্যিই হয়তো তা অবাস্তব। কিন্তু সেইটেই সাহিত্যের শেষ কথা নয়। অবাস্তবের পথে ডেকে নিয়ে গিয়েই সাহিত্য আমাদের জীবনসত্যের মুখোমুখি ক'রে দেয়। সত্যের বেশি কাছে এনে দেবে ব'লেই সাহিত্য আমাদের অনেকটা দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। খেলা বা স্বপ্ন তা করে না। এইখানেই মৌল পার্থক্য।

লীলাবাদ ইলিউশন-ভিত্তিক নয়, তার ভিত্তি মুক্তি এবং আনন্দ। বলতে পারি, অপ্রয়োজনের আনন্দ। বিষয়টিকে সেই দিক থেকেই দেখতে হবে। কিন্তু যদি মাত্র অপ্রয়োজনের কারণেই শিল্প বা সাহিত্যকে লীলাধর্মী ক্রীড়াধর্মী বলি, তাহ'লে কিন্তু পাশ্চাত্য শিল্পতত্ত্বে এ-মত মোটেই নতুন নয়। স্বয়ং প্লেটোর রচনাতেই আমরা এর আভাস পাবো। আনন্দ এবং অপ্রয়োজনের কারণে সংগীতকে — সব শিল্পকে না হোক, অন্তত সংগীতকে — তিনি খেলা বলতে দ্বিধা করেননি। সংগীতের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "That which has neither utility nor truth nor likeness, nor yet, in its effects, is harmful, can best be judged by the criterion of charm that is in it, and by the pleasure it affords. Such pleasure, entailing as it does no appreciable good or ill, is play."[১০] এটা অবশ্য খানিকটা বিচ্ছিন্ন এবং ব্যতিক্রমের মতো উক্তি। পাশ্চাত্য দর্শনে এর কোনো উল্লেখযোগ্য ধারাবাহিকতা নেই। এই যে প্রয়োজনাতীত আনন্দের তত্ত্ব, বরং কাণ্ট থেকেই এর শুরু বলতে হবে। অবশ্য কাণ্টের পূর্বেও অষ্টাদশ শতকের কোনো কোনো ইংরেজ দার্শনিকের রচনায় এই ধরণের অপ্রয়োজনবাদ

বা লীলাবাদের একটা অনতিস্ফুট পূর্বাভাস পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে শ্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরি, হাচিসন, হোম — এঁদের আধা-রোমান্টিক আধা প্লেটোনিক সৌন্দর্যদর্শনের কথা উল্লেখ করা দরকার। কিন্তু শিল্পদৃষ্টি যে নিরাসক্ত আনন্দের দৃষ্টি, 'Disinterested pleasure'-এর দৃষ্টি, সৌন্দর্যের মধ্যে যে একটা উদ্দেশ্যহীন উদ্দেশ্য-অভিমুখিতার ভাব ('purposiveness without purpose'), একটা প্রয়োজনহীন প্রয়োজন-সাধকতার ভাব আছে, এবং সেইখানেই যে শিল্পের আসল রহস্য, এই তত্ত্বকে কান্টই প্রথম সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। "The satisfaction in the beautiful is alone a disinterested and free satisfaction", এই হ'লো কান্টের সৌন্দর্যদর্শনের মূল সূত্র।

এর উপর ভিত্তি ক'রেই শিলারের বিখ্যাত প্লে-থিয়োরি গ'ড়ে উঠেছে। নানা জাতের ক্রীড়াবাদের মধ্যে একমাত্র শিলারের ক্রীড়াবাদই মোটামুটিভাবে রবীন্দ্রনাথের লীলাবাদের সমধর্মী। সাক্ষাৎভাবে কান্টের কাছে ঋণী হ'লেও, শিলারের মনে কান্টের সৌন্দর্যদর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও বড়ো কম ছিলো না। শিলারের মনে হয়েছে, নিরাসক্ত মুক্ত আনন্দের কথাটা ঠিক হ'লেও, কান্টের সৌন্দর্যতত্ত্ব বড়ো বেশি-রকমের বিষয়ী-ভিত্তিক, বেশি-রকমের সাবজেকটিভ। শিলার চান বিষয়ের গুরুত্বটাকে আর একটু বড়ো ক'রে দেখতে। শিল্প যে শুধু বিষয়ীর বিশিষ্ট দৃষ্টিতেই শিল্প নয়, জগৎটাই যে শিল্পময়, এইটে প্রতিপাদন করাই শিলারের প্রধান উদ্দেশ্য। কার্যক্ষেত্রে এ-ব্যাপারে তিনি কতোখানি সফলকাম হয়েছেন সে-কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু এই জায়গায় শিলার ও রবীন্দ্রনাথের মিল যে সুগভীর, তাতে সন্দেহ নেই।

শিলারের শিল্পতত্ত্বে খেলা ব্যাপারটা এমন একটা দার্শনিক তাৎপর্য পেয়েছে যে তাকে মাত্র খেলা না ব'লে অনায়াসেই আমরা লীলা ব'লে গ্রহণ করতে পারি। বস্তুত, পাশ্চাত্য ক্রীড়াবাদীদের মধ্যে একমাত্র শিলারই খাঁটি লীলাবাদী, গভীর অভিব্যঞ্জনায় লীলাবাদী। রবীন্দ্রনাথের মতো শিলারও খেলা বা লীলাকে মানবস্বভাবের সঙ্গে একাত্ম ক'রে দেখেছেন। "Man plays only when he is in the full sense of the word a man, and he is only wholly Man when he is playing"।[১১] রবীন্দ্রনাথের মতো শিলারও মনে করেন, শিল্পবোধ সৌন্দর্যবোধ মানুষের স্বধর্ম। "Beauty must be exhibited as a necessary condition of humanity"।[১২] রবীন্দ্রনাথের মতো শিলারও মনে করেন, সৃজনের মধ্যেই মানুষ মুক্ত, সৃজনের মধ্যেই মানুষ যথার্থ মানুষ — সৌন্দর্যসৃষ্টির পথই মানুষের যথার্থ আত্মকর্তৃত্বের, যথার্থ আত্ম-প্রকাশের পথ।

শিলারের পরবর্তী কোনো ক্রীড়াবাদী কোনো লীলাবাদীই শিলারের প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সে-প্রভাব কীভাবে বা কতোখানি পরিমাণে ক্রিয়া করেছে সে-প্রশ্ন এখানে অবান্তর। একটু লক্ষ করলেই বুঝতে পারবো, শত প্রভাব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কোনো প্রভাবই নয় — শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র-চিন্তার আপন স্বভাবধর্মই রবীন্দ্রনাথের শিল্পসিদ্ধান্তকে যথাস্থানে নিয়ে পৌছিয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এবং শিলার দু-জনের পথ অনেকটা এক, লক্ষ্যও বোধকরি খুব পৃথক নয়, কিন্তু দু-জনের উত্তরণ সমান অনায়াস নয়, সমপরিমাণে সিদ্ধ নয়। শিলারের পক্ষে বাধা কিছু বেশি ছিলো। অন্যতম প্রধান বাধা কাণ্টের উত্তরাধিকার।

রবীন্দ্র-দর্শনকে সামগ্রিকভাবে ইস্থেটিক দর্শন বলতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু শিলার-দর্শনের ক্ষেত্রে তার বাধা আছে। শিলার যতো সহজে ইস্থেটিক শিক্ষার কথা বলতে পেরেছেন, ততো সহজে ইস্থেটিক দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। আপাতদৃষ্টিতে ইস্থেটিক দর্শন ব'লে মনে হ'লেও শিলার তাঁর গন্তব্যের অনেক আগেই থেমে পড়েছেন। একটু লক্ষ করলেই শিলারের দর্শনে সূক্ষ একটা দ্বিধার ভাব নজরে পড়বে। এই দ্বিধার মধ্যে এন্‌লাইটেন্‌মেণ্টের প্রভাব ক্রিয়াশীল। এই দ্বিধার কারণেই মানবসত্যকে আর শিল্পসত্যকে শিলার সম্পূর্ণ এক ক'রে ফেলতে পারেননি।

কাণ্টের উপর, অথবা এন্‌লাইটেন্‌মেণ্টের উপর দায়িত্ব অরোপ করার পূর্বে বিষয়টাকে একটু তলিয়ে বুঝে দেখা দরকার। কাণ্টের দর্শনে শিল্পদৃষ্টির কাজটা কী? কাণ্টের মতে শিল্পদৃষ্টির কাজ হ'লো, একদিকে বিশুদ্ধ বুদ্ধি (pure reason) আর অন্য-দিকে ব্যবহারিক বুদ্ধি (pratical reason), এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা, উভয়কে মিলিয়ে দেওয়া। কাণ্টের দর্শনে বিশুদ্ধ বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি এবং অনুভূতি, তিনেরই নিজের নিজের ক্ষেত্র আছে। নান্দনিক অনুভূতির এলাকায় এসে এদের দূরত্ব ঘুচে যায় — সাময়িক মিলন ঘটে। কিন্তু সেই মিলনটা স্বয়ংসিদ্ধ নয়, নান্দনিক অনুভূতিও সর্বব্যাপ্ত নয়। তা যখন নয়, তখন কাণ্টের দর্শনকে ইস্থেটিক দর্শন বলবারও কোনো হেতু নেই।

শিলারের চিন্তায় কাণ্টীয় বৃত্তি-বিভাগের এবং তদনুযায়ী মনের এলাকা-বিন্যাসের ছাপ সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। এই বিন্যাসকে কিছুমাত্র বজায় রাখলে, মনকে বৃত্তি অনু-সারে বিভক্ত ক'রে দেখবার সংস্কারকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দিলে, নান্দনিক অনুভূতির এক-তন্ত্রতা কখনোই সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এবং সে ক্ষেত্রে ইস্থেটিক দর্শন কখনোই দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে না। শিলারের বেলায় অনেকটা সেই রকমই ঘটেছে।

শিলারের দর্শনে শিল্পবোধের প্রধান কাজ হ'লো ইন্দ্রিয়চেতনার স্তরকে বুদ্ধির স্তরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেওয়া। শিলারের কথা থেকে অনেক সময় মনে হয়, এইটেই বোধ-করি শিল্পচেতনার একমাত্র কাজ। মনে হয়, শিল্পচেতনা যেন নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে পেঁছুবার একটা সিঁড়ি মাত্র। মনে হয়, শেষ পর্যন্ত শিলারের মতে মানুষের পরমা গতি বুদ্ধিতেই, শিল্পচেতনায় নয়। শিলারের অনেক উক্তির মধ্যে এই মনোভাবের আভাস পাওয়া যাবে। "...there is no other way to make the sensuous rational than by first making him aesthetic."[১৩] এই ধরনের উক্তিতে বুদ্ধির যে-অগ্রাধিকার সূচিত হয়েছে, তার মধ্যে এন্‌লাইটেন্‌মেণ্টের দান সুস্পষ্ট। মনের বৃত্তি-বিভাগ বা স্তর-বিভাগের উপর রবীন্দ্রনাথ কখনোই খুব বেশি গুরুত্ব দেননি। তাঁর আসল জোর উপলব্ধির সমগ্রতার উপর, মনের ঐক্যের উপর। শিল্পচেতনা মনের এক স্তর থেকে আর-এক স্তরে উঠবার একটি সোপান মাত্র, এমন কথা কখনোই রবীন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হবে না। সত্যদ্রষ্টা হিসেবে বুদ্ধির অগ্রাধিকারকে তিনি স্বীকার করেন না। তাঁর কাছে শিল্পসত্যই মানবজীবনের প্রথম এবং শেষ সত্য।

লীলাবাদ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্নের উত্তর এখনো বাকি আছে। প্রশ্নটা সত্য সংক্রান্ত। অথবা বলতে পারি, লীলা এবং সত্যের সঙ্গতি সংক্রান্ত। এ-প্রশ্ন সব-রকম লীলাবাদকে বা সব-রকম ক্রীডাবাদকে স্পর্শ করে না। যেমন, আগেই দেখেছি, লাঙ্গের ক্রীড়া-বাদকে করেনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে করে। তার কারণ তিনি লীলাও মানেন, আবার সাহিত্যের হ'য়ে সত্যের দাবিকেও তিনি ছাড়তে অনিচ্ছুক। বিষয়টা অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য, তবু কথাটাকে এখানে একেবারে এড়িয়ে যাওয়া সঙ্গত হবে না। সাহিত্যের আদর্শ বা লক্ষ্য যদি হয় সত্য, সাহিত্যের যদি সত্যরক্ষার বা সত্য-প্রকাশের দায়িত্ব থেকে থাকে, তাহ'লে তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন, সম্পূর্ণ মুক্ত কেমন ক'রে বলি? অন্যদিকে, সাহিত্য যদি সম্পূর্ণ দায়দায়িত্বহীনই হয়, সম্পূর্ণ মুক্তই হয়, তাহ'লে সত্যের দাবিই বা সে মানবে কেন? মিথ্যা হ'তেই বা তার বাধা কোথায়? রবীন্দ্রনাথ লীলা আর সত্যকে, মুক্তি আর দায়িত্বকে মেলালেন কেমন ক'রে?[১৪]

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এর উত্তর সরল। মুক্তিকেই যদি সত্য বলি? লীলাকেই যদি দায়িত্ব বলি? রবীন্দ্রনাথ অনেকটা সেই রকমই বলেছেন। সত্য লীলার বাইরে নয়। লীলা চরম ব'লেই তাকে সত্য বলি। অথবা, এমনও বলতে পারি যে, সত্যই

লীলা-ভরে আপনাকে প্রকাশ করে। সত্যের নিজেকে নির্মাণ করার নামই লীলা। সত্য তো একটা তৈরী-করা বস্তু নয়, সত্য একটা ক্রিয়াশীলতা। এই ক্রিয়াশীলতা বাধাহীন, মুক্ত, স্বতঃস্ফূর্ত। সেই কারণেই তাকে লীলা বলি। আমরা আগেই দেখছি, রবীন্দ্রনাথের মতে সত্য অর্থই মানবসত্য। মানবসত্য অর্থই মানবধর্ম। মানুষের স্বধর্মই আনন্দ — সতত সৃজনশীলতার আনন্দ। স্বধর্মের প্রকাশেরই নাম মুক্তি। তাকেই বলি লীলা।

ঈশ্বরের লীলাও ভারতীয় দর্শনে ঠিক এইভাবেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। জগৎ-সৃষ্টি ঈশ্বরের লীলা। পূর্বে উল্লেখিত 'লীলাকৈবল্যম্' সূত্রটির ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য বলেছেন, লীলা ঈশ্বরের [ব্রহ্মের নয়] স্বভাব। যা স্বভাব তা আপনা-থেকেই নিষ্পন্ন হয়। ঈশ্বরের স্বভাব-বশেই জগৎ সৃষ্টি। স্বভাবের কোনো কেন নেই। ঈশ্বরের স্বভাব এই রকম কেন এ-অনুযোগ অর্থহীন। "ন চ স্বভাবঃ পর্যনুযোক্তুং শক্যতে।"[১৫] ঈশ্বরের বদলে এখানে যদি মানবব্রহ্ম কথাটা ব্যবহার করি, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথের মুখেও আমরা অনায়াসে শঙ্করের যুক্তি বসিয়ে দিতে পারি। বলতে পারি, স্বভাবের কোনো কেন নেই। স্বভাবের দায়কে দায় বলা যায় না। সে হ'লো আত্মপ্রয়োজন।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য হিতবাদীরা প্রয়োজন কথাটিকে অত্যন্ত সংকীর্ণ ক'রে তাকে স্থূল ইউটিলিটির সঙ্গে এক ক'রে দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আসল আপত্তি এই স্থূল ইউটিলিটিতে। ইচ্ছা করলে প্রয়োজনকে আমরা অনেক গভীর অর্থেও গ্রহণ করতে পারি। যা স্বভাবের দায়, তাই হ'লো সব থেকে বড়ো প্রয়োজন। তারই নাম আত্মপ্রয়োজন। বলতে পারি, সৃষ্টি মানুষের আত্মপ্রয়োজন। এই আত্মপ্রয়োজনেই মানুষ দিনরাত্রির মালা গাথে, কান্নাহাসির দোলায় দোলে, ভালোবাসার অমৃতে অমর হয়। আত্মপ্রয়োজনেই মানুষ সমাজ-সংসার গড়ে, সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, প্রতিনিয়ত মানবতাকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করতে করতে চলে। আত্মপ্রয়োজনেই মানুষ নিজেকে অতিক্রম করে, এক বহু হয়। এই সুনিবিড়, সুগভীর প্রয়োজনের কারণেই মানুষের মিলনসাধনা, মানুষের শিল্পসাহিত্য, মানুষের মানবপ্রকাশ। তার মধ্য দিয়েই মানুষের সত্যলাভ, মানুষের আত্মলাভ। তাতেই মানুষের আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন অপ্রয়োজনের আনন্দ, ইচ্ছা করলে অনায়াসে তাকে আমরা আত্মপ্রয়োজনের আনন্দও বলতে পারি।

১. "ভূমিকা", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।২৯২

২. তদেব

৩. তদেব

৪. 'গীতবিতান', র।৪।৯৪

৫. সহজিয়া সাধনতত্ত্বকে এর কিছুটা ব্যতিক্রম ব'লে ধরা যেতে পারে। ব্যতিক্রম হিসেবে দক্ষিণ ভারতের আলোয়ার সাধক-সাধিকাদের কথা, সূফী সাধকদের কথা অথবা মীরাবাঈয়ের ভজনগানের কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়। এগুলোকে ভারতীয় সাধনার প্রতিনিধিত্বমূলক ধারা ব'লে গণ্য করা যায় কিনা সে-বিষয়ে অনেকেই হয়তো সন্দেহ করবেন।

৬. "ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া সৃষ্টিশ্রুতিঃ অবিদ্যাকল্পিতনামরূপব্যবহারগোচরত্বাৎ।" শঙ্করকৃত শারীরক ভাষ্য, ২।১।৩৩

৭. "তথ্য ও সত্য", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৩১১-২

৮. র।১২।৫৮২-৩

৯. "পূর্ণতা", 'পূরবী', র।২।৬৪৮

১০. প্লেটোর *Laws* ii 667 E

১১. শিলারের "On Aesthetic Education of Man" (*Letters*), অনু. R. Snell, p. 80

১২. তদেব, 60

১৩. তদেব, 108

১৪. এ-প্রসঙ্গে ৮ম অধ্যায়ে 'সাহিত্যের সত্য' দ্রষ্টব্য।

১৫. শঙ্করকৃত শারীরক ভাষ্য, ২।১।৩৩

ট্র্যাজেডি প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে সাহিত্য নিয়ে সামগ্রিক আলোচনাই বেশি, সাহিত্যের শাখা-প্রশাখা নিয়ে, তার শ্রেণী-গোত্র নিয়ে আলোচনা সে তুলনায় অনেক কম। সাহিত্য কী, সাহিত্যের কাজ কী, সৃষ্টি ব্যাপারটা কী, সৌন্দর্য কাকে বলবো, শিল্পতত্ত্ব সাহিত্যতত্ত্বের এই সব গোড়াকার প্রশ্নই রবীন্দ্রনাথকে বেশি আকৃষ্ট করেছে। কবিতা কী, কাকে বলবো নাটক, তার লক্ষণ কী কী, উপন্যাসে ছোটগল্পে তফাৎ কোথায়, কাকে বলবো ট্র্যাজেডি আর কাকে-বা বলবো কমেডি, এ-সব প্রশ্নের খুঁটিনাটিতে তাঁর খুব আগ্রহ ছিলো না। ক্লাসিক সাহিত্যশাস্ত্রীরা যাকে বলেছেন, Literary kinds, রবীন্দ্রনাথ নিজে যাকে বলেছেন, সাহিত্যের জাতি-কুল, তাদের বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ খুব চিন্তিত ছিলেন না।

না থাকাই স্বাভাবিক। এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা অনেকখানি পরিমাণে রোমান্টিক সাহিত্যচিন্তারই উত্তরাধিকারী। সাহিত্যের জাতি-কুলের বিচার নিয়ে বাড়াবাড়ি করাকে রবীন্দ্রনাথ পরিহাসযোগ্য ব'লেই মনে করেছেন। অল্প বয়সে মহাকাব্য নিয়ে, মধ্য বয়সে কাব্য নিয়ে, ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে এবং পরিণত বয়সে গদ্যকাব্য নিয়ে কিছু-কিছু ওই জাতীয় আলোচনা করেছেন বটে, কিন্তু তার কোনোটিই খুব বিস্তৃত নয়, এবং প্রত্যেকটিরই কিছু-না-কিছু তৎকালিক উপলক্ষ ঘটেছিলো। ক্লাসিক সাহিত্যশাস্ত্রীদের দ্বারা বহু-সম্মানিত ট্র্যাজেডি নামক অভিজাত সাহিত্য-শাখাটির কুল-লক্ষণ বিচারে রবীন্দ্রনাথ যে খুব বেশি উৎসাহী হবেন না, এ-কথা সহজেই অনুমান করা যায়।

ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা-কিছু বলেছেন সবই প্রাসঙ্গিক এবং আনুষঙ্গিক উক্তি। তা শ্রেণী হিসাবে ট্র্যাজেডির রূপ, তাৎপর্য বা বৈশিষ্ট্যের বিচার-বিশ্লেষণ নয়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অন্যত্র। ট্র্যাজেডির মধ্যে — শুধু ট্র্যাজেডি নয়, যে-কোনো দুঃখজনক কাহিনীর মধ্যেই — সাহিত্যতত্ত্বের একটি গূঢ় রহস্য লুকোনো আছে। রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ট্র্যাজেডি নয়, রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য সেই রহস্য।

রহস্যটা সকলেরই সুবিদিত। জীবনে দুঃখ ভয় বিপদকে আমরা সব সময় এড়িয়ে চলি। সাহিত্যে তারা কেন এতো আকর্ষণীয়? ট্র্যাজেডি যে আমাদের আনন্দ দেয়

এটা প্রশ্নাতীত। অথচ অনুরূপ ঘটনা জীবনে ঘটুক তা আমরা কখনোই চাই না। জীবনের ট্র্যাজেডি সব সময় পরিহারযোগ্য, সাহিত্যের ট্র্যাজেডি সব সময় আকর্ষণীয়, সব সময় আনন্দদায়ক। এটা কেমন ক'রে সম্ভব হয়?

'জীবনের ট্র্যাজেডি' কথাটাকে একটু সংশোধন ক'রে দেওয়া দরকার। আমরা ব'লে থাকি, ট্র্যাজেডি জীবনেরও হ'তে পারে, আবার সাহিত্যেরও হ'তে পারে। ট্র্যাজেডি কথাটাকে অত্যন্ত শিথিলভাবে প্রয়োগ করলে, এ-রকম বলা যায় বটে, কিন্তু এ-রকম প্রয়োগে বিভ্রান্তিও ঘটতে পারে। স্মরণ রাখতে হবে যে, জীবনের ট্র্যাজেডি আর সাহিত্যের ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণ আলাদা স্তরের দুটো ব্যাপার। একটা হ'লো ঘটনা, জৈব স্তরের ব্যাপার; আর একটা হ'লো আর্ট — সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবভূমিতে অধিষ্ঠিত একটা ভিন্ন গোত্রের সত্য। দুটোকে এক নামে অভিহিত করা সঙ্গত নয়।

ঘটনাকে যখন ট্র্যাজেডি বলি, তখন অ-সাহিত্যিক অর্থে, অ-পারিভাষিক অর্থে বলি, অনেকটা আলংকারিক অর্থেই বলি। আসল অর্থটা সাহিত্যের ক্ষেত্রের। অর্থাৎ ট্র্যাজেডি একটা বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ। বর্ষার বৃষ্টি আর শ্রাবণের গান যেমন আলাদা, বাস্তব প্রেম আর প্রেম-বিষয়ক কবিতা যেমন আলাদা, জীবনের 'ট্র্যাজিক' ঘটনা আর সাহিত্যের ট্র্যাজেডি তেমনি আলাদা। এর শেষেরটাই সাহিত্যতত্ত্বের আলোচ্য, প্রথমটা নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নও শেষেরটাকে নিয়ে, প্রথমটাকে নিয়ে নয়।

কিন্তু কথাটা কি পুরোপুরি ঠিক? সত্যিই কি রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন কেবল সাহিত্যের ট্র্যাজেডিকে নিয়েই? না, দুয়ের সম্পর্ককে নিয়ে?

সাহিত্যতত্ত্বের মূল লক্ষ্য যদিও সাহিত্যের ট্র্যাজেডি, তাহ'লে জীবনের 'ট্র্যাজিক' ঘটনার প্রসঙ্গকে সে একেবারে এড়িয়ে যেতে পারে না। তার কারণ, দুয়ের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। বর্ষা না থাকলে বর্ষার গান থাকতো না প্রেম জিনিসটাই যদি না থাকতো, প্রেমের কবিতা লেখা হ'তো না। জীবনে দুঃখকর ঘটনা ঘটে ব'লেই ট্র্যাজেডি লিখিত হয়। সংসার যদি এমনই সুখ-স্বর্গ হ'তো যে সেখানে দুঃখবেদনা নেই, আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতা নেই, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘর্ষ নেই, ব্যর্থতা নেই, তাহ'লে তার সাহিত্যে আর যা-ই থাক ট্র্যাজেডি থাকতো না। জীবনের দুঃখকর দিকের প্রসঙ্গকে বাদ দিয়ে সাহিত্যের দুঃখকর ঘটনার আলোচনা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়।

সংসারের দুঃখকর কাহিনী সাহিত্যে কেন আনন্দ দেয়, রবীন্দ্রনাথের এই প্রশ্নের আলোচনা আপাতত মুলতুবি থাকতে পারে। তার আগে আরো একটা গোড়াকার প্রশ্ন আছে। সাহিত্য যদি সত্যিই মানুষের আনন্দপ্রাচুর্যের প্রকাশ হয়, যেমন রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, তাহ'লে সেই সাহিত্যে আদৌ ট্র্যাজেডি থাকতে পারে কি?

অন্যপথে, ট্র্যাজেডির অস্তিত্বই কি এ-কথা প্রমাণ করে না যে সাহিত্য মানুষের আনন্দ-প্রাচুর্যের প্রকাশ নয়? ট্র্যাজেডির অস্তিত্বই কি প্রমাণ করে না যে দুঃখবেদনা জীবনের একটা অনস্বীকার্য নির্মম সত্য?

দুঃখের সত্যতা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সেইখানেই যাঁর প্রশ্ন, তিনি সাহিত্যের ট্র্যাজেডিকে কেমন ক'রে গ্রহণ করবেন? যিনি জীবনতত্ত্বে আনন্দবাদী — যিনি মনে করেন, যা-কিছু আছে সবই আনন্দরূপমমৃতং, তিনি কেমন ক'রে ট্র্যাজেডিকে স্বীকার ক'রে নেন? আমরা দেখেছি ট্র্যাজেডি ব্যাপারটাকে রবীন্দ্রনাথ সহজভাবেই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। জীবনের দুঃখবেদনা এবং সাহিত্যের ট্র্যাজেডি, এ দুই-ই রবীন্দ্রনাথের কাছে নিঃসংশয়ে সত্য। আমাদের প্রশ্ন এইখানেই। এই স্বীকৃতি কি রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদকে — তাঁর আনন্দবাদী জীবনতত্ত্ব এবং আনন্দ-বাদী সাহিত্যতত্ত্বকে খণ্ডিত করে না?

দুঃখবেদনার সত্য যদি অনন্দবাদকেই খণ্ডিত করে, তাহ'লে বুঝতে হবে রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাদী নন। আসলে রবীন্দ্রনাথ দুঃখকেও মানেন, আনন্দকেও মানেন; ট্র্যাজেডিকেও মানেন, আনন্দবাদকেও মানেন। যে-আনন্দবাদ দুঃখবেদনার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদ সে-জাতের নয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে আনন্দ সুখ নয়, আরাম নয়, সন্তোষ নয়। আনন্দ দুঃখের বিপরীত নয়। রবীন্দ্রনাথ আনন্দ-প্রাচুর্যের কথা বলছেন, সুখ-প্রাচুর্যের কথা বলেননি। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি-বৈচিত্র্যের কথা বলেছেন, তার মধ্যে দুঃখের অভিজ্ঞতার, দুঃখের উপলব্ধিরও স্থান আছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে যে-কোনো অভিজ্ঞতাই, যে-কোনো উপলব্ধিই আত্ম-অভিজ্ঞতা আত্ম-উপলব্ধি — তারই নাম আনন্দ! রবীন্দ্রনাথের মতে জীবন যেমন আনন্দময়, আনন্দও যেমনি জীবনের সুখদুঃখ ভয়-বিস্ময় প্রীতি-হিংসার সম্ভ্রাধিক রসৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবন-প্রাচুর্যই আনন্দ-প্রাচুর্য।

দর্শনের উচ্চভূমি থেকে রবীন্দ্রনাথ যাকে আনন্দের তত্ত্ব বলেছেন, আমাদের সাধারণ বোধের সমভূমি থেকে তাকে আমরা জীবন-প্রাচুর্যের তত্ত্বও বলতে পারি, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির পরিপূর্ণতার তত্ত্বও বলতে পারি। রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদ — অথবা যদি একে জীবনবাদ বলি, রবীন্দ্রনাথের জীবনবাদ ট্র্যাজেডির স্বীকৃতির দ্বারা খণ্ডিত হয় না। ট্র্যাজেডি আমাদের অভিজ্ঞতার পাত্রকে পূর্ণ করে। এখানেই ট্র্যাজেডির বিশিষ্ট মূল্য। পরে দেখতে পাবো, ট্র্যাজেডির রহস্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, জীবনের দুঃখকর কাহিনী সাহিত্যে কেন আনন্দকর — সে-প্রশ্নের উত্তরও এইখানেই নিহিত আছে।

তবু, একটুখানি খট্‌কা এখানে থেকেই যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদ দুঃখ-বেদনাকে অস্বীকার করে না বটে, কিন্তু ট্র্যাজেডির তাৎপর্যকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার ক'রে নিতে পারে কি? যে-কোনো দুঃখকর কাহিনীই ট্র্যাজেডি নয়। ট্র্যাজিডির একটা গভীর অর্থ আছে, একটা গূঢ় জীবনগত তাৎপর্য আছে। দুঃখবেদনার অস্তিত্বকে স্বীকার করা আর এই গূঢ় তাৎপর্যকে স্বীকার করা এক নয়। রবীন্দ্রনাথ কি ট্র্যাজেডির সুদূরপ্রসারী জীবনগত তাৎপর্যকে যথাযথভাবে অনুধাবন করেছেন, স্বীকৃতি দিয়েছেন? সে-রকম কোনো স্বীকৃতি কি তাঁর জীবনতত্ত্বের সঙ্গে খাপ খায়?

অনেকের কাছে এটা কেবল একটি প্রশ্নই নয়। প্রশ্নের অন্তরালে এর মধ্যে একটি অভিযোগও নিহিত আছে। অভিযোগ এই যে, রবীন্দ্রনাথ ট্র্যাজেডির জীবনগত তাৎপর্যকে সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করেননি। ট্র্যাজেডিকে স্বীকার করার অর্থ হ'লো ট্রাজিক জীবনদর্শনকে স্বীকার করা। এই কথা স্বীকার করা যে, ট্র্যাজিক দৃষ্টিই সত্য জীবনদৃষ্টি, ট্র্যাজিক সত্যই জীবনের সার সত্য। অভিযোগকারীরা মনে করেন, যিনি এই সত্যকে স্বীকার করেন না, তাঁর ট্র্যাজেডিতত্ত্বে মূল্যবান কিছু থাকতে পারে না।

অভিযোগটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। প্রাচীনেরা সাহিত্যের ট্র্যাজেডিতত্ত্বকে জীবনের ট্র্যাজিক সত্যের সঙ্গে, ট্র্যাজিক জীবনদর্শনের সঙ্গে এ-ভাবে মিলিয়ে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না। শোপেনহাওয়ার নীট্‌শের আমল থেকেই ট্র্যাজেডি সম্পর্কে এই ধরণের মতবাদ ক্রমশঃ উচ্চকণ্ঠ হ'য়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। ট্র্যাজেডির তাৎপর্যঘটিত এই অভিযোগ একা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, এ-অভিযোগ প্রাচীন সাহিত্য-শাস্ত্রীদের সকলের ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। আমরা আগেই দেখেছি, রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদ দুঃখকে অস্বীকার করে না। সুতরাং আনন্দবাদী হবার দরুণ এ-অভিযোগ যে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হবে, তেমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। বস্তুত, ট্র্যাজেডিতত্ত্বের আদি প্রবক্তা এ্যারিস্টট্‌লকেও এ-অভিযোগ সমানভাবেই স্পর্শ করে।

কিন্তু এ-অভিযোগ কতোখানি যুক্তিযুক্ত? তা বুঝতে হ'লে অভিযোগটাকে আগে ভাল ক'রে বুঝে দেখা দরকার। 'ট্র্যাজেডির জীবনগত তাৎপর্য' কথাটার সঠিক অর্থ কী? কথাটাকে নানা রকম অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক হ'লো এই অর্থ যে, জীবনে ট্র্যাজেডির অথবা ট্র্যাজেডির উপাদানের যথার্থই অস্তিত্ব আছে, দুঃখবেদনা মিথ্যা নয়, মায়া নয়, সত্য। একে এড়িয়ে গেলে জীবনের রূপায়ণ অসত্য হ'য়ে পড়ে। এই অর্থে ধরলে, এ্যারিস্টট্‌ল থেকে রবীন্দ্রনাথ কেউ-ই ট্র্যাজেডির জীবনগত তাৎপর্যকে অস্বীকার করেননি। বুঝতে হবে, পূর্বোক্ত অভিযোগের নির্ভর এই অর্থের উপর নয়।

এই অর্থটাকে স্বীকার ক'রে নিয়েই আরো গভীরতর ব্যঞ্জনাযুক্ত দ্বিতীয় এক অর্থ হ'তে পারে এই যে ট্র্যাজেডির মধ্যে মানবজীবনের এমন একটি সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, এমন একটি নিহিত তাৎপর্যের সন্ধান পাওয়া যায়, জীবনের এমন এক পরম মূল্যের সাক্ষাৎকার ঘটে, যা সাহিত্যের অন্য কোনো শাখায় মেলে না, জীবনের বিশৃঙ্খল অজস্রতার মধ্যে যার স্বরূপ আত্মগোপন ক'রে থাকে। এই অর্থে ধরলে, এ্যারিস্টট্ল এবং রবীন্দ্রনাথ দু-জনের সম্পর্কেই পূর্বোক্ত অভিযোগ অল্পবিস্তর সত্য — অন্তত আংশিকভাবে সত্য। ট্র্যাজেডির মধ্যে কোন্ বিশিষ্ট জীবনসত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, কোন্ অভাবিত মূল্যের সাক্ষাৎকার ঘটে, কেন ট্র্যাজেডিকে মহৎ সাহিত্য ব'লে গণ্য করি, এ্যারিস্টট্ল থেকে রবীন্দ্রনাথ কেউ-ই এ-প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক আলোচনা করেননি। কিছু ইঙ্গিত তাঁদের কথা থেকে হয়তো আমরা সংগ্রহ ক'রে নিতে পারি। কিন্তু তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়।

কিন্তু যে-অভিযোগ নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, তার নির্ভর এ-অর্থের উপরেও নয়। তার দাবিটা আরো জোরালো। অভিযোগটা এ নয় যে, এ্যারিস্টট্ল বা রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডিতত্ত্ব অসম্পূর্ণ ; অভিযোগ এই যে তাঁদের ট্র্যাজেডিতত্ত্ব অর্থহীন, সর্বৈব ভুল। ভুল এই জন্য যে, তাঁরা ট্র্যাজিক জীবনদৃষ্টির রহস্যভেদ করতে পারেননি, জীবনের যথার্থ তাৎপর্যই তাঁরা জানেন না।

এইখানে 'ট্র্যাজেডির জীবনগত তাৎপর্য' কথাটার তৃতীয় অর্থ। 'ট্র্যাজেডির জীবনগত তাৎপর্য' অর্থ হ'লো জীবনের ট্র্যাজিক তাৎপর্য। জীবনের এই ব্যাখ্যা যে, দুঃখ-বেদনা-ব্যর্থতা-ক্ষয়, এই হ'লো জীবনের সার সত্য। দুঃখ যে শুধু চরম তা-ই নয়, দুঃখ সবত্রপরিব্যাপ্ত, তার বাইরে আর কিছুই নেই। বেদনাতেই মানবজীবনের সত্য পরিচয়। ট্র্যাজেডি সেই পরিচয়ই দেয়, দুঃখের বিশ্বরূপ দর্শন করায়। যে-দৃষ্টিতে জীবনের এই সার সত্যটি ধরা পড়ে, সেই দৃষ্টিই ট্র্যাজিক দৃষ্টি। এ্যারিস্টট্ল এই সত্যদৃষ্টির মর্ম জানতেন না। আর রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এই দৃষ্টির সম্পূর্ণ বিপরীত।

বিষয়টাকে একটু তলিয়ে দেখা দরকার। এ্যারিস্টট্ল থেকে রবীন্দ্রনাথ সকলেই এ-কথা স্বীকার করেছেন যে, জীবনে ট্র্যাজেডির উপাদান আছে। এই স্বীকৃতি কতোদূর পর্যন্ত যায় ? প্রথমে এ্যারিস্টট্লের বক্তব্যটাই বিবেচনা ক'রে দেখা যাক।

এ্যারিস্টট্ল বলেন, জীবনের দুঃখভয়জনক এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই ট্র্যাজেডির উপাদান। ট্র্যাজেডি হচ্ছে সেইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত অথচ নিবিড়ভাবে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরূপ। এ্যারিস্টট্ল উপাদানের উপর যেমন জোর দিয়েছেন, রূপায়ণের উপরেও তেমনি সমানই জোর দিয়েছেন। সার্থক ট্র্যাজেডি

হ'তে হ'লে প্রতিরূপটা এমন হবে যেন তার ঘনিষ্ঠ ঐক্যের মধ্যে কোথাও কোনো ফাঁক না থাকে, তার মধ্যে যেন একটা অমোঘতার ভাব থাকে, যেন তা দর্শক-শ্রোতার মনে যুগপৎ করুণা এবং ভীতির সঞ্চার করতে পারে।

অর্থাৎ শুধু উপাদানই ট্র্যাজেডির পক্ষে যথেষ্ট নয়। উপাদানের বিন্যাস, সেই বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে, গতির শরবৎ ঋজুতার মধ্যে দিয়ে, পরিণামের অনিবার্যতার মধ্যে দিয়ে বিশেষ একটি তাৎপর্যের সঞ্চার, এইটেই বড়ো কথা। এইখানেই ট্র্যাজেডি-রচয়িতার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কথা আসছে। এ্যারিস্টট্‌ল যা বলেছেন তা এই দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে। কিন্তু করে যে সে-সম্বন্ধে এ্যারিস্টট্‌লকে খুব সচেতন ব'লে মনে হয় না। তাৎপর্যের ইঙ্গিতটা যেন প্রায় আনুষঙ্গিকভাবে আসছে। এ্যারিস্টট্‌লের আসল ঝোঁক বৈজ্ঞানিকের মতো বিষয়পরিক্রমা করার দিকে, তথ্যগত বর্ণনার দিকে। তবু এই ইঙ্গিতটা তার মধ্যে প্রায় নিঃসংশয়ভাবেই পাওয়া যায় যে, জীবনের অজস্র জটিলতা ও অসংলগ্নতার মধ্যে যে-তাৎপর্যটা সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে, ইতস্ততবিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর আবর্তে যা ছত্রাকার হ'য়ে থাকে, ট্র্যাজেডি-রচয়িতা তাকে সংহত ক'রে, তার থেকে সমস্ত অবান্তরকে ছাটাই ক'রে ফেলে, জীবনের কঠিন ন্যায়-শৃঙ্খলায় বেঁধে, তার বিক্ষিপ্ত তাৎপর্যকে ঘনীভূত ক'রে পরিবেশন করেন।

সন্দেহ নেই, এ-তাৎপর্য জীবনের নিজেরই তাৎপর্য। কিন্তু এতেও সন্দেহ নেই যে তাৎপর্যবোধটা রচয়িতার নিজেরই চৈতন্যের। তাৎপর্যবোধের ভিত্তি রচয়িতার জীবনবোধ। এই জন্যেই ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে রচয়িতার জীবনদর্শনের প্রশ্নটা এতো জরুরী। এ্যারিস্টট্‌লের ইঙ্গিত ততোদূর পর্যন্ত পৌঁছায়নি। এ্যারিস্টট্‌ল বলেছেন, ট্র্যাজেডিতে যে-ঘটনা রূপায়িত হয় তা গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা। গুরুত্ব-লঘুত্ব আপেক্ষিক ব্যাপার। কোন্ ঘটনা কতোখানি গুরুত্বসম্পন্ন তা ব্যক্তিবিশেষের বোধসাপেক্ষ। তার সঙ্গে মূল্যবোধের প্রশ্ন জড়িত। মূল্যবোধের ভিত্তি জীবনদর্শনে। সুতরাং ঘটনার গুরুত্বের প্রশ্নেও ট্র্যাজেডি-রচয়িতার জীবনদর্শনের কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে।

আসাটা অবধারিতই ছিলো। কিন্তু এ্যারিস্টট্‌ল তার পূর্বেই আলোচনাকে ট্র্যাজেডির অঙ্গ-বিশ্লেষণের দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছেন। এ্যারিস্টট্‌লের আলোচনা তথ্য-বিশ্লেষণের দিক থেকে যেমন পূর্ণাঙ্গ, ট্র্যাজেডির তাৎপর্য-বিচারের দিক থেকে ঠিক তেমনি অপূর্ণ। সব থেকে বড়ো কথা, ট্র্যাজেডির রূপগত পারিপাট্য, তার অমোঘতা, করুণা ও ভয়ের উদ্রেক ও ক্যাথারসিস, সব মিলে ট্যাজেডিতে জীবনের কোন্ তাৎপর্য যে ব্যক্ত হয়, ট্যাজেডি যে জীবনের ঠিক কোন্ সত্যটিকে উদ্‌ঘাটিত করে, তা এ্যারিস্টট্‌ল একবারও বলেননি। এইখানেই এ্যারিস্টট্‌লের ট্যাজেডিতত্ত্বের

অপূর্ণতা। এ-অপূর্ণতা রবীন্দ্রনাথেও পাবো। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। এ্যারিস্টট্‌লের মূল বিষয়টাই ট্র্যাজেডি। রবীন্দ্রনাথের তা নয়। প্রাসঙ্গিক উক্তিতে পূর্ণতা না থাকলে দোষ দেওয়া যায় না।

এইবারে আমরা পূর্বোক্ত অভিযোগের যৌক্তিকতার প্রসঙ্গে আসতে পারি। এ-কথা কি অবশ্য-গ্রহণীয় যে, পরিপূর্ণ ট্র্যাজিক জীবনদৃষ্টি না থাকলে, দুঃখবেদনাকে, বিফলতা ও হতাশাকে, মানবিক চেষ্টার চূড়ান্ত পরাভবকে একমাত্র সত্য ব'লে না মানলে ট্র্যাজেডি-রচনা সম্ভব নয়? সমস্ত ট্র্যাজেডি-রচয়িতাই কি ব্যর্থতাকে, মানব-পরাভবকে জীবনের সার সত্য ব'লে মনে করেন? সমস্ত ট্র্যাজেডি-রচয়িতাই কি এই রকম চূড়ান্ত অর্থে ট্র্যাজিক জীবনদৃষ্টির অধিকারী? বিশ্বসাহিত্যের বিখ্যাত ট্র্যাজেডিগুলি কি এই সাক্ষ্যই দেয়?

এ-রকম বললে সত্যের অপলাপ হবে। চূড়ান্ত রকমের — সামগ্রিক রকমের ট্র্যাজিক জীবনদৃষ্টি ট্র্যাজেডি-রচনার অপরিহার্য শর্ত নয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে। সে হ'লো সাহিত্যের ট্র্যাজেডির বহুবিধতার কথা। সব ট্র্যাজেডিতে ঘটনার গুরুত্ব একরকম নয়। দুঃখ-ভয়ের মাত্রাও যেমন ভিন্ন ভিন্ন, দুঃখ-ভয়ের চরিত্রও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন। এর অর্থই হ'লো এই যে, ট্র্যাজিক দৃষ্টি নানা রকমের হ'তে পারে। লেখকের জীবনদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ট্র্যাজেডিতে অল্পবিস্তর বিভিন্ন রকমের রসের সঞ্চার ঘ'টে থাকে এবং রসের বিভিন্নতা অনুসারে — অথবা বলতে পারি, লেখকের জীবনদৃষ্টির বিভিন্নতা অনুসারে ট্র্যাজেডিকে আমরা বিভিন্ন গোত্রে ভাগ ক'রেও নিতে পারি।

সব ট্র্যাজেডির সম্বন্ধে হুবহু এক নিয়ম খাটবে না। বিভিন্ন লেখকের ভিন্ন ভিন্ন জীবনদর্শনের কোনোটিকেই আমরা সরাসরি বাতিল ক'রে দিতে পারবো না। কোন্ জীবনদর্শন ঠিক, এ-বিচারের ভার সাহিত্যতত্ত্বের উপর নেই। দর্শনের তর্ককে সাহিত্যতত্ত্বের এলাকায় টেনে এনে লাভ নেই। ট্র্যাজিক জীবনদৃষ্টিই যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন সত্যদৃষ্টি, সাহিত্যতত্ত্বের এলাকায় দাঁড়িয়ে এ-কথা প্রমাণ বা অপ্রমাণ কিছুই করা যাবে না। তা যখন যাবে না, তখন সর্বাত্মক-ট্র্যাজিক জীবনদৃষ্টির সমর্থকদের তরফ থেকে এ্যারিস্টট্‌লের বিরুদ্ধে — কিংবা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে — যে-অভিযোগ আনা যেতে পারে, ট্র্যাজেডি-সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে তাকালে তার উপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে পারি না।

সাহিত্যতত্ত্বের এলাকার মধ্যে দাঁড়িয়ে ট্র্যাজেডির বহুবিধতার, ট্র্যাজেডির রস-বৈচিত্র্যের সত্যকেই আমাদের মেনে নিতে হবে। তার মানে এ নয় যে, সব

ট্র্যাজেডিরই গুরুত্ব সমান, সব ট্র্যাজেডিরই মূল্য এক। তার মানে শুধু এই যে, ট্র্যাজেডির মূল্যবিচারে আপ্তবাক্য আমাদের কাজে লাগবে না। এখানে বরং ট্র্যাজেডি-সাহিত্যের ইতিহাসের সাক্ষ্যই অনেক বেশি জোরালো।

দুঃখবেদনা অবশ্য সব জাতের ট্র্যাজেডিতেই অবধারিতভাবে উপস্থিত থাকে, কিন্তু প্রশ্নটা কেবল থাকা নিয়ে নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে তার পরিমাণ নিয়ে, এবং বিশেষ ক'রে তার চরিত্র নিয়ে। চরিত্রের প্রসঙ্গটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরিমাণের কথাটাকেও তুচ্ছ করা যাবে না।

কোনো কোনো ট্র্যাজেডিতে দেখতে পাই, দুঃখ আছে বটে, কিন্তু সে-দুঃখের অন্তও আছে, ট্র্যাজেডির প্রান্তে পৌঁছুলে একটা প্রশান্তিরও সাক্ষাৎ মেলে। অনেকে হয়তো একে ট্র্যাজেডি ব'লেই মানবেন না, ঠিক যে-কারণে অনেকে খ্রীষ্টান-ট্র্যাজেডিকে আদৌ ট্র্যাজেডি ব'লে মানেন না। তা না মানুন, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখবো, এ-রকম ট্র্যাজেডি প্রচুর রচিত হয়েছে, যেখানে দুঃখবেদনা অন্তহীন নয়, যেখানে দুঃখের মধ্যেই তার সান্ত্বনা মেলে, যেখানে বেদনার পথ ধ'রেই বেদনার উত্তরণ ঘটে। বলা বোধকরি বাহুল্যই হবে যে, রবীন্দ্র-দর্শনের সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে এই জাতীয় ট্র্যাজেডির কোনোখানে কোনো বিরোধের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

কোনো কোনো ট্র্যাজেডিতে কিন্তু, অন্য যা-কিছুই থাকনা কেন, বেদনা যা আছে, তা অন্তহীন, উপশমহীন, সান্ত্বনাহীন। ঘটনার কেন্দ্রেই শুধু দুঃখ নয়, ঘটনার চরমতম পরিণামও সেখানে দুঃখময়, এমন দুঃখ যার কোনো উত্তরণ নেই। মানুষ সেখানে ফাঁদে-পড়া জন্তুর মতো অসহায়। পরিত্রাণের কোনো পথ নেই, পরিত্রাণের কোনো আশা নেই। সেখানে ট্র্যাজিক সংকটও যেমন অনিবার্য, ট্র্যাজিক পরিণামও তেমনি অবধারিত এবং সে-পরিণাম কোনো সার্থকতার কিছুমাত্র ইঙ্গিত বহন ক'রে আনে না। সেখানে ট্র্যাজিক সংকট সম্পূর্ণ সমাধানহীন, যেমন সমাধানহীন 'শ্যামা'র বজ্রসেনের সংকট।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের পাত্রকে নানা রসে — সুখদুঃখ ভয়-বিস্ময় প্রেম-হিংসার নানা রস-বৈচিত্র্যে ভ'রে তুলবার কথা বলেছেন। উপলব্ধির সেই বিচিত্র জনতায় দুঃখের খুব বড়ো একটা স্থান আছে। সে-দুঃখ দুঃখই, সুখের ছদ্মবেশ নয়। আনন্দ হয়তো বলতে পারি, কিন্তু দুঃখ রূপেই তা আনন্দ। সুতরাং সহজেই বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে এমন-কিছু নেই যা এই জাতীয় ট্র্যাজেডিকে অস্বীকার করতে পারে। জীবনে যে সান্ত্বনাহীন উপশমহীন দুঃখও ঘটতে পারে, এ-সত্যকে

রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদ কখনোই অস্বীকার করেনি। রবীন্দ্রসাহিত্যেও এ-রকম দুঃখের সাক্ষাৎ আমরা একেবারে পাইনি তা নয়।

কোনো কোনো ট্র্যাজেডিতে রচয়িতার যে-জীবনদর্শনের পরিচয় পাই, তা এই দুই ক্ষেত্রের থেকেই পৃথক্। দ্বিতীয় গোত্রের যে-ট্র্যাজেডির কথা বলা হ'লো, সেখানে বিশেষ ক্ষেত্রের ট্র্যাজিক সংকট সমাধানহীন বটে, কিন্তু এমন কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তার মধ্যে নেই যে, গোটা মানবজীবনটাই একটা সমাধানহীন সংকট, আলোক-সম্ভাবনাহীন নিত্য অন্ধকারই মানবভাগ্য। তৃতীয় গোত্রের ট্র্যাজেডি-রচয়িতার সমগ্র জীবনদর্শনটাই অন্ধকার জীবনদর্শন। এই রকম সর্বত্র-পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের, সর্বত্র-পরিব্যাপ্ত দুঃখের জীবনদৃষ্টিকেই বলা হয়েছে 'Totally Tragic World-view'।[১]

এই তৃতীয় গোত্রের ট্র্যাজেডিতে কাহিনীর নায়ককে মানবসাধারণের প্রতিনিধি-রূপে গণ্য করা হয়, তার ব্যক্তিগত সংকটকে সর্বমানবের নিত্য-সংকট ব'লে দাবি করা হয়। কাহিনীর মধ্যে দিয়ে এই কথাই প্রতিপাদিত করার চেষ্টা হয় যে, মানুষের দুঃখ কোনো আপতিক-কারণ-সম্ভূত নয়, দুঃখ নৈমিত্তিক নয়, পারাপারহীন দুঃখই জীবনের নিত্য-সত্য।

এই গোত্রের ট্র্যাজেডির সংখ্যা অবশ্যই কম। এর অন্তর্নিহিত দুঃখবাদী-জীবন-দর্শনের তত্ত্ব হিসেবে যে-পরিমাণ প্রতিষ্ঠা, সাহিত্যক্ষেত্রে সেই তত্ত্বের নিদর্শন সে-রকম সুলভ নয়। তবে ট্র্যাজেডি থেকে যদি গুরুত্ব গাম্ভীর্য মহত্ত্ব ইত্যাদি ধারণাকে ছাঁটাই ক'রে দিতে প্রস্তুত থাকি, তাহ'লে আধুনিক কালের অনেক রচনাকেই এই গোত্রে ফেলতে পারি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে পাশ্চাত্য চিন্তার একাধিক ধারায় জীবন ও যন্ত্রণাকে, সত্তা ও উৎকণ্ঠাকে যেভাবে এক ক'রে ফেলা হয়েছে, তাতে উক্ত ধারাগুলি এই দুঃখবাদেরই অনভিজাত উত্তরপুরুষ ব'লে গণ্য হ'তে পারে। এক্‌সিস্টেন্‌সিয়ালিস্ট নাটকে উপন্যাসে অথবা আরো সাম্প্রতিকালের 'এ্যাব সার্ড' নাটকে আমরা সেকালের মহিমান্বিত ট্র্যাজেডির সাক্ষাৎ পাবো না বটে, কিন্তু প্রচুর জীবনযন্ত্রণার সাক্ষাৎ পাব, প্রচুর বিবমিষার সাক্ষাৎ পাবো, অকিঞ্চিৎকরতার বিশ্বরূপদর্শন ঘটবে।

ট্র্যাজিক জীবনদৃষ্টিই হোক, যন্ত্রণাবোধই হোক, বিবমিষাই হোক, উদ্‌ভটতার উপলব্ধিই হোক, তা যদি সর্বাত্মক চূড়ান্ত এবং একচ্ছত্র হয়, তাহ'লে তার সঙ্গে রবীন্দ্র-চিন্তার কোনোরকম রফা সম্ভব নয়। যিনি মনে করেন, জীবন সর্বতোভাবে দুঃখময়, সর্বতোভাবে যন্ত্রণাময়, যিনি মনে করেন বাঁচা অর্থ ই নিরন্তর অনবচ্ছিন্ন উৎকণ্ঠাভোগ, যিনি বিশ্বাস করেন, জীবন একটা অর্থহীন কুৎসিত উদ্‌ভট প্রলাপ, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বকে তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে পারবেন না।

সুখ বা দুঃখ, দুই-ই রবীন্দ্রনাথের কাছে খণ্ড-সত্য। কী সুখের, কী দুঃখের, কোনো একটির অদ্বৈতবাদকেই রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করতে পারেননি। সর্বাত্মক দুঃখবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের এই যে বিরোধ, এ-বিরোধ চূড়ান্ত। এই কারণেই অভিযোগ। এ-অভিযোগ কতোদূর যুক্তিযুক্ত সে-প্রশ্ন পূর্বেই তোলা হয়েছিলো। আবার আমরা সেই প্রশ্নের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম।

কোন্ জীবনদর্শন ঠিক, রাবীন্দ্রিক জীবনদর্শন, না আধুনিক দুঃখবাদী জীবনদর্শন? যতোক্ষণ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত না হচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনটা ভুল, সর্বাত্মক দুঃখবাদটাই সত্য, ততোক্ষণ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত অভিযোগকে যুক্তিযুক্ত ব'লে দাবি করার উপায় নেই। কিন্তু সে-প্রমাণের দায়িত্ব বা অধিকার কোনোটাই সাহিত্যতত্ত্বের হাতে নেই। যে-অধিকার দর্শনের, তা দর্শনের হাতেই থাক। যতোক্ষণ আমরা সাহিত্যতত্ত্বের এলাকার মধ্যে আছি, ততোক্ষণ মতবাদ-বিশেষের ভিত্তিস্থানীয় যে-সব মৌল বিশ্বাস, তা নিয়ে তর্ক তুলে লাভ নেই। রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডিতত্ত্ব যে সর্বাত্মক-ট্র্যাজিকদৃষ্টি-সম্ভূত ট্র্যাজেডিতত্ত্ব নয়, এ-কথা বিনা আপত্তিতে স্বীকার ক'রে নেবো। কিন্তু তাকে ত্রুটি ব'লে স্বীকার করবো না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-বিষয়ক আলোচনার যে একটি অসম্পূর্ণতার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তা প্রায় ত্রুটির পর্যায়ে গিয়েই পড়ে। রবীন্দ্রনাথ যে ট্র্যাজেডির গুরুত্ব ও তাৎপর্যের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেননি, ট্র্যাজেডি কেন মহৎ সাহিত্য ব'লে গণ্য সেই রহস্যের দিকে দৃষ্টি দেননি, অভিযোগের এই অংশটাকে আমাদের স্বীকার ক'রে নিতেই হবে।

ট্র্যাজেডির তাৎপর্য ও মূল্যের প্রসঙ্গটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তা বিস্তৃততর আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সে-প্রসঙ্গ যথাস্থানে আসবে। আপাতত তাকে মুলতুবি রেখে, ট্র্যাজেডি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক প্রশ্ন: ট্র্যাজেডি কেন আনন্দ দেয়, এই আলোচনাটাই আগে সেরে নেওয়া দরকার।

প্রশ্নটি সাহিত্যতত্ত্বে নতুন নয়। ট্র্যাজেডিতত্ত্বের আদি প্রবক্তা এ্যারিস্টট্‌ল নিজেই এ-প্রশ্নের উত্থাপন করেছিলেন। এ-বিষয়ে এ্যারিস্টট্‌লের বক্তব্য সকলেরই সুবিদিত। এ্যারিস্টট্‌ল ট্র্যাজেডির আনন্দকরতার তিনটি কারণের কথা বলেছেন। ট্র্যাজেডি আনন্দ দেয়, তার কারণ ট্র্যাজেডি জীবনের অনুকরণ এবং, এ্যারিস্টট্‌লের মতে, অনুকরণমাত্রেই আনন্দদায়ক। ট্র্যাজেডির আনন্দকরতার দ্বিতীয় কারণ ভাষা, সংগীত এবং দৃশ্যপটের সৌন্দর্য, তার ধ্বনিগৌরব, তার বর্ণাঢ্যতা।

এইবারে তৃতীয় কারণের কথা। বর্তমান প্রসঙ্গে এইটেই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ,

কেননা এইখানেই ট্র্যাজেডির অন্যতম বিশিষ্টতা। এ্যারিস্টট্‌লের মতে ট্র্যাজেডি করুণা ও ভীতির উদ্রেক করে এবং তাদের ক্যাথারসিস ঘটায়। এই ক্যাথারসিস যে-প্রশান্তি আনে তা গভীরভাবে আনন্দদায়ক। এ্যারিস্টট্‌ল-কথিত এই তৃতীয় কারণটি সাহিত্যতত্ত্বের ইতিহাসে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এখানে সে-বিতর্কে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। আমাদের মূল লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য।

"এই প্রশ্ন আমার মনকে উদ্‌বেজিত করেছিল যে, সাহিত্যের দুঃখকর কাহিনী কেন আনন্দ দেয়...।"[২] — রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির ব্যঞ্জনা বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নটিকে কেবল ট্র্যাজেডির বিশিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যেই আবদ্ধ রাখেননি। তাঁর প্রশ্ন সবরকম দুঃখের ঘটনা নিয়েই। সাধারণ বিষাদান্তক কাহিনীর সঙ্গে ট্র্যাজেডির যে কোনো গুণগত পার্থক্য আছে, রবীন্দ্রনাথের উক্তির মধ্যে সে-সম্পর্কে সচেতনতার কোনো পরিচয় নেই।

ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রীরা ট্র্যাজেডির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। ট্র্যাজেডি — বিশেষ ক'রে ট্র্যাজেডিই — কোন্ আনন্দ দেয়, কেন আনন্দ দেয়, এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর তাঁদের কাছে পাওয়া যাবে না। কিন্তু যদি আমরা কেবল দুঃখশোকের কাহিনীর সম্পর্কেই কৌতূহলী হই, যেমন রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন, তাহ'লে হয়তো ভারতীয় সাহিত্য-শাস্ত্রীদের, বিশেষ ক'রে রসবাদীদের আলোচনার মধ্যে কিছু মূল্যবান ইঙ্গিত পেতে পারি। কেননা আমাদের আদিকাব্য যে শোকেরই কাব্য সে-কথা সর্বজনবিদিত। সুতরাং শোকের কথাটা কাব্যতত্ত্বের আলোচনার একেবারে গোড়াতেই এসে পড়েছে।

আদিকবি যে শোককেই শ্লোকে, অর্থাৎ কাব্যে পরিণত করেছেন, সে-কথা 'ধ্বন্যালোকে' বেশ স্পষ্ট ক'রেই বলা হয়েছে।

> "কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।
> ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ॥" (১।৫)

বৃত্তিতে আনন্দবর্ধন কথাটাকে আরো পরিষ্কার ক'রে বলেছেন :

> "তথা চাদিকবের্বাল্মীকেঃ নিহতসহচরীবিরহকাতর ক্রৌঞ্চক্রন্দজনিতঃ শোক এব শ্লোকতয়া পরিণতঃ।"

বলা হয়েছে যে, বিরহকাতর ক্রৌঞ্চের ক্রন্দনজনিত শোক শ্লোকে পরিণত হ'লো। কিন্তু আসল কথাটা বলা হয়নি। শ্লোক জিনিসটা আনন্দকর, শোক যে ঠিক কেমন ক'রে আনন্দে পরিণত হ'লো, তার কোনো ইঙ্গিত এর মধ্যে নেই। তা আছে অভিনব-গুপ্তের আলোচনায়, তাঁর 'লোচন'-টীকায়, এই উক্তিরই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। উপরে 'ধ্বন্যালোকে'র কারিকায় এবং বৃত্তিতে যে শোকের কথা বলা হয়েছে, যে-শোক

শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হ'লো, সে কার শোক? আনন্দবর্ধনের উক্তি থেকে মনে হয়, সে-শোক কবি বাল্মীকির নিজেরই শোক। 'রঘুবংশে' কালিদাসও অনেকটা এই রকম কথাই বলেছেন, বাল্মীকিরই শোক 'শ্লোকত্বমাপদ্যত'।

অভিনবগুপ্ত কিন্তু তা মনে করেন না। "ন তু মুনেঃ শোক ইতি মন্তব্যম্।" 'লোচন'-টীকায় তিনি বেশ স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যা শ্লোকত্বে পরিণত হ'লো তা শোকই নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের জিনিস। হৃদয়ের সম্মিলন এবং তন্ময়ত্বের ফলে যখন রসের সঞ্চার ঘটে, তখন তা শোক নয়। সে হ'লো করুণরস। তাকে লৌকিক শোকের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে ভুল হবে। তা 'স্বচিত্তদ্রুতিসমাস্বাদ্যসারাং প্রতিপন্নো।' তা আস্বাদনধর্মী। নিজের চিত্তের যে বিগলিত অবস্থায় এই আস্বাদন ঘটে, সেই বিগলিত অবস্থাই এর তন্মাত্র। সেই বিগলিত অবস্থা এবং তার আস্বাদন অভিন্ন। একে বলতে পারি, স্বচিত্তদ্রুতি-আস্বাদনের আনন্দ। শ্লোক সেই আনন্দেরই প্রকাশ, দুঃখের নয়।

এ-ইঙ্গিতকে আমরা গ্রহণ করি আর না-করি, স্বীকার করতেই হবে যে, ইঙ্গিতটি কেবল দুঃসাহসী নয়, যথেষ্ট পরিচ্ছন্নও বটে। দুঃখের ঘটনা যতোক্ষণ পর্যন্ত বিশিষ্ট একটি দুঃখেরই ঘটনা, ততোক্ষণ তা আমাদের আনন্দ দিতে পারে না। নিছক দুঃখের ঘটনা একটা লৌকিক ব্যাপার, বাস্তবজগতের অধিবাসী, বিশিষ্ট দেশকালে আবদ্ধ — সাহিত্যে তার প্রবেশের অধিকার নেই। দুঃখের ঘটনা যখন দেশকালের বন্ধনমুক্ত হয়, বাস্তব জগতের সঙ্গে যখন তার কার্যকারণগত সংযোগ থাকে না, যখন সে অ-বাস্তবীকৃত, অলৌকিকত্বপ্রাপ্ত — যখন সে আর মোটেই শোক নয় — তখন এবং কেবল তখনই সে সাহিত্যে প্রবেশ করতে পারে। বস্তুত সাহিত্যে যা স্থান পায় তা মোটেই দুঃখশোকের ঘটনা নয়, তা অলৌকিক বিভাব অনুভাব ইত্যাদি। সেই বিভাবানুভাবাদির সহযোগে যা অভিব্যক্ত হয়, তা লৌকিক দুঃখশোক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। তা হ'লো করুণ রস। রসমাত্রেই আনন্দ। করুণ রসও তার ব্যতিক্রম নয়।

ভারতীয় রসবাদীদের বক্তব্য রসের অলৌকিকত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর বক্তব্য অনুভূতিমাত্রের আনন্দকরতার উপর প্রতিষ্ঠিত। রসবাদীরা যেমন এই প্রসঙ্গে সাধারণীকরণ-প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে অনেকটা অনুরূপ প্রক্রিয়ার কথাই বলেছেন। কিন্তু তা এ-প্রসঙ্গে নয়। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যা বক্তব্য তা সাধারণীকরণতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে লৌকিক অনুভূতিই আনন্দদায়ক, সমস্ত রকমের অনুভূতিই। বলা বাহুল্য, দুঃখের অনুভূতিও। অনেক সময় অনুভূতি বা ভাবমাত্রকেই রবীন্দ্রনাথ

রস বলেছেন। "...রসমাত্রেই অর্থাৎ সকল রকম হৃদয়বোধেই, আমরা বিশেষভাবে আপনাকেই জানি, সেই জানাতেই বিশেষ আনন্দ।"[৩]

'সাহিত্যের পথে'র ভূমিকাতেও রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই কথাই বলেছেন। "দুঃখের উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক; কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়।" বাস্তবক্ষেত্রে, অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে এই অনিষ্টের বাধাকে আমাদের না মেনে উপায় নেই। সেখানে আমরা বাঁচার নিয়মের অধীন, সেখানে সমস্তরকমের অনিষ্টকর আনন্দকে আমরা এড়িয়ে চলতে বাধ্য। কিন্তু তার ফলে — দুঃখের তীব্র উপলব্ধির অভাবে আমাদের স্বভাব বঞ্চিত হয়। বিশেষ একটা কারণে যাকে আমরা ত্যাগ করেছি, গভীরতর অন্য এক কারণে তারই জন্য আমরা তৃষিত হ'য়ে থাকি। যদি এমন কোনো ক্ষেত্র থাকে, যেখানে দুঃখের অনিষ্টটুকুকে বাদ দিয়ে দুঃখের তীব্রতাকে আমরা ইচ্ছা-সুখে ভোগ করতে পারি, তাহ'লে সেইখানে বিনা বাধায় আমাদের স্বভাব পূর্ণতা পেতে পারে। সাহিত্যের দুঃখকর কাহিনী আমাদের জন্য ঠিক সেইরকম একটি ক্ষেত্র রচনা ক'রে দেয়। সে-জগৎ কল্পনার জগৎ। সেখানে বাস্তব বা ব্যবহারিক ইষ্টানিষ্টের প্রবেশাধিকার নেই। সাহিত্যে আমরা দুঃখের আনন্দকে বিনা বাধায় ভোগ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের মতে এই আনন্দই ট্র্যাজেডির আনন্দ। ট্র্যাজেডিতে দুঃখ অতি তীব্র। সেই তীব্র দুঃখে আমাদের সত্তার শিখা প্রবলভাবে জ্ব'লে ওঠে। এই জ্ব'লে ওঠাতেই আনন্দ। যে-দুঃখ যতো বেশি তীব্র, সেই দুঃখে আমরা ততো বেশি প্রজ্জ্বলন্ত, সেই দুঃখ ততো বেশি আনন্দকর। সেইখানেই ট্র্যাজেডির মূল্য।

রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাই ব্যবহার করা যাক। "দুঃখের অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনা আলোড়িত হয়ে ওঠে। দুঃখের কটু স্বাদে দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকলেও তা উপাদেয়। দুঃখের অনুভূতি সহজ আরামবোধের থেকে প্রবলতর। ট্র্যাজেডির মূল্য এই নিয়ে।...বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্ম-পরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।"[৪] রবীন্দ্রনাথ যে কোথাও ট্র্যাজেডি সম্পর্কে ভিন্ন রকমের মত প্রকাশ করেননি তা নয়। কিন্তু সে-মতকে তিনি অনুসরণ করেননি। তা ব্যতিক্রম ব'লে গণ্য হবার যোগ্য। তবু মতটির উল্লেখ করা দরকার মনে করি।

মানুষের মধ্যে যে একটা আদিম হিংসাবৃত্তি লুকিয়ে আছে, এটা হয়তো অনেকেই

স্বীকার করবেন। অপরের দুঃখবেদনার দৃশ্যে যে মানুষের সেই গোপন হিংসাবৃত্তির চরিতার্থতালাভ ঘটতে পারে, এবং তার ফলে মানুষ যে একটা তীব্র আনন্দের উত্তেজনাও পেতে পারে, ট্র্যাজেডির প্রসঙ্গে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের এই দিকটাতে দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে। ট্র্যাজেডির আনন্দের মধ্যে মানুষের সেই গোপন হিংসাবৃত্তিজনিত আদিম উল্লাসেরও যে একটা ভূমিকা থাকতে পারে, 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের "সাহিত্যতত্ত্ব" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই রকম একটা ইঙ্গিতও দিয়াছেন। কিন্তু এই মনস্তত্ত্বগত ইঙ্গিতকে তিনি তত্ত্বের পূর্ণতা দেননি। তাঁর বিশিষ্ট ট্র্যাজেডিতত্ত্ব এই ইঙ্গিতের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী নানা উক্তির দ্বারা এই অরাবীন্দ্রিক ইঙ্গিতকে তিনি নিজেই খণ্ডিত ক'রে দিয়েছেন। সুতরাং এ-মতকে আমরা অনায়াসে বাতিল ক'রে দিতে পারি। সাহিত্যে দুঃখের আনন্দকরতার যে-রহস্য, সেই রহস্যের রাবীন্দ্রিক সমাধান মানুষের আদিমতার মধ্যে নয়, মানুষের জীবনরস-পিপাসার মধ্যে। সে-সমাধানের ভিত্তি রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতত্ত্বে।

সাহিত্যে দুঃখকর কাহিনীর মধ্যে, বিশেষ ক'রে ট্র্যাজেডিতে — ট্র্যাজেডির সম্ভোগের মধ্যে যে একটা বিস্ময় লুকানো আছে, এটা অবশ্য নতুন আবিষ্কার নয়। অষ্টাদশ শতকে হিউম এই বিস্ময়ের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছিলেন : "It seems an unaccountable pleasure which the spectators of a well-written tragedy receive from sorrow, terror, anxiety, and other passions that are in themselves disagreeable and uneasy." রবীন্দ্রনাথ যে-প্রশ্ন তুলেছেন, হিউমও অবিকল সেই প্রশ্নই তুলেছিলেন : "What is it then which in this case raises a pleasure from the bossom of uneasiness, so to speak, and a pleasure which still retains all the features and outward symptoms of distress and sorrow ?"

এ-প্রশ্নে হিউম নিজে যে-উত্তর দিয়েছেন, তা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিউমের উত্তরের অংশবিশেষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উত্তরের মিল হয়তো অনেকেরই নজরে প'ড়ে থাকবে। মিলটা উপরে যতোখানি, তলার দিকে — গভীরে হয়তো ততোখানি নয়। তবু তুলনাটা অবশ্য-প্রয়োজনীয়। আমাদের বিশেষ প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে হিউমের উত্তরকে আমরা তিনটি পৃথক্ সূত্রে প্রকাশ করতে পারি। প্রথম সূত্র অনুকরণবাদ-ভিত্তিক। দ্বিতীয় সূত্র ফর্ম-ভিত্তিক। এবং তৃতীয় সূত্র অনুভব-ভিত্তিক।

হিউমের প্রথম সূত্রটি ক্লাসিক্যাল। হিউম মনে করেন, ট্র্যাজেডি মূলত জীবনের

অনুকরণ, এবং অনুকরণমাত্রেই আনন্দকর। সেই কারণে, দুঃখের কাহিনী হ'য়েও ট্র্যাজেডি আনন্দকর।

আগেই বলেছি, হিউমের দ্বিতীয় সূত্রটি মূলত ফর্ম বা রূপভিত্তিক। ট্র্যাজেডি একটা শিল্প, এবং শিল্পমাত্রেরই একটা নিজস্ব প্রোজ্জ্বল ওজস্বিনী দীপ্তিময়ী বাণীশক্তি আছে। সেই প্রদীপ্ত শিল্প-ভাষার গুণে 'from that very eloquence with which the melancholy scene is represented' — প্রকাশের স্পষ্টতা ও প্রবলতার গুণে ট্র্যাজেডি আনন্দকর।

বর্তমান প্রসঙ্গে তৃতীয় সূত্রটিই আমাদের কাছে সব থেকে উল্লেখযোগ্য। হিউম মনে করেন, অনুভূতিমাত্রেই আনন্দকর, তা সে যে-জাতেরই অনুভূতি হোক না কেন। রবীন্দ্রনাথের মতো হিউমও মনে করেন, অসাড়তাই নিরানন্দ। অষ্টাদশ শতকের ফরাসী সমালোচক লা'বে দ্যুবো এ-ব্যাপারে হিউমের সাক্ষাৎ পূর্বসূরী। তিনিও মনে করতেন, অসাড়তাই নিরানন্দ, গতিই জীবন। তীব্র অনুভূতি তার তীব্রতার কারণেই বেগবান, এবং এই বেগের কারণেই শিল্প আনন্দদায়ক। দ্যুবোর অনুভূতিতত্ত্বকে সমর্থন ক'রে হিউম বলেছেন, "No matter what the passion is : let it be disagreeable, afflicting, melancholy, disordered, it is still better than that insipid langour ... ।"[৫] রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বের যে-কোনো পাঠকের কাছে হিউমের এ-সব কথা অত্যন্ত পরিচিত ব'লে মনে হবে।

হিউম যা দিয়ে তিনটি সূত্রকে একসঙ্গে বেঁধে দিয়েছেন, তা হ'লো ট্র্যাজেডি-রচয়িতার কল্পনাশক্তি। এখানেও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে হিউমের বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য মিল দেখতে পাবো। হিউমের গোটা বক্তব্যটা সংক্ষেপে এই রকম : একদিকে অনুভূতির তীব্রতা, এবং অন্যদিকে ট্র্যাজেডি-রচয়িতার অনুকরণ-শক্তি, বিষয়কে জীবন্ত ক'রে তুলবার ক্ষমতা, তাঁর বিচারবুদ্ধি, তাঁর প্রকাশের নৈপুণ্য, এবং সর্বোপরি তাঁর কল্পনাশক্তি, সবের সম্মিলিত ক্রিয়ায় ট্র্যাজেডির দুঃখকর কাহিনী আমাদের কাছে পরম আনন্দকর হ'য়ে ওঠে।

হিউম সব থেকে জোর দিয়েছেন প্রকাশের নৈপুণ্যের উপর, কল্পনাশক্তি তার নিত্যসহগামী। রবীন্দ্রনাথ সব থেকে জোর দিয়েছেন অনুভূতির আনন্দকরতার উপরে। প্রায় চূড়ান্ত রকমের জোর। কল্পনার ক্রিয়া অনুভব-ক্রিয়ার মধ্যেই অনুস্যূত! ক্ষেত্রবিশেষে ট্র্যাজেডির আনন্দকরতার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ-নৈপুণ্যের বা রূপ-গৌরবের কথাও বলেছেন। যেমন, 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের "সাহিত্যরূপ" প্রবন্ধে। কিন্তু সে অনেকটা আনুষঙ্গিকভাবে বলার মতো।

ট্র্যাজেডি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের মূল ভিত্তি প্রকাশের উজ্জ্বলতা নয়, ট্র্যাজেডির বিশুদ্ধ গঠন-গৌরব বা রূপ-গৌরবও নয়। তাঁর বক্তব্যের মূল ভিত্তি অনুভূতিমাত্রের আনন্দকরতা।

হিউম কল্পনার উপর জোর দিয়েছেন এ-কথা সত্যি। এ-ও সত্যি যে, হিউমের দর্শনে কল্পনার স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাহ'লেও হিউম কোনো পূর্ণাঙ্গ কল্পনাতত্ত্ব গ'ড়ে তোলেননি। কল্পনা যে-স্থানটি অধিকার করতে পারতো, হিউম সাহিত্যতত্ত্বের সেই গভীরে কল্পনাকে নিয়ে যাননি। হিউমের চিন্তায় সাহিত্যতত্ত্বের স্থান গৌণ, তাঁর আসল লক্ষ্য দর্শন। সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-বিষয়ক আলোচনা অনেক পূর্ণাঙ্গ। তবে বিশেষ ক'রে ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কল্পনার উপর কোনো বাড়তি দায়িত্ব চাপাননি।

হিউম যেমন অনুভূতিমাত্রের আনন্দকরতার কথা বলেছেন, কীট্সও অনেকটা সেই ধরনের কথা বলেছেন। কীট্সের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু কী হিউম, কী কীট্স, কেউই অনুভূতির আনন্দকরতার কোনো সুস্পষ্ট হেতুনির্দেশ করেননি, কেউই এই আনন্দকরতাকে ভিত্তি ক'রে কোনো পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যতত্ত্ব গ'ড়ে তোলেননি। এই আনন্দকরতার তত্ত্বগত তাৎপর্য পর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা ক'রে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে যে পূর্ণায়ত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার মধ্যে একটি গুণগত ভিন্নতা এসে গিয়েছে। মৌলিকতার দিক থেকে যদি-বা কিছু প্রশ্ন থাকে, পূর্ণাঙ্গতার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতত্ত্বের মূল্য সম্পূর্ণ প্রশ্নাতীত।

রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতত্ত্ব পূর্ণাঙ্গ হ'লেও, তাঁর ট্র্যাজেডি-ব্যাখ্যা যে অসম্পূর্ণ তা স্বীকার করতেই হবে। তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই, কেননা রবীন্দ্রনাথের আলোচনার আসল লক্ষ্য ট্র্যাজেডি নয়, আসল লক্ষ্য তাঁর অনুভূতিতত্ত্ব। এই তত্ত্বের সমর্থনের জন্যই তিনি আনুষঙ্গিকভাবে উদাহরণ হিসেবে ট্র্যাজেডির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এ-ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতার কথা স্বীকার করলেও, তাকে ত্রুটি ব'লে অভিযোগ করা যাবে না।

তবু অসম্পূর্ণতাটা যে দুঃখজনক তাতে সন্দেহ নেই। এ-রকম মনে হওয়া আশ্চর্য নয় যে, রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-ব্যাখ্যায় ট্র্যাজেডির আসল বিশিষ্টতাটাই বাদ প'ড়ে গিয়েছে। আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা যে-কোনো দুঃখকর কাহিনীর ব্যাখ্যা। সে-ব্যাখ্যায় সাধারণ বিষাদান্ত কাহিনীর সঙ্গে ট্র্যাজেডির পার্থক্য কেবল পরিমাণগত — কেবল দুঃখের বেশি-কমের পার্থক্য। ট্র্যাজেডির তাৎপর্যের প্রসঙ্গটিকে

আমরা এতোক্ষণ স্থগিত রেখেছিলাম, এইখানে আবার আমরা সেই প্রশ্নের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি।

ট্র্যাজেডি কি কেবলই একটি দুঃখকর কাহিনী, আর কিছুই নয়? তার মধ্যে কি গভীরতর কোনো জীবনসত্যের ইঙ্গিত নেই? এ-প্রশ্নে এ্যারিস্টট্ল যেমন নীরব, রবীন্দ্রনাথও তাই। আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসুদের এইখানেই সব থেকে বড়ো আপত্তি। নিতান্ত সাম্প্রতিকদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, ট্র্যাজেডি জিনিসটাই তাঁদের অনেকের কাছে একটা জাঁকালো কৃত্রিমতা ব'লে, বৃথা ঘটনা-ডম্বর ব'লে মনে হবে। কিন্তু ট্র্যাজেডিকে যাঁরা অস্বীকার করেন না, তাঁদের প্রায় সকলেই বলবেন, মূল্যবোধ ও ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদ্য, জীবনমূল্যেই ট্র্যাজেডির মূল্য, সেইখানেই ট্র্যাজেডির মহত্ত্ব।

যিনি মনে করেন, আজকের দিনে মানবমহিমা যখন সম্পূর্ণ ভূলুণ্ঠিত, আধুনিক বিজ্ঞান আধুনিক সমাজ আধুনিক জীবনযাত্রা যখন মানুষের চরম অকিঞ্চিৎকরতাকে তর্কাতীতরূপে প্রত্যক্ষ ক'রে তুলেছে, তখন আজকের মানুষের পক্ষে ট্র্যাজেডি রচনা বা ট্র্যাজেডি উপভোগ কোনোটাই সম্ভব নয় — যিনি এইরকম মনে করেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের তর্ক নেই।[৬] আমাদের প্রশ্ন কেবল আজকের দিন নিয়ে নয়। আমাদের প্রশ্ন বিশ্বসাহিত্যের সর্বজনস্বীকৃত মহৎ ট্র্যাজেডিগুলিকে নিয়ে। আমাদের প্রশ্ন, যিনি ট্র্যাজেডিকে স্বীকার করেন, তাঁর মতামত নিয়ে।

মহৎ ট্র্যাজেডিগুলি কেবল দুঃখের কাহিনী নয়, কেবল পরাজয়েরই কাহিনী নয়, তা মানুষের বীরত্বের কাহিনী, মানুষের দুঃসাহসেরও কাহিনী। ট্র্যাজেডি কেবল মানুষের লাঞ্ছনার কাহিনীই নয়, লাঞ্ছনাকে অতিক্রম করার মহৎ মর্যাদারও কাহিনী, প্রতিকূল ঘটনাচক্রে যে-মানুষ বিধ্বস্ত, তারই অপরাজিত মহিমার কাহিনী। ট্র্যাজেডির গম্ভীর পরিণাম ধ্বংস ও মৃত্যুর মাঝখানে নিয়ে গিয়ে নীরব অঙ্গুলিনির্দেশে মানুষকে জানিয়ে দেয়, সবার উপরে মানবমহিমাই সত্য, তাহার উপরে নাই। তখন আপন মহৎ অহংকারের উপলব্ধিতে মানুষ যে-আনন্দ-গৌরব লাভ করে, সাধারণ করুণরসাত্মক কাহিনীর আনন্দকে তার সঙ্গে তুলনা করা যায় না। ঘটনার নিম্নতর ভূমিতে যে-মানুষ পরাজিত হ'লো, ভাবের উচ্চতর ভূমিতে সে কেমন ক'রে জয়ের গৌরব অর্জন করে, কাব্যলক্ষ্মী কীভাবে সেই পরাভূত নায়কের গলায় নিজের বরমাল্যটি পরিয়ে দেয়, তা না-বুঝলে ট্র্যাজেডির মহত্ত্ব বুঝতে পারবো না, তার আনন্দের রহস্যও বুঝবো না।

সমস্ত ট্র্যাজেডিই যে এইভাবে মানবমহিমাকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে এমন হয়তো

বলা যায় না। ট্র্যাজেডি নানারকমেরই হ'তে পারে এবং হ'য়ে থাকে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির অধিকাংশের ক্ষেত্রেই উপরের কথাগুলি অল্পবিস্তর সত্য। মানবমহিমা প্রতিষ্ঠিত করুক আর না করুক, সমস্ত ট্র্যাজেডিই জীবনের কোনো-না-কোনো একটা গভীর তাৎপর্যকে ব্যক্ত করে, সেই সত্যদর্শনের আনন্দ ঘটায়, যে-সত্য সুগভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত। এই সত্যদর্শন ছাড়াও, মহৎ ট্র্যাজেডিগুলিতে আর-একটা গুরুতর সত্য-দর্শনও ঘটে। কোনো কোনো ট্র্যাজেডিতে ট্র্যাজেডির নায়কের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আপন মানবত্বের চূড়ান্ত ঊর্ধ্বসীমা-সন্ধানের এ্যাডভেঞ্চারে রত হয়। সে-কাহিনী সুখের কি দুঃখের সে-প্রশ্নই ওঠে না। চরমতম আত্মসত্যের আবিষ্কারে মানুষের এই যে স্পর্ধিত অভিযান — শুধু স্পর্ধিত নয়, স্পর্ধিত এবং পবিত্র অভিযান, এর সম্বন্ধে কি রবীন্দ্রনাথ একেবারেই সচেতন ছিলেন না? তাঁর ট্র্যাজেডি-সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে কিন্তু সে-সচেতনতার কোনো প্রমাণ নেই।

ট্র্যাজেডি-সংক্রান্ত আলোচনায় না থাকলেও, অন্যত্র আছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না হ'তে পারে, কিন্তু সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নিশ্চয়ই। 'সাহিত্য' গ্রন্থের "সাহিত্যসৃষ্টি" প্রবন্ধে 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত উক্তি এখানে প্রত্যেক পাঠকেরই মনে পড়বে। যে উদ্দীপিত আবেগের প্রবলতায় 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র রাবণ চরিত্রটি পরিকল্পিত হয়েছে, তার পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন (র।:৩।৭৯২), "তিনি [মধুসূদন] স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন।" এ-আনন্দ একা মধুসূদনের নয়, এ-আনন্দ পাঠকেরও। জানি না, হয়তো এ উন্মত্ত আনন্দ রাবণেরও।

এ-আনন্দ ভয়ংকর সর্বনাশকে অগ্রাহ্য করে। এ-আনন্দ সর্বনাশের শেষ সীমাকে অবহেলাভরে অতিক্রম করে। এ-আনন্দ মানুষকে তার মনুষ্যত্বের সীমান্তে নিয়ে পৌঁছে দেয়। এই আনন্দের স্বরূপ কী, তা মধুসূদন-অঙ্কিত রাবণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তির মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে: "এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারী রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্রপৌত্র-আত্মীয়স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্‌কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটলশক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই

মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।"

এর পর কেমন ক'রে বলি, রবীন্দ্রনাথ ট্র্যাজেডির তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না? এইটুকুই শুধু মন্তব্য করতে পারি যে, এই সচেতনতা তাঁর ট্র্যাজেডি-ব্যাখ্যাকে স্পর্শ করেনি। প্রশ্ন এই, রবীন্দ্রনাথ কি রাবণের এই সত্যকে সর্বজনীন মানবসত্য ব'লেই মনে করেন? তা যদি করেন, তাহ'লে এই স্পর্ধিত মানবসত্য কি রবীন্দ্রনাথের সামঞ্জস্যভিত্তিক প্রসন্ন জগৎ-তত্ত্বের নিটোল সৌষম্যকে বিঘ্নিত করে না?

যতোদূর মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের কাছ থেকে এ-প্রশ্নের কোনো নিশ্চিত উত্তর পাওয়া যাবে না।

১. প্রসঙ্গত এ্যাল্‌বিন লেস্‌কির *Greek Tragedy* দ্রষ্টব্য।

২. "ভূমিকা", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।২৯১

৩. "সাহিত্যতত্ত্ব", 'সাহিত্যের পথে', র।১৭।৩৫৮

৪. তদেব

৫. উদ্ধৃতিগুলি হিউমের "Of Tragedy" থেকে।

৬. দ্র. Krutch, J. W., "The Tragic Fallacy", *The Modern Temper*

সৃষ্টি ও অনুকরণ

সৃষ্টি আর নির্মাণ এই কথা দুটোকে আধুনিক কালে একটু পৃথক্ অর্থেই ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে। নির্মাণও তৈরি করা, সৃষ্টিও তৈরি করা। কিন্তু আধুনিক প্রয়োগে দুটো দু-জাতের তৈরি, দুয়ের ক্ষেত্র পৃথক্। আর্টের ক্ষেত্রের তৈরি করাকে বলি সৃষ্টি, আর্টের বাইরে অন্য যে-কোনোরকম তৈরি-করাকে বলি নির্মাণ। যে-ক্রিয়ায় তাজমহল তৈরি হ'লো, তাকে বলি সৃষ্টি, আর যে-ক্রিয়ায় ব্যারাকবাড়ি তৈরী হয়, তাকে বলি নির্মাণ। প্রশ্ন হ'লো এই যে, নির্মাণ আর সৃষ্টির মধ্যে তফাৎটা কোন্ জায়গায়?

প্রাচীনকালে অবশ্য আর্টের ক্ষেত্রের তৈরি করাকেও নির্মাণই বলা হ'তো। এ হ'লো নির্মাণ কথাটার বিস্তৃত অর্থ। এই অর্থে ধরলে, ব্যারাকবাড়ি তৈরিও নির্মাণ, তাজ-মহল তৈরিও নির্মাণ। এ্যারিস্টটল এই অর্থেই কবি শিল্পী এঁদের নির্মাতা বলেছেন। কিন্তু যে-অর্থেই ধরি না কেন, আর্টের ক্ষেত্রের নির্মাণের সঙ্গে অপর যে-কোনো ক্ষেত্রের নির্মাণের নিশ্চয়ই একটা তফাৎ আছে। সেই তফাৎটা কোথায়? সৃষ্টিকেও যদি নির্মাণ বলতে চাই, হয়তো বলতেও পারি, কিন্তু নির্মাণমাত্রকেই তো আর সৃষ্টি বলতে পারি না। এইটেই প্রশ্ন। যে-নির্মাণ-ক্রিয়াকে সৃষ্টি বলি, তার বিশেষত্বটা কোথায়?

আর্টের ক্ষেত্রে সৃষ্টি কথাটার ব্যবহার অবশ্য খুব প্রাচীন নয়। নির্মাণ কথাটাকে আর্টের বাইরের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা, এটাও আধুনিক কালের সংস্কার। কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রের নির্মাণ আর অপর ক্ষেত্রের নির্মাণ, এই দুই নির্মাণ-ক্রিয়ার মধ্যে যে বড়োরকমের একটা পার্থক্য আছে, এ-সম্বন্ধে প্রাচীনেরাও সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। আর্ট যে-ধরনের নির্মাণ, প্লেটো বা এ্যারিস্টট্লের মতে, তার বিশেষত্ব হ'লো এই যে, তা হ'লো অনুকরণ। যে-নির্মাণ অনুকরণ নয়, তা আর্ট নয়।

এ্যারিস্টট্লের মতে অনুকরণমাত্রেই আনন্দদায়ক। আর্ট নিশ্চয়ই খুব উচ্চাঙ্গের অনুকরণ, তাই তার আনন্দও খুব উচ্চাঙ্গের। কিন্তু আনন্দ যতোই উচ্চাঙ্গের হোক না কেন, শিল্পক্রিয়াকে কখনোই সম্পূর্ণ স্বাধীন বলা যায় না। নিজের বাইরে তার একটা আদর্শ আছে, সে সব সময়ই সেই আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই আদর্শ হ'লো প্রকৃতি বা জীবন। এ্যারিস্টট্লের মতে আর্টের কাজ হ'লো জীবনের প্রতিরূপ

রচনা করা। ক্রিয়াটি যতোই গৌরবজনক হোক, তাকে নির্মাণ বলতে কোথাও কোনো বাধা আছে ব'লে এ্যারিস্টট্‌ল অনুভব করেননি।

শিল্পক্রিয়াকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ক্রিয়া ব'লে অনুভব করলে, তাকে আর কিছুতেই অনুকরণ ব'লে গ্রহণ করা যায় না। তখন তার জন্যে অন্য-কোনো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের একটা নামের প্রয়োজন হয়। এমন কোনো একটা নাম, যার মধ্যে শিল্প-ক্রিয়ার স্বরূপটা কী তার একটা ইঙ্গিত থাকে। শিল্প যে স্বাধীন ক্রিয়া, সে যে নিজের বাইরে অপর কোনো আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, এই কথাটি যে-নামের মধ্যে স্পষ্টভাবে দ্যোতিত হবে, এইরকম একটি নামের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন থেকেই সাহিত্যতত্ত্বে সৃষ্টি কথাটির আমদানী। আর্ট জিনিসটা সৃষ্টি কি অনুকরণ, এই প্রশ্নের উত্তর প্রধানত একটি জায়গায় এসে ঠেকে। কথাটা সরল। প্রাকৃত জগতেই হোক আর হৃদয়ের জগতেই হোক, আর্টের বাইরে আর্টের কোনো আদর্শ আছে কি না — আর্ট স্বাধীন কি না, কতোখানি স্বাধীন।

সকলেই জানেন, ভারতীয় প্রয়োগে সৃষ্টি কথাটার অর্থ হ'লো অভূতপূর্ব বস্তুর উৎপাদন, স্বাধীন নির্মাণ। যেমন বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বসৃষ্টি। সৃষ্টির এইটেই বিশুদ্ধতম দৃষ্টান্ত। এবং অনেকের মতে, এইটেই সৃষ্টির একমাত্র দৃষ্টান্ত। কেননা, মানুষের কোনো নির্মাণই এমন পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন নয়, এমন সর্বতোভাবে অভূতপূর্ব নয়। মানুষের কোনো সৃষ্টিই ষোলো কলায় সৃষ্টি নয়।

ইংরেজী ক্রিয়েশন কথাটার মূলের (creare) সঙ্গে বোধকরি সন্তান-উৎপাদনের একটা সম্পর্ক আছে। তবে সেখানেও জগৎ-সৃষ্টিই সৃষ্টি-ব্যাপারের প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। সৃষ্টিকর্তাই জগৎপিতা এবং জগৎপিতাই সৃষ্টিকর্তা।

শিল্পশাস্ত্রীরা যখন শিল্পকে নির্মাণ না ব'লে অথবা অনুকরণ না ব'লে, সৃষ্টি বলেন, তখন বিশ্ব-সৃষ্টির সঙ্গে শিল্প-সৃষ্টির সাদৃশ্যের কথাটা আপনা থেকেই এসে পড়ে। এই সাদৃশ্যের কারণেই তাঁরা সৃষ্টি কথাটিকে বেছে নিয়েছেন। এই সাদৃশ্য কোথায়? দর্শনে ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি-ক্রিয়ার কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণের কথা প্রায়ই বলা হ'য়ে থাকে। এই লক্ষণগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেই সাদৃশ্য সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।—

প্রথমত, বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি অচেতন ক্রিয়াও নয়, উন্মত্ত ক্রিয়াও নয়, তা চৈতন্যের প্রকাশ।

দ্বিতীয়ত, এই সৃষ্টির পেছনে কোনো প্রবৃত্তির তাড়না নেই, এর সামনে কোনো প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যের টান নেই। এই সৃষ্টি নিরাসক্ত এবং মুক্ত।

তৃতীয়ত, সৃষ্টি আনন্দময় — স্রষ্টার আনন্দপ্রাচুর্যের প্রকাশ।

চতুর্থত, সৃষ্টি হ'লো অ-পূর্ব বস্তুর উৎপাদন। যা উৎপাদিত হ'লো তা সম্পূর্ণ অভিনব, তা কোনো-কিছুর পুনরাবৃত্তি নয়।

আরো লক্ষণের উল্লেখ করা যেতে পারে, কিন্তু এখানে তার প্রয়োজন নেই। এই চারিটি লক্ষণই প্রধান, এবং সৃষ্টিবাদী শিল্পশাস্ত্রীরা এই চারিটি লক্ষণের উপস্থিতির কারণেই শিল্পক্রিয়াকে সৃষ্টি ব'লে দাবি ক'রে থাকেন।

বর্তমান প্রসঙ্গে এই লক্ষণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে দুটি লক্ষণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এক, মুক্তি বা অনন্যপরতন্ত্রতা। দুই, অভিনবত্ব বা অ-পূর্বতা। কেননা এইখানেই অনুকরণবাদীদের সঙ্গে সৃষ্টিবাদীদের আসল বিরোধ। অনুকরণবাদীরা মনে করেন, সাহিত্য বা শিল্প সম্পূর্ণ অভিনব নয়, তা জীবনের অনুকৃতি। এবং তা সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, কেননা তা জীবনের আদর্শের দ্বারা, সত্যের দায়িত্বের দ্বারা, নিয়ন্ত্রিত।

কোনো কোনো সৃষ্টিবাদী শিল্পের সর্বাঙ্গীণ অভিনবত্বের দাবিকে কিছুটা শিথিল করতে প্রস্তুত আছেন। জগৎ-সৃষ্টি সর্বাঙ্গীণভাবেই অভিনব, কারণ তা শূন্য থেকে সৃষ্টি — তার উপাদান-উপকরণও অভিনব। শিল্পের অপূর্বতা এ-রকম সর্বাঙ্গীণ নয়, তার কারণ শিল্পের উপাদান-উপকরণ প্রকৃতিদত্ত বা ঈশ্বরদত্ত। এই সৃষ্টিবাদীদের মতে শিল্পী নতুন ক'রে সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ শিল্প জিনিসটা রূপের দিক থেকেই সৃষ্টি, সব দিক থেকে নয়।

অনেক সৃষ্টিবাদী অবশ্য এই সীমাবদ্ধতাকেও মানতে প্রস্তুত নন। তাঁরা বলেন, রূপের বাইরে উপাদানের উপাদান হিসেবে কোনো অস্তিত্ব নেই। রূপের স্পর্শ পেয়েই, রূপের মধ্যে দিয়েই উপাদান সত্য হ'য়ে ওঠে। অর্থাৎ সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে উপাদানেরও জন্মান্তর ঘটে। শুধু রূপ নয়, শিল্পে উপাদানও অপূর্ব। তার কারণ শিল্পে রূপ আর উপাদান অভিন্নাত্মা।

উপাদানকেও অভিনব বলবো কি না, আসল তর্কটা অবশ্য তা নিয়ে নয়। রূপটাই কি সম্পূর্ণ অভিনব? তর্কটা এইখানেই। অনুকরণবাদী বলবেন, শিল্প জীবনেরই রূপায়ণ। মূল রূপটা জীবনের, শিল্প তারই প্রতিরূপ। সুতরাং শিল্প যে-রূপকে রচনা করে, তা সম্পূর্ণ অভিনব নয়। এবং যেহেতু প্রতিরূপ, সেইহেতু তা সম্পূর্ণ স্বাধীনও নয়। জীবনের সত্যকে লঙ্ঘন করবার — সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘন করবার — অধিকার শিল্পের নেই।

আগেই দেখেছি, সৃষ্টিবাদী আর অনুকরণবাদীর তর্কটা মূলত একটা প্রশ্নকে ঘিরেই। নিজের বাইরে কোনো-কিছুর সঙ্গে শিল্প বা সাহিত্যের সম্পর্ক আছে কি না, থাকলে

তা কোনোরকম সাদৃশ্য বা অনুরূপতার সম্পর্ক কি না, এইটেই মূল প্রশ্ন। সত্যাসত্যের প্রশ্নও এরই সঙ্গে জড়িত। কেননা, সত্য অর্থই হ'লো জীবনের সত্য, জগতের সত্য। যার সঙ্গে জীবনের বা জগতের কোনো যোগ নেই বা সম্পর্ক নেই, তার সম্পর্কে সত্যমিথ্যার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

সত্য শব্দটা সাধারণত ভাষা বা চিন্তার ক্ষেত্রেই — বর্ণনা বা বিবরণের ক্ষেত্রেই বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে। সত্য বলতে সাধারণত আমরা সত্য-চিন্তা, সত্য-বাক্য বা সত্য-বর্ণনাকেই বুঝে থাকি। চিন্তা, বাক্য বা বর্ণনার মধ্যে একটা বহির্মুখী অঙ্গুলিনির্দেশ থাকে। সে নিজের বাইরের কোনো বস্তু, ঘটনা বা তথ্যের সঙ্গে নিজের মিলের দাবি করে। এই দাবিটাকে বলতে পারি, সত্যের প্রতিশ্রুতি। মিল থাকলে — প্রতিশ্রুতির পূরণ ঘটলে তাকে সত্য বলি। অমিল হ'লে তাকে মিথ্যা বলি।

যা আছে — কেবলই আছে, তাকে সৎ বলতে পারি, কিন্তু প্রচলিত অর্থে সত্য হ'তে হ'লে তাকে আরো-কিছু হ'তে হবে। তার মধ্যে ভাষা বা চিন্তার মতো একটা বহির্মুখী অঙ্গুলিনির্দেশ থাকতে হবে, সত্যের প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করার শক্তিও তার থাকতে হবে। অর্থাৎ যার সঙ্গে তার মিলের দাবি, তার সঙ্গে তার মিলও থাকতে হবে। মরীচিকা ছবি হিসেবে সৎ, কিন্তু বাণী বা সংবাদ হিসেবে মিথ্যা। স্বপ্ন ঘটনা হিসেবে সৎ, কিন্তু যদি অপর কোনো-কিছুর বর্ণনা বা বিবরণ হিসেবে দেখতে চাই, তাহ'লে — অন্তত আক্ষরিক অর্থে — মিথ্যা। গাছটা সৎ, কিন্তু সে সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়, কারণ তার কোনো বহির্মুখী অঙ্গুলি-নির্দেশ নেই, সে কারো বর্ণনা বা বিবরণ নয় সে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফোটোগ্রাফ বিষয়-বিশেষের বর্ণনা। বস্তু হিসেবে সে সৎ, বর্ণনা হিসেবে সে খানিকটা সত্য খানিকটা মিথ্যা — নির্দিষ্ট একটা প্রসঙ্গসীমায় অনেকখানিই সত্য। অর্থাৎ সত্য হ'তে হ'লে — অন্তত প্রচলিত অর্থে সত্য হ'তে হ'লে, কারো সঙ্গে তাকে মিলতেই হবে। সোজা কথায় যা সত্য তা অপর-কিছুর সঙ্গে মিলের কারণেই সত্য। যা মিথ্যা, তা প্রতিশ্রুতি-রক্ষার অক্ষমতার কারণেই মিথ্যা, যাকে সে নির্দেশ করছে তার সঙ্গে মিল নেই ব'লেই মিথ্যা।

সাহিত্য যদি জীবন বা জগতের রূপায়ণ হয়, তাহ'লে জীবন বা জগতের রূপের সঙ্গে অথবা অর্থের সঙ্গে তার মিল ঘটতে হবে, তা সে-মিলটা যে-জাতেরই হোক না কেন। মিল থাকলে তাকে সত্য বলবো, মিল না থাকলে সত্যও বলবো না, সাহিত্যও বলবো না। অনুকরণবাদীরা এই কথাই বলেন।

কিন্তু সাহিত্য যদি সত্যিই সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ যদি তা সম্পূর্ণভাবে অপূর্ব এবং

অদ্বিতীয় হয়, যদি তা সম্পূর্ণভাবে বিষয়ান্তর-নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন হয়, যদি তার কোনো বহির্মুখী অঙ্গুলিনির্দেশ না থাকে, যদি নিজের বাইরে কোনো-কিছুর সঙ্গেই তাকে মিলিয়ে নেবার প্রশ্ন না থাকে, তাহ'লে তার সম্পর্কে সত্য-মিথ্যার প্রশ্নও উঠতে পারে না। সাহিত্য যদি সত্যিই সে-রকম স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং রুদ্ধদ্বার ব্যাপার হয়, তাহ'লে তাকে জগৎ বা জীবনের রূপায়ণও বলতে পারি না। এমন-কি জগৎ বা জীবনের প্রকাশও বলতে পারি না। বললে, তার স্বয়ংসম্পূর্ণতার হানি ঘটে। এমন-কি, অভিজ্ঞতার প্রকাশ বলতেও বাধা আছে। কেননা, অভিজ্ঞতা আর প্রকাশ পৃথক্ বস্তু। প্রকাশকে নিয়েই সাহিত্য। অভিজ্ঞতাও সাহিত্যের পক্ষে একটা বহিঃস্থিত আদর্শ। অপর-কিছুর প্রকাশ হ'লেই তা আর বিষয়ান্তর-নিরপেক্ষ থাকে না। তার মধ্যে স্বভাবতই একটা বহির্মুখী অঙ্গুলিনির্দেশ থেকে যায়।

যিনি যথার্থই সৃষ্টিবাদী, সাহিত্যকে যিনি যথার্থই অপূর্ব, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাধীন ব'লে মনে করেন, সাহিত্যকে তিনি আছে — এই অর্থে সৎ বলতে পারেন। কিন্তু সাধারণ অর্থে তাকে সত্য বলতে পারেন না। কেউ যদি আছে — এই অর্থেই তাকে সত্য বলেন, তাতে আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, দার্শনিকদের মহল-বিশেষের বাইরে সত্য কথাটার এমন প্রয়োগ মোটেই প্রচলিত নয়। সাহিত্যকে সাধারণত যখন আমরা সত্য ব'লে দাবি করি, তখন এই কথাই বলতে চাই যে, সাদৃশ্যের গুণেই হোক অথবা প্রতীকধর্মিতার মধ্যে দিয়েই হোক, যেভাবেই হোক — সাহিত্য জীবনেরই তাৎপর্যকে প্রকাশ করে। শুধু আছে, মাত্র এই কারণেই সাহিত্যকে সাধারণত সত্য ব'লে দাবি করা হয় না। সাহিত্য সত্য কথা বলে, এই কারণেই সাধারণত সাহিত্যকে সত্য ব'লে দাবি করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে কখনোই অনুকরণ ব'লে স্বীকার করেননি। সাহিত্য যে সৃষ্টি, এ-সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয়। কিন্তু সাহিত্যকে তিনি জগৎ ও জীবনের রূপায়ণও বলেছেন — জীবনের প্রকাশ, জীবন সত্যের প্রকাশ, এমনও বলেছেন। সাহিত্য যে সত্য, শুধু আছে ব'লেই নয়, জীবনের তাৎপর্যকে রূপ দেয় ব'লেই সত্য, এমন কথাও তিনি বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ একদিকে সৃষ্টিবাদীদের মতো সাহিত্যকে অপূর্ব, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাধীন ব'লেও দাবি করেছেন, আবার অন্যদিকে সেই সঙ্গেই এমন অনেক কথাও বলেছেন যা জগৎ ও জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ যোগেরই স্বীকৃতি, এমনভাবে বলেছেন, যা অনুকরণবাদীরা অনায়াসে সমর্থন করবেন, কিন্তু সৃষ্টিবাদীরা করবেন না। এই কারণেই, এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে একটু বিস্তৃতভাবে বিচার ক'রে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে ব'লে মনে করি।

'সাহিত্য' গ্রন্থের "সাহিত্যের বিচারক" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "...প্রকৃতিতে যাহা দেখি তাহা আমার কাছে প্রত্যক্ষ, আমার ইন্দ্রিয় তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাহিত্যে যাহা দেখায় তাহা প্রাকৃতিক হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং সাহিত্যে সেই প্রত্যক্ষতার অভাব পূরণ করিতে হয়।

"প্রাকৃত সত্যে এবং সাহিত্যসত্যে এইখানেই তফাত আরম্ভ হয়।"[১]

'সাহিত্যে যাহা দেখায় 'তাহা প্রাকৃতিক হইলেও' — এই বাক্যাংশের তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। জগৎ ও জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাটা প্রত্যক্ষ ব্যাপার, সাহিত্য তা নয় — এবং সাহিত্য নানা উপায়ে সেই প্রত্যক্ষতার অভাব পূরণ করে। এখানে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য আর বাস্তবে এইখানেই তফাৎ। সাহিত্য বাস্তবের আক্ষরিক অনুকরণ করে না, নিজের মতন ক'রেই সে বাস্তবের সত্য-রক্ষা করে। তার জন্য অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে অনেক বড়ো জিনিসকে ছোটো করতে হয়, ছোটো জিনিসকে বড়ো করতে হয়। "সত্যরক্ষাপূর্বক এই বড়ো করিয়া তুলিবার ক্ষমতায় সাহিত্যকারের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। যেমনটি ঠিক তেমনটি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে।"[২]

'সত্যরক্ষাপূর্বক' কথাটি লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ এখানে হুবহু নকল করার বিষয়ে অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। এখানে অন্তত প্রাচীন অনুকরণবাদীদের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ নেই। আর ওই যে সত্যরক্ষার কথাটি বলেছেন, ওই কথাটি প্রত্যেক অনুকরণবাদীই সমর্থন করবেন। এ্যারিস্টটলপন্থীদের কাছে এই উক্তির কারণে রবীন্দ্রনাথ হয়তো অনুকরণবাদী ব'লেই গণ্য হবেন।

আর্শি সব সময় সত্য কথা বলে না। পুরো সত্যকে সে কখনোই দিতে পারে না। পুরো সত্যকে দিতে হ'লে অনেক অদল-বদলের, অনেক গ্রহণ-বর্জনের প্রয়োজন হয়, তার জন্য কল্পনার সাহায্য দরকার হয়, কেননা প্রাকৃত সত্যের মর্মগত রূপকে কল্পনাই উদ্ঘাটিত করতে পারে। "এই জন্যই সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আর্শি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্যে এবং ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান। অতএব এ স্থলে একটি অপরটির আর্শি হইয়া কোনো কাজ করিতে পারে না।"[৩]

কিন্তু কাজটি কি? তা হ'লো সত্যরক্ষা। সত্যরক্ষার জন্যই সাহিত্য হুবহু অনুকরণের চেষ্টা ছেড়ে অন্য পথ ধরে। মনে রাখতে হবে যে, এই সত্যরক্ষাকেই এ্যারিস্টটল

প্রমুখ সাহিত্যশাস্ত্রীরা অনুকরণ নাম দিয়েছিলেন। 'যথাযথ অনুকরণ' করার কথা তাঁরাও বলেননি। কথাটাকে স্পষ্ট করতে হ'লে আরো-একটু উদ্ধৃতি দরকার।

"সাহিত্য যাহা আমাদিগকে জানাইতে চায় তাহা সম্পূর্ণরূপে জানায়; অর্থাৎ স্থায়ীকে রক্ষা করিয়া, অবান্তরকে বাদ দিয়া, ছোটোকে ছোটো করিয়া, বড়োকে বড়ো করিয়া, ফাঁককে ভরাট করিয়া, আলগাকে জমাট করিয়া দাঁড় করায়। প্রকৃতির অপক্ষপাত প্রাচুর্যের মধ্যে মন যাহা করিতে চায় সাহিত্য তাহাই করিতে থাকে।"[৪]

কিন্তু লক্ষ করতে হবে যে, মন তার যা খুশি তাই করে না, করতে চায়ও না, সে চায় প্রাকৃত সত্যকে সম্পূর্ণরূপে জানাতে, এবং গ্রহণ-বর্জন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে মন এই দায়িত্বই পালন করে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, সত্যরক্ষার দায়িত্ব। যে-দায়িত্ব আর্শি পালন করতে অক্ষম।

"মন প্রকৃতির আর্শি নহে, সাহিত্যও প্রকৃতির আর্শি নহে। মন প্রাকৃতিক জিনিসকে মানসিক করিয়া লয়; সাহিত্য সেই মানসিক জিনিসকে সাহিত্যিক করিয়া তুলে।"[৫]

মূল জিনিসটা কিন্তু প্রাকৃতিক। তার প্রাথমিক রূপান্তর, সে যখন মানসিক হ'লো, তখন। পরবর্তী রূপান্তর, সেই মানসিক বস্তুটি যখন সাহিত্যিক হ'লো, তখন। কিন্তু এই ডবল রূপান্তরেও তার মর্ম সত্যটি অবিকৃতই থাকে।

"মন সাধারণত প্রকৃতির মধ্য হইতে সংগ্রহ করে, সাহিত্য মনের মধ্য হইতে সঞ্চয় করে। মনের জিনিসকে বাহিরে ফলাইয়া তুলিতে গেলে বিশেষভাবে সৃজনশক্তির আবশ্যক হয়। এইরূপে প্রকৃতি হইতে মনে ও মন হইতে সাহিত্যে যাহা প্রতিফলিত হইয়া উঠে তাহা অনুকরণ হইতে বহুদূরবর্তী।"[৬]

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য মনে প্রতিফলিত প্রকৃতির দ্বিতীয় প্রতিফলন। এই প্রতিফলনের প্রতিফলন মূল থেকে বহুদূরবর্তী।

এ কোন্ গোত্রের সাহিত্যতত্ত্ব? এ অনুকরণবাদ, না সৃষ্টিবাদ? নামটা বড়ো কথা নয়। বিষয়টাকেই তলিয়ে দেখতে হবে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সাহিত্য আর্শির মতন ক'রে হুবহু নকল করতে চেষ্টা করে না। অনুকরণ অর্থ যদি হুবহু নকল ধরি, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই অনুকরণবাদী নন। কিন্তু প্রতিফলনমাত্রকে যদি অনুকরণ বলি, তা সে যতোই পরিবর্তিত, যতোই দূরবর্তী প্রতিফলন হোক না কেন, যদি সত্যরক্ষাকেই অনুকরণ বলি, তা সে সত্য যতোই নিগূঢ় বা রূপান্তরিত হোক না কেন, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথ এখানে — অন্তত: এই "সাহিত্যের বিচারক" প্রবন্ধে — অনুকরণ- বাদীর মূল বক্তব্যকেই সমর্থন করছেন।

এইরকম দূরবর্তী প্রতিফলনের ক্ষেত্রে, বিশেষ ক'রে যার মধ্যে কল্পনার প্রবল হস্তক্ষেপ ঘটেছে, সাধারণত তার ক্ষেত্রে অনুকরণ কথাটি ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু সাহিত্যতত্ত্বে অনুকরণ একটা পারিভাষিক শব্দ। যে-কোনো রকম প্রতিফলনকেই এ্যারিস্টট্ল অনুকরণ বলেছেন। সংগীতও তাঁর মতে জীবনের অনুকরণ, অনুভূতির অনুকরণ। সাহিত্য যে-রূপে এবং উপাদানে প্রকৃতি থেকে বহুদূরবর্তী এ-কথা জেনেও এ্যারিস্টট্ল সাহিত্যকে প্রকৃতির অনুকরণ বলতে দ্বিধা করেননি। এ্যারিস্টট্লের পারিভাষিক অর্থে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অনুকরণবাদী।

সাহিত্য বাস্তবের প্রতিফলন — কিংবা প্রতিফলনের প্রতিফলন — এই কি রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত? অন্তত 'সাহিত্য' গ্রন্থের "সাহিত্যের বিচারক" কিংবা "সাহিত্যের তাৎপর্য" প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনার কালে রবীন্দ্রনাথের অভিমত যে এইরকমই ছিলো, তাতে সন্দেহ নেই। "সাহিত্যের তাৎপর্য" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মানুষের শিল্পসৃষ্টিকে ভগবানের বিশ্বসৃষ্টির প্রতিধ্বনি ব'লে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "ভগবানের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত; মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত; মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। ...সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী।"

একটা কথা পরিষ্কার ক'রে নেওয়া দরকার। সাহিত্য কি সত্যিই প্রকৃতির প্রতিফলনের প্রতিফলন, প্রকৃতি থেকে দুই ধাপ দূরবর্তী? একটু আগেই দেখেছি, "সাহিত্যের বিচারক" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তিনটে স্বতন্ত্র স্তরের কথা বলেছেন। একটা হ'লো প্রকৃতির স্তর, সেখানে প্রকৃতির নিজস্ব রূপ। দ্বিতীয় স্তরটা মানসিক, যেখানে মানুষ প্রকৃতিকে নিজের মতন ক'রে গ্রহণ করে, যেখানে প্রকৃতির রূপটা মানসিক ও মানবিক। একে বলতে পারি মনে-প্রতিফলিত-প্রকৃতির রূপ। আর তৃতীয় স্তরটা সাহিত্যের। এখানে পাই মনে-প্রতিফলিত-প্রকৃতির সাহিত্যগত রূপায়ণ। কিন্তু এই তিন স্তরের বিভাগকে কি রবীন্দ্র-দর্শন সম্মত বলা চলে?

রবীন্দ্রনাথের পরিণত সাহিত্যচিন্তা দর্শনচিন্তা এই বিভাগকে সমর্থন করে না প্রথম স্তরটাকে আমরা অনায়াসে বাদ দিতে পারি। প্রকৃতির নিজস্ব রূপ কী তা আমরা কেউ জানি না, জানতে পারি না, জানতে পারবো না। মনে-প্রতিফলিত নয় এমন প্রকৃতি মানুষের পক্ষে সত্য নয়, মানুষের কাছে তার অস্তিত্বই নেই। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট বলেছেন যে, সত্য সব সময়ই মানবিক এবং মানসিক। সুতরাং মানুষের কাছে প্রকৃতি অর্থই মানব-হৃদয়ে-প্রতিফলিত প্রকৃতি। কিন্তু তাকে

প্রতিফলিত বলার অর্থ হয় না, কেননা মানুষের কাছে সেইটেই মূল। এই প্রকৃতিকে মানুষ একই সঙ্গে আবিষ্কার করে এবং সৃষ্টি করে। বলা প্রয়োজন যে, এই আবিষ্কর্তা এবং সৃষ্টিকর্তা কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়, মানব সমগ্রতা।

মানবিক ও মানসিক প্রকৃতিই সত্যিকারের প্রকৃতি। সাহিত্য এই প্রকৃতির তাৎপর্যকে, এই প্রকৃতির রূপকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। "সাহিত্যের বিচারক" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এরই সত্যরক্ষা করার কথা বলেছিলেন।

সত্য যদি মানবিক হয়, যাকে বাস্তব বলি, প্রকৃতি বলি, তা যদি মানসিক হয়, তাহ'লে তা অবশ্যই ব্যক্তিবিশেষের। এ-কথা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করবেন না। কিন্তু তাঁর মতে, তা ব্যক্তিবিশেষের হ'য়েও সর্বমানবের। সেইজন্যেই তার রূপকে তদ্‌গত রূপ বলতে কোনো বাধা নেই। প্রকৃতি যেমন সর্বমানবের, সাহিত্যও তাই। সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের রচনা হ'য়েও সর্বগত। প্রাকৃত সত্য যেমন মানবিক, তার সাহিত্যগত প্রকাশও তেমনি মানবিক। সাহিত্যে বহিরঙ্গের বদল যতোই ঘটুক, প্রাকৃত সত্যের সাহিত্যগত হবার কালে কোনো মর্মগত বদল ঘটে না — কেন না সত্যরক্ষার দায়িত্বকে সাহিত্য কখনোই অস্বীকার করে না। বাইরের বদল যা ঘটে, সে কেবল সত্যরক্ষার তাগিদেই ঘটে।

সাহিত্যকারের নিজত্বও তার মধ্যে কোনো মর্মগত পরিবর্তন ঘটায় না। সাহিত্যকারের যে-মন সাহিত্য রচনা করে, রচনার কালে তার বিশিষ্ট নিজত্ব স্বেচ্ছাক্রমে উৎসর্গীকৃত। এই নিজত্বের ভারমুক্ত মনকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বিশ্বমানবমন'।

নিজত্বের ব্যবধান যদি কিছু থাকেও, রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েই বলেছেন, তা সত্য প্রকাশে বাধা ঘটায় না। "প্রকৃত সাহিত্যকারের অন্তঃকরণে যদি তাহার নিজত্ব ও মানবত্বের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে তবে তাহা কল্পনার কাচের শার্সির স্বচ্ছ ব্যবধান। তাহার মধ্য দিয়া পরস্পরের চেনা-পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটে না।"[৭]

ব্যবধান ঘটে না, তার কারণ সাহিত্যকারের নিজত্ব এখানে তাঁর মানবত্বের কাছে নিজেকে উৎসর্জিত ক'রে দিয়েছে। "সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্তা।"[৮]

সাহিত্যে লেখকের স্থান নিয়ে, রচয়িতার ব্যক্তিত্বের মূল্য নিয়ে একটা তর্ক আছে। রোমান্টিক সৃষ্টিবাদীরা সাধারণত ব'লে থাকেন, বিশ্বসৃষ্টি যেমন বিশ্বস্রষ্টার আত্মপ্রকাশ, সাহিত্যও তেমনি রচয়িতার আত্মপ্রকাশ। বিশেষ অর্থে, নিজের মতন ক'রে, রবীন্দ্রনাথও এই কথাই বলেছেন। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ আর মানবপ্রকাশে কোনো পার্থক্য নেই। রোমান্টিক সাহিত্যশাস্ত্রীরা ঠিক এই অর্থে আত্মপ্রকাশ বলেন না। কেউ কেউ বরং আরো-একটু এগিয়ে গিয়ে এই দাবিই ক'রে থাকেন যে,

সাহিত্য আর-কিছুই নয়, সে হ'লো রচয়িতার নিজত্বেরই প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে আত্মপ্রকাশ বলেছেন বটে, কিন্তু লেখকের নিজত্ব-প্রকাশ বলেননি। তিনি বলেছেন, "আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে দুইটা অংশের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। একটা অংশ আমার নিজত্ব, আর একটা অংশ আমার মানবত্ব।...

"সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্তা। লেখকের নিজত্বকে সে আপনার করিয়া লয়...।"[৯]

রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখকের নিজত্ব আর লেখকের ব্যক্তিত্ব মোটেই এক জিনিস নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে নিজত্ব জিনিসটা ব্যবহারিক ক্ষেত্রের ব্যাপার, জীবযাত্রার অসংখ্য স্থূল-সূক্ষ্ম প্রয়োজনের দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত। নিজত্ব ও আসক্তি অচ্ছেদ্য। ব্যক্তিত্ব তা নয়। ব্যক্তিত্বের মূলে আছে ব্যক্ততা। ব্যক্ততা আসে প্রকাশবান্ হ'য়ে-ওঠায়, দীপ্ত হ'য়ে-ওঠায়। ব্যক্ততা আসে সত্য হ'য়ে-ওঠার মধ্য দিয়ে, মানবত্ব অর্জন-করার মধ্য দিয়ে। মানবত্বই ব্যক্তিত্বের যথার্থ পাদপীঠ।

সাহিত্যে ব্যক্তিত্ব মূল্যবান, কেননা ব্যক্ততাই সাহিত্য। এই ব্যক্তিত্বের মূল্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও যেমন সত্য, রচয়িতার ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। কিন্তু নিজত্ব তা নয়। সাহিত্যসৃষ্টিতে নিজত্ব সহায় নয়, নিজত্ব বাধা। স্রষ্টা নিজত্বকেই বিসর্জন দেন। তারই নাম সর্জন। "সৃষ্টি আর সর্জন হল একই কথা।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যরচনাকে নিরাসক্ত ক্রিয়া বলেছেন, নৈর্ব্যক্তিক বলেননি। রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য একই সঙ্গে নিরাসক্ত এবং ব্যক্তিগত; আর বিজ্ঞান একই সঙ্গে নিরাসক্ত এবং নৈর্ব্যক্তিক।

নিরাসক্তি উভয়ক্ষেত্রেই অপরিহার্য। কিন্তু ব্যক্তিস্বভাববর্জন উভয় ক্ষেত্রের পক্ষে সত্য নয়। একদিকে তিনি বলেছেন, "সায়ান্সেই বলো আর আর্টেই বলো নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন...।"[১১] আবার অন্যদিকে তেমনি বলেছেন, "বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তিস্বভাববর্জিত; তার ধর্মই অপক্ষপাত কৌতূহল।...সাহিত্যের বিশেষত্বই হচ্ছে তার পক্ষপাত-ধর্ম; সাহিত্যের বাণী স্বয়ংবরা।"[১২] নিরাসক্তিতে বিজ্ঞানে সাহিত্যে তফাৎ নেই। তফাৎ ব্যক্তিস্বভাব বর্জনে।

এইবারে আমরা আবার সৃষ্টি ও অনুকরণের প্রসঙ্গে ফিরে আসতে পারি। আমরা দেখতে পেলাম, সাহিত্য প্রকৃতির প্রতিফলনের প্রতিফলন নয়, সরাসরি প্রকৃতিরই প্রকাশ, প্রকৃতিরই রূপায়ণ। বহুদূরবর্তী কিছু নয়, কেননা মূলের মর্মগত সত্যতা তার মধ্যে অবিকৃতই আছে।

সাহিত্য মানব-অভিজ্ঞতার মানব-বিশ্বের সত্যরূপায়ণ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অধিকতর সত্য'। সাহিত্য "...বাহিরে কৃত্রিম হইয়া অন্তরে প্রাকৃত অপেক্ষা অধিকতর সত্য হইয়া ওঠে।"[১৩] প্রকৃতির বিশৃঙ্খল অজস্রতায় সত্যের তাৎপর্য ঢাকা থাকে, রূপের পূর্ণতা আড়ালে প'ড়ে যায়। "সাহিত্য যাহা আমাদিগকে জানাইতে চায় তাহা সম্পূর্ণরূপে জানায়...।"[১৪] প্রকৃতিতে সত্যকে আমরা তার যথার্থরূপে দেখতে পাই না। সাহিত্য প্রাকৃত সত্যের যথার্থ রূপকে অনাবৃত ক'রে দেয়।

কিন্তু এই রূপায়ণকেই যদি স্বীকার ক'রে নিই, তাহ'লে একে অনুকরণ বলতেই বা আপত্তি করবো কেন? অভিজ্ঞতার জগৎ যখন শিল্পের বাইরের জগৎ, এবং অভিজ্ঞতার জগতের সঙ্গে শিল্পের যখন মর্মগতভাবে একটা সত্যরক্ষার দায়িত্ব আছে, তখন শিল্পকে অনুকরণ বলতে — অন্তত পারিভাষিক অর্থে অনুকরণ বলতে আপত্তি থাকবে কেন?

তত্ত্বের দিক থেকে দেখলে সত্যিই আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে। বিশিষ্ট অর্থে অনুকরণ বলতে যেমন আপত্তি নেই, সৃষ্টি বলতেও কিন্তু বিন্দুমাত্র আপত্তির কিছু নেই। বরং সৃষ্টি কথাটারই দাবি অপেক্ষাকৃত জোরালো। আমরা আগেই দেখেছি, রবীন্দ্রনাথের মতে কোনো সত্যই অমানবিক বা অমানসিক নয়। মানুষ নিজের বিশ্বকে নিজেই সৃষ্টি করে। তথা-কথিত প্রাকৃত সত্যও মানব-সৃষ্ট সত্য। প্রকৃতিই যদি মানব-সৃষ্ট হয়, তাহ'লে সাহিত্যের আর সৃষ্টি হ'তে বাধা কোথায়?

প্রশ্ন উঠতে পারে, সাহিত্যের মধ্যে সেই চূড়ান্ত অ-পূর্বতা কোথায় যার জোরে তাকে সৃষ্টি বলতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সাহিত্য অধিকতর সত্য।' 'অধিকতর' কথাটা অগ্রাহ্য করবার মতো নয়। প্রকৃতির অপক্ষপাত প্রাচুর্যে রূপ এবং তাৎপর্য ভেঙে চুরে একাকার হ'য়ে যায়। "...প্রাকৃত সত্য জড়িতমিশ্রিত 'ভগ্নখণ্ড' ক্ষণস্থায়ী। সংসারের ঢেউ ক্রমাগতই ওঠা-পড়া করিতেছে, দেখিতে দেখিতে একটার ঘাড়ে আর-একটা আসিয়া পড়িতেছে তাহার মধ্যে প্রধান অপ্রধানের বিচার নাই — তুচ্ছ ও অসমান্য গায়ে গায় ঠেলাঠেলি করিয়া বেড়াইতেছে।"[১৫] সাহিত্যকে সৃষ্টি বলবো এই জন্যে যে, তার মধ্যে রূপের সমগ্রতা আছে, তাৎপর্যের অখণ্ডতা আছে, ভাবের পূর্ণতা আছে। এই সমগ্রতা, এই পূর্ণতা প্রকৃতিতে নজরে পড়ে না — প্রকৃতিতে তা প্রচ্ছন্ন বা অদৃশ্য। প্রকৃতিও সৃষ্টি, সাহিত্যও সৃষ্টি। কিন্তু সাহিত্যের সৃষ্টি পরিচ্ছন্ন ও সমগ্র। এই জন্যেই সাহিত্য 'অধিকতর সত্য'। এইখানেই সাহিত্যের অ-পূর্বতা।

মানুষ সৃষ্টিকর্তা। সে তার জীবনকে সৃষ্টি করে। জগৎকে সৃষ্টি করে, নিজেকেও

সৃষ্টি করে। মানুষ নিজেকে অপরের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারে, অপরের অন্তরে প্রবেশ করে, নিজের বাইরে নিজেকে বিস্তৃত করতে পারে — এই আত্মবিস্তারের মধ্যে দিয়েই সে নিজেকে, শুধু নিজেকে নয়, সমগ্র মানববিশ্বকে রচনা করতে করতে চলে। এই প্রক্রিয়া অন্তহীন। তার সাহিত্যসৃষ্টিও এই প্রক্রিয়ারই অন্তর্গত। এই অন্তহীন ক্রিয়াশীলতায় রূপায়ণে ও সৃজনে কোনো পার্থক্য নেই।

সাহিত্য যে একই সঙ্গে মানুষের আত্মসত্য ও বিশ্বসত্যের আবিষ্কার এবং তার আত্মসত্য ও বিশ্বসত্যের সৃজন, এই প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার পরিণতি পর্বে এসে একটি সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের মানব-ব্রহ্মবাদই এই দার্শনিক ভিত্তি। 'সাহিত্য' গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহ রচনার কালে এই দার্শনিক ভিত্তি যথেষ্ট পরিমাণে দৃঢ় ছিলো না। সেই কারণেই সে-সময়ে রূপায়ণ আর সৃজন এই দুই প্রত্যয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মনের একটা দোলাচল ভাব লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ একদিকে বলেন, "এই জগৎসৃষ্টির আনন্দগীতের ঝংকার আমাদের হৃদয়বীণাতন্ত্রকে অহরহ" যেভাবে স্পন্দিত করছে, "ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাত আমাদের অন্তরের মধ্যে···যে রাগিনী বাজাইতেছে, সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।... তাহা দৈববাণী।"[১৬] আবার অন্যদিকে সেই সঙ্গেই তিনি বলেন, "তাহা [সাহিত্য] আবিষ্কার নহে, অনুকরণ নহে, তাহা সৃষ্টি।"[১৭] এই দুই আপাত-বিপরীত উক্তি যে শক্তিতে সামঞ্জস্যবন্ধনে গ্রথিত হ'তে পারে, সেই শক্তির উৎস তখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত।

পরিণতি পর্বে এই দ্বৈততার সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছে। যেখানে মানুষ আর প্রকৃতির নিত্য-সংযোগের বাইরে মানুষও অসিদ্ধ, প্রকৃতিও অসিদ্ধ — যেখানে এই নিত্য-সংযোগই একমাত্র সত্য, যেখানে সত্য অর্থই জগতের উপলব্ধি এবং জগৎ অর্থই উপলব্ধ জগৎ, সেখানে দ্বৈততার অবকাশ নেই। কেননা সেখানে সৃষ্টি এবং আবিষ্কার একই। যতোক্ষণ নিজত্বের প্রাচীরে আবদ্ধ, ততোক্ষণ সৃষ্টি আর আবিষ্কার আলাদা। কিন্তু বিশ্বমানবমন বা মানব-ব্রহ্মের পক্ষে যা সৃষ্টি তা-ই আবিষ্কার, যা-আবিষ্কার তা-ই সৃষ্টি।

প্রচলিত অর্থে ধরলে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি অনুকরণবাদীও নন, আবার পুরোপুরি সৃষ্টিবাদীও নন। অর্থাৎ নব্য-ক্লাসিক্যাল অর্থে তিনি অনুকরণবাদী নন। আবার খাঁটি রোমান্টিক অর্থে তিনি সৃষ্টিবাদীও নন। কিন্তু মানব-ব্রহ্মবাদী হিসেবে তিনি দুই-ই।

১. র।১৩।৭৪৫

২-৩. তদেব

৪. তদেব, ৭৪৭

৫-৬. তদেব

৭. তদেব, ৮৪৭

৮-৯. তদেব

১০. "সাহিত্য", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৩০৯

১১. "আধুনিক কাব্য", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৩৫২

১২. "সাহিত্য ধর্ম", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪ ৩৩০

১৩. "সাহিত্যের বিচারক", 'সাহিত্য', র।১৩।৭৪৫

১৪. তদেব, ৭৪৬

১৫. তদেব, ৭৪৫

১৬. "সাহিত্যের তাৎপর্য", র।১৩.৭৩৯

১৮. "সাহিত্যের সামগ্রী", 'সাহিত্য', র।১৩।৭৪৩

সাহিত্যের সত্য

স্রষ্টার কাছে সব থেকে বড়ো, সব থেকে প্রত্যক্ষ হ'লো সৃজনের রহস্য। মুখ্যত যিনি স্রষ্টা, যেমন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব যে সৃজনকেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্ব হবে এটা স্বাভাবিক। সুতরাং সৃজনক্রিয়ার রহস্যের মধ্যেই যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের স্বরূপকে দেখতে পাবেন, এ-ও অপ্রত্যাশিত নয়। তবু, সাহিত্যের স্বরূপের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বার-বার সৃজনের প্রসঙ্গ অতিক্রম ক'রে সত্যের প্রসঙ্গে এসে উপনীত হয়েছেন। এ-ব্যাপারটা তাৎপর্যপূর্ণ। সৃষ্টির বেগ, প্রকাশের আনন্দ — এর সঙ্গে সাহিত্যের সত্যাসত্যের প্রশ্নের যোগ কোথায়?

সৃজনক্রিয়ার বাইরের দিকটা প্রয়োগ ও নির্মিতির দিক, কৌশল ও অভিজ্ঞতার দিক, উপাদান-উপকরণের উপর আধিপত্যের দিক। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের এই দিকটা নিয়েও প্রচুর আলোচনা করেছেন। কিন্তু সে-আলোচনা সাহিত্যতত্ত্ব হিসাবে নয়, সাহিত্যের স্বরূপ প্রসঙ্গে নয়। নির্মিতি নয়, রবীন্দ্রনাথের আসল আকর্ষণ সৃজনের ভিতরের মহলে, যেখানে প্রেরণা প্রবর্তনা উদ্‌বেজনার শক্তি-সঞ্চার, যেখানে কল্পনার আত্মসম্প্রসারণের ইন্দ্রজাল, যেখানে ব্যক্তিত্বের অর্জন-উৎসর্জনের রহস্য। এই ভিতরের মহলের দিকে তাকিয়েই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে বলেছেন লীলা, বলেছেন অ-প্রয়োজনের আনন্দ। বলেছেন বাহুল্য, surplus — উদ্‌বৃত্ত।

সৃজনের আনন্দ প্রকাশের আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এ হ'লো "আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল ও বহুল" করবার ইচ্ছা, "কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি"র আবেগ।[১] এর কোনো কেন নেই। এ-আনন্দ আপনাতেই সম্পূর্ণ। তাই এর নাম লীলা। "অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষগোচর করার দ্বারা তাকে পর্যাপ্তি দান",[২] এই হ'লো সৃষ্টিলীলা। কিন্তু যে-আনন্দ অহেতুক এবং অবাধ, যা কিনা বিশুদ্ধ লীলা, তার প্রসঙ্গে সত্যাসত্যের প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? সৃষ্টি যদি প্রকৃতই সৃষ্টি হয়, তা কি লৌকিক বা জাগতিক সত্যের ঊর্ধ্বে নয়? তার কি নিজের বাইরে অপর কোনো আদর্শ থাকতে পারে যার নির্দেশ, যার নিয়ম সে মানতে বাধ্য? লীলার উপর কি কোনো নিয়ম-কানুন খাটে?

এ-কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বকে সাধারণভাবে লীলাবাদী

সাহিত্যতত্ত্ব ব'লে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। লীলাবাদের একটা পাশ্চাত্য সংস্করণের সঙ্গে আমরা সকলেই সুপরিচিত। এর প্রথম পর্বে অবশ্য সত্যের দাবিকে মোটেই অস্বীকার করা হয়নি। কিন্তু এর ঐতিহাসিক পরিণতি যে 'আর্ট ফর আর্ট্‌স্ সেক' মতবাদে, সেখানে এসে দেখতে পেলাম, কার্যত সত্যের দাবিটা অনেকখানি ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে। আর এক ধাপ এগিয়ে এসে 'ইস্থেট্'দের যে শিল্পকেন্দ্রিক জীবনদর্শনের সাক্ষাৎ পেলাম, সেখানে কিন্তু সত্যের দাবিকে প্রায় পুরোপুরিই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের কোনো-কোনো শাখার কোনো-কোনো দিকের সঙ্গে লীলাবাদের সমধর্মিতা খুব দুর্লক্ষ্য নয়। সেখানে কবিদের, 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা'-র উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, অপার কাব্যসংসারে কবিরাই প্রজাপতি। তাঁরা ইচ্ছাসুখে সৃজন করেন। সে-সৃষ্টি বিষয়ান্তরস্পর্শশূন্য। যে-জগৎ তাঁরা সৃজন করেন তা অ-লৌকিক। তা প্রকৃতিকৃতনিয়ম-রহিত, তা লৌকিক সত্যের অধীন নয়। জোরটা কবির স্বাধীনতার উপর। সত্যের অধিকার যে এখানেও খুব সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, তা সহজেই বোঝা যায়।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, লীলাবাদীরা সত্যের দাবিদার নন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লীলাবাদী সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে এমন কথা বলা চলবে না। রবীন্দ্রনাথ সত্যের অধিকারকে সামান্য পরিমাণেও ক্ষুণ্ণ হ'তে দিতে ইচ্ছুক নন। এইখানেই সমস্যার উদ্ভব।

নানা প্রসঙ্গে নানা উপলক্ষে কীট্সকে স্মরণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছেন : Truth is beauty, beauty truth। — এই ট্রুথ, এই বিউটি, এরা কি আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত ট্রুথ, পরিচিত বিউটি নয়? নতুবা -- ট্রুথ কেন বিউটি হ'তে বাধ্য, আর বিউটিই বা কেন ট্রুথ হ'তে বাধ্য? সুন্দর মিথ্যা অথবা কুৎসিত সত্য, এ কি আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় কখনো পাই না? তা যদি পাই, তাহ'লে সাহিত্যের সত্য, সাহিত্যের সুন্দর, এরা কি মন-গড়া বস্তু? কল্পনার সত্য কি জীবন-সত্যের বিকল্প? রোমান্টিক লীলাবাদীরা যখন সাহিত্যের কথা বলেন, তখন সাধারণত তাঁরা এইরকম কাল্পনিক বিকল্প সত্যের কথাই বলেন।

কীট্সের নিজের মনোভাব সম্পর্কে এ-রকম সন্দেহ যে একেবারে অমূলক নয়, সে-সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি (কল্পনাতত্ত্ব দ্রষ্টব্য)। কীট্সের কাছে Beauty is truth — এই কথাটাই প্রথম কথা। প্রধান কথাও এইটেই। হয়তো সুন্দরকেই তিনি সত্য নামে আখ্যাত করেছেন, সত্যের স্বতন্ত্র কোনো মান

তাঁর কাছে ছিলো না। রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্যই প্রাথমিক। সুন্দর সত্যেরই একটি অভিধা। সুন্দর হ'লো সত্যেরই আনন্দরূপ। কীট্‌সের সৌন্দর্যভাবনার মধ্যে কেউ-কেউ একটি করুণ কামনার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছেন। তরুণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তার আভাস আছে, কিন্তু পরিণত রবীন্দ্রনাথে তার কিছুমাত্র চিহ্ন নেই। রবীন্দ্রনাথের পরিণত সাহিত্যচিন্তায় কীট্‌সীয় সৌন্দর্যভাবনা বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে বিপরীত-ভাবে বিন্যস্ত হয়েছে।[৩] রবীন্দ্রনাথের সত্য জীবন-সত্যের বিকল্প নয়। বিশিষ্ট-অনুভবের সত্য নয়, — ঋজু অরুগ্ন অলজ্জিত সত্য, সাধারণ-উপলব্ধির সত্য। সমস্ত আধ্যাত্মিকতা সত্ত্বেও তা প্রবলভাবে প্রাণস্পন্দিত সত্য।

রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্য সাহিত্য ব'লেই সত্য। জীবনের 'অসুন্দর'-সত্য-গুলোও সত্য ব'লেই গ্রহণীয়। সত্য ব'লেই — সাহিত্যে তারা সুন্দর। কেননা সেখানে তাদের সেই আনন্দরূপ উদ্‌ঘাটিত, জীবনে যা আবৃত ছিলো। সুন্দর মিথ্যা — যদি সত্যিই মিথ্যা হয়, সর্বৈব মিথ্যা হয়, তাহ'লে মিথ্যা ব'লেই তা অগ্রাহ্য। কিন্তু 'সুন্দর মিথ্যা' এ-কথাটাই স্ববিরোধী।

লীলা আর সত্য, এরা যেন বিপরীতমুখী দুটো বিরুদ্ধ শক্তি। এদের দু-জনকেই স্থান দেওয়া, সমান উচ্চাসন দেওয়া রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের একটি প্রধান বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনায় সৃষ্টিরই আর-এক নাম প্রকাশ, আর সেই প্রকাশের একটা মুখ লীলার দিকে, আর-একটা মুখ সত্যের দিকে।

লীলা হ'লো ইচ্ছার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা — অবাধ ইচ্ছাশক্তি। পিছনে তার কোনো হেতু নেই, সামনে তার কোনো লক্ষ্য নেই, কোথাও তার কোনো মানা নেই। স্রষ্টার ইচ্ছার কোনো সীমানা নেই, যেমন সীমানা নেই লীলাময় বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছার। লীলা মানেই মুক্তি। আনন্দময় মুক্তি। অথবা বলি, মুক্ত আনন্দ। সৃষ্টি — সে অনুসন্ধানও নয়, আবিষ্কারও নয়, সে হ'লো আবির্ভাব। যা আছে তাকে দেখা নয়, এ যেন যা নেই তাকে আনা।

প্রকাশের সত্যের দিকের মুখটা কিন্তু মাটির কাছাকাছি ঝুঁকে পড়েছে, মাটিকে যেন ছুঁয়ে আছে। প্রকাশ যখন মানবপ্রকাশ, মানববিশ্বের প্রকাশ — সত্য হ'য়ে-ওঠার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ, তখন মানতেই হবে যে, মানবসত্যের সীমানায় সে সীমাবদ্ধ। জীবনের সীমানাই প্রকাশের নিত্য-নির্ধারিত সীমানা। প্রকাশ যদি জীবন-সত্যের প্রকাশই হয়, তাহ'লে সাহিত্য একে রচনা করে না, আবিষ্কার করে। অন্তত সত্যের ক্ষেত্রে কবিরা স্রষ্টা নন, দ্রষ্টা।

সমস্যাটা স্পষ্ট। সৃষ্টি যদি নিজের বাইরে অপর কোনো-কিছুর সঙ্গে কোনোরকম শর্ত-সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে, তার উপর যদি সত্য হবার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে, সে যদি স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং স্বয়ংসিদ্ধ না হয়, তাহ'লে কবিকল্পনাকে যথার্থভাবে মুক্ত ব'লে দাবি করা যায় না। আর কবিকল্পনা যদি যথার্থই মুক্ত হয়, তবে তার প্রসাদে যা সৃষ্ট হ'লো তা সত্য কি অসত্য এ-প্রশ্ন অবান্তর। অর্থাৎ সাহিত্য যদি লীলাই হয়, তাহ'লে তার মিথ্যা হ'তে বাধা নেই, সত্য হবার দায় নেই। আর সাহিত্য যদি সত্য হয়, তাহ'লে তার লীলা হবার উপায় নেই। এ-অবস্থায়, সাহিত্য যে একসঙ্গে দুই-ই হবে, তার পথ কোথায়?

একটা পথ অবশ্য আছে। লীলা যদি প্রকৃত লীলা না হয়, অথবা সত্য যদি প্রকৃত সত্য না হয়। সত্যের কথাই বলি। সত্য বলতে যদি জগৎ ও জীবনের সত্যকে না বুঝি, তাকে সত্য না ব'লে যদি আর-কিছুকে সত্য বলি — এমন একটা-কিছু যা নির্মম অনমনীয়তায় অমোঘ নয়, যা নমনীয়, নির্বিষ এবং বশংবদ, তাহ'লে সমস্যাটা অনেক সহজ হ'য়ে আসে। সত্য যদি কেবলই কল্পনার সত্য হয়, আর কল্পনা যদি নিছকই কাল্পনিকতা হয়, তাহ'লে তেমন সত্যের সঙ্গে লীলার মিলতে কোনো বাধা থাকে না। পাশ্চাত্য রোমান্টিসিস্টদের অনেকের ক্ষেত্রেই আমরা এ-রকম প্রবণতার সাক্ষাৎ পেয়েছি। পূর্বেই বলেছি, তরুণ রবীন্দ্রনাথে কোথাও-কোথাও এর আভাস থাকলেও, রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ-পরিণত সাহিত্যভাবনায় এ-রকম বিকল্প-সত্যের কোনো স্থান নেই। যিনি বার-বার সাহিত্যে 'জীবনের স্বাক্ষরে'র কথা বলেছেন, তিনি যে জীবনের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত কোনো সত্যকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন এটা স্বাভাবিক মনে হয় না।

প্রশ্নটা কাকে সত্য নাম দেব তা নিয়ে নয়। লোকপ্রচলনকে অগ্রাহ্য করলে মিথ্যাকেও সত্য নাম দিতে পারি, সত্যকেও মিথ্যা নাম দিতে পারি। সাহিত্যে 'জীবনের স্বাক্ষর'কে কতোটা মূল্য দেবো, রিয়ালিটির দাবিকে কতোটা স্বীকার করবো, বা আদৌ করবো কি না — প্রশ্নটা তাই নিয়ে। সাহিত্যের সত্য জীবনের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত? এ-জিজ্ঞাসার উত্তরে পৌঁছুবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ভাবনায় 'সাহিত্যের সত্য' কথাটার যথার্থ অর্থ কী, সেটা একটু ভালো ক'রে বুঝে নেওয়া দরকার।

প্রথমেই 'সাহিত্যের সত্য' এই কথাটার প্রয়োগের দুটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রকে আলাদা ক'রে নিতে হবে। দুটি প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের। সাহিত্য নিজে কতোটা সত্য অর্থাৎ

কতোটা সত্তাবান্ বা অস্তিত্বশীল, এ হ'লো এক ধরনের প্রশ্ন, আর সাহিত্য যে-কথা বলে সে-কথা কতোটা সত্যকথা, সে হ'লো সম্পূর্ণ আর-এক ধরনের প্রশ্ন। একটা সত্তার প্রশ্ন, অপরটা সত্যবাদিতার প্রশ্ন। যদিও দুটোর ক্ষেত্রেই আমরা 'সত্য' কথাটাকে প্রয়োগ ক'রে থাকি, তা হ'লেও দুটো ক্ষেত্রে কথাটার অর্থ আলাদা। প্রথমটি হ'লো সাহিত্যবস্তুর বস্তুগত অস্তিত্বের কথা — যা গ'ড়ে উঠলো তা কোথায় আছে, কতোটা আছে, কীভাবে আছে, সেই কথা। দ্বিতীয়টি হ'লো সাহিত্যের সত্যবাদিতার কথা। প্রথমটি শিল্পবস্তুর রিয়ালিটির প্রসঙ্গ, দ্বিতীয়টি শিল্পবাণীর ট্রুথের প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যের সত্যের কথা বলেন, সাহিত্যে জীবনের স্বাক্ষরের কথা বলেন, তখন সত্য কথাটার প্রসঙ্গভূমি কোন্‌টি?

আমাদের জীবনযাপনকে ঘিরে আছে — তাকে ধারণ ক'রে আছে যে-বাস্তব, আমার নিজের অস্তিত্ব যার অস্তিত্বের সঙ্গে এবং যার অস্তিত্ব আমার নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত, আমাদের কাছে যে স্বয়ংসিদ্ধ, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে দার্শনিক ছাড়া আমরা সকলেই নি:সংশয়, সে হ'লো দেশে-কালে-অধিষ্ঠিত বাস্তব। তার পারমার্থিক সত্তা যা-ই হোক না কেন, আমাদের আছে সে-ই পরম সত্তা। তাকেই বলি রিয়ালিটি। তারই নিকষে স্বপ্ন মিথ্যা, ভ্রান্তি ভ্রান্তি। সে রিয়েল, এই অর্থে সে সত্য। ট্রুথ কথাটা তার প্রতি প্রযোজ্য নয়। কিন্তু আমাদের চেতনার কাছে সমস্ত ট্রুথের দাবির সে-ই হ'লো চরম নিরসন। তাকে বাদ দিলে ট্রুথ কথাটা অর্থহীন।

রিয়েল অর্থে যে সত্য, সে আছে। আমাদের অব্যবহিত চেতনায় আছে মানেই হ'লো দেশে-কালে আছে। সাহিত্য-নামধেয় যে-বস্তুটি সৃষ্ট হ'লো, একটি কবিতা কি একটি নাটক, — সে কি যথার্থই বাস্তবিক? বস্তু হিসাবে তার অধিষ্ঠান কোথায়? 'মিথ্যাবাদী' হোমার ভাষার ইন্দ্রজাল দিয়ে যে-কল্প-জগৎকে গ'ড়ে তুললেন, সে ভূগোল-ইতিহাসের মাধ্যাকর্ষণের বাইরে, সে কোথায় আছে? ঠিক সেই অর্থে তাকে সত্য বলা চলে কি, যে-অর্থে গ্রীস দেশটা সত্য, গ্রীকদের ইতিহাসটা সত্য?

যে-সীতা কখনো ছিলো না তাকে হরণ করলো সেই রাবণ যে কখনো ছিলো না, নিয়ে গেলো সেই স্বর্ণলঙ্কায় যে-স্বর্ণলঙ্কা কোথাও নেই, কোথাও ছিলো না। একটা গোটা জগৎ মন্ত্রবলে গ'ড়ে উঠলো। তারপর সেই মন্ত্রের জগৎ আমাদের চোখে-দেখা বাস্তবকে মলিন ক'রে দিলো তার উজ্জ্বল প্রত্যক্ষতা দিয়ে। ঔজ্জ্বল্যই যদি থাকার মাপকাঠি হ'তো, তাহ'লে একে সত্য বলতে দ্বিধার কিছু ছিলো না। কিন্তু থাকার সরল সুপরিচিত মাপকাঠি দিয়ে যদি মাপি, তাহ'লে দীনতম পতঙ্গটিও যে-অর্থে সত্য সে-

অর্থে সে সত্য নয়। ছবির ফ্রেমটা যে-অর্থে আছে, ক্যানভাসটা যে-অর্থে আছে, ক্যানভাসের গায়ে রঙের ছোপগুলো যে-অর্থে আছে, ছবিটাও কি ঠিক সেই অর্থে ঠিক ততোখানি পরিমাণেই আছে? বইয়ের পাতাটা, পাতার গায়ে অক্ষরের দাগগুলো, পাঠ-নিরত আমি — যেভাবে দেশে-কালে সত্য, কবিতাটাও কি তাই? আমার পড়া নামক ঘটনাটা যে-অর্থে দেশে-কালে ঘটমান, কবিতাটাও কি সেই অর্থে দেশে-কালে ঘটমান?

সাহিত্যের জগৎ চতুর্মাত্রিক অস্তিত্বের জগৎ নয়। সে যেন সদসদ্‌বিলক্ষণ। থেকেও নেই, না-থেকেও আছে। এ যেন মায়ার জগৎ। দর্পণে প্রতিবিম্বিত অগ্নির মতো এতে দীপ্তি আছে, কিন্তু দাহ নেই। রূপ আছে, রক্তমাংস নেই। দেশ-কালকে স্পর্শ করে, কিন্তু দেশ-কালের আলিঙ্গনে ধরা দেয় না। অনেকটা স্বপ্নের মতো। কিন্তু অবিকল নয়। স্বপ্ন বাস্তবের দ্বারা বাধিত হয়, ভ্রান্তি বাস্তবের দ্বারা খণ্ডিত হয়। এ তা হয় না। বাস্তবের পাশাপাশি বিরাজ করে। স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নকে স্বপ্ন ব'লে জানি না। ভ্রান্তিকে ভ্রান্তি ব'লে জানলে তার শক্তি চ'লে যায়। এর ক্ষেত্রে উল্টো। আর্টকে আর্ট ব'লে না-জানলে, আর্টের মায়া-জগৎকে মায়া ব'লে না-জানলে তা আর আর্ট থাকে না। সাহিত্যকে জীবন ব'লে জানলে সে ব্যর্থ হ'লো। সাহিত্য জীবন নয়। সে স্বপ্নের মতো মিথ্যাও নয়, জীবনের মতো সত্যও নয়। একে কী বলবো?

বহুকাল পূর্বে প্লেটো এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর মতে অবশ্য দেশ-কালের বাস্তবও সত্য নয়, তার স্থান সত্য থেকে এক ধাপ নীচে। সাহিত্যের জগৎ সত্য থেকে দু-ধাপ নীচে। আসলে তা মিথ্যার জগৎ। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যশাস্ত্রীরা বলেছেন, দেশ-কাল-আনালিঙ্গিত এ-জগৎ লৌকিক সত্যের জগৎ নয়, এ-জগৎ অলৌকিক। অর্থাৎ মায়া, অতএব মিথ্যা। সাহিত্যর জগৎ যে মায়া-জগৎ তা রবীন্দ্রনাথও অস্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন, রূপের জাদু। দেশে-কালে অধিষ্ঠিত জগৎ যে-অর্থে সত্য, এই জাদুর জগৎ সে-অর্থে — ঠিক সেই অর্থে সত্য নয়। তবে কি মিথ্যা? জাদু বলতে তিনি আপত্তি করেননি, কিন্তু মিথ্যা বলতে তিনি আপত্তি করেছেন। দেশ-কালগত সত্তার কথা তিনি বলেননি, তিনি অন্যতর সত্যতার দাবি তুলেছেন।

সাহিত্যের জগৎটাকে তিনি বলেছেন, রূপের জগৎ। বিষয়ের নয়, রূপের। রূপটা রিয়ালিটির, কিন্তু হুবহু রিয়ালিটিরই নয়। সুবিন্যস্ত, সংহত, তীব্রতাপ্রাপ্ত — তার সুডৌল প্রত্যক্ষগোচরতা রিয়ালিটিকে ছাপিয়ে যায়। রূপের যে-ঐক্য রিয়ালিটিতে

বহুলতার ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে থাকে, সাহিত্য সেই রূপ-মহিমাকে অনাবৃত ক'রে দেয়। রূপের বহুলতা এখানে সুগভীর তাৎপর্যের ঐক্যে বিধৃত। যেখানে ঐক্য আছে, সুষমা আছে, সামঞ্জস্য আছে, সেখানে সত্যও আছে। রিয়ালিটিতে সে-সত্য প্রচ্ছন্ন। সাহিত্যে তা প্রকাশিত।

সাহিত্যের মায়া মিথ্যার মায়া নয়। যাকে জাদু বলি, সে কি রিয়ালিটিতেই কিছু কম? কোথায় জাদু নেই? সাহিত্যের জগৎটা যদি অলৌকিক হয়, তাহ'লে বাস্তব জগৎটাই বা অলৌকিক নয় কেন?

অলৌকিকতার এই ভাষ্যে অলৌকিকতাবাদীরা খুশি হবেন না। কিন্তু আসল কথা এখানে নয়। আসল কথা — রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবস্তুর সত্তার প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেলেন। এড়িয়ে গেলেন না-ব'লে বলা উচিত, অগ্রাহ্য করলেন। সঙ্গতভাবেই করলেন, কারণ সাহিত্যের বস্তুগত সত্তার প্রশ্নটা একান্তভাবেই দার্শনিকের প্রশ্ন। প্লেটোর যা নিয়ে দুশ্চিন্তা রবীন্দ্রনাথের তা নিয়ে কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। নেই এই জন্যে যে, রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের সত্যতা তার রূপে ও তাৎপর্যে, বস্তুসত্তায় নয়।

এ্যারিস্টট্‌ল-ও এ-প্রশ্নকে তেমন গুরুত্ব দেননি। প্লেটোর অভিযোগের প্রথম আধখানাকে — অর্থাৎ সাহিত্যের বস্তুগত মিথ্যার দিকটাকে তিনি নির্ভাবনায় মেনে নিয়েছেন। তাঁরও মতে সাহিত্যের সত্যতার উৎস বস্তুগত সত্তায় নয়, অন্যত্র। সে-সত্য এতই মূল্যবান যে তা সাহিত্যের বস্তুসত্তার অভাবের ক্ষতিপূরণই মাত্র করে না, প্রচুর উদ্‌বৃত্তও দিয়ে যায়। প্লেটোর অভিযোগ সেই সত্যের প্রসাদে সম্পূর্ণ খণ্ডিত হ'য়ে যায়। সেই অন্যতর সত্যটির পরিচয় কী? যদি সত্তাগত না হয়, তাহ'লে সেই সত্য কোন্ সত্য?

সাহিত্য কতোটা অস্তিত্বশীল, এ-প্রশ্ন সাহিত্যগত প্রশ্ন নয়। সাহিত্যের মূল্যকে তা স্পর্শ করে না। সাহিত্যতত্ত্বে এ-প্রশ্ন অবান্তর। সাহিত্যের ক্ষেত্রে পূর্বকথিত দ্বিতীয় প্রসঙ্গটাই সঙ্গত: সাহিত্য কতোটা সত্য কথা বলে।

সাহিত্যের জগৎকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — রূপের জগৎ। তার সত্যতা রূপের সত্যতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় — "শেষ কথা হচ্ছে Truth is beauty। কাব্যে এই ট্রুথ রূপের ট্রুথ,...।"[৪] কিন্তু রূপের সত্যতা অর্থ কী? এ-রূপ কিন্তু আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়, সাহিত্যে রূপের মধ্যে দিয়ে আরো-কিছু বলা হয় যা কেবল রূপ নয়, যা 'অরূপ'। তাই, "রূপকে মানতেও হবে, নাও মানতে হবে...।"[৫] সেই

জন্যেই রূপের সংযম মূল্যবান্। রূপের মধ্যে যার আবির্ভাব সেই রূপকে সার্থক করে। রূপ শেষ কথা নয়; তাকে ছাড়তেও হবে, ছাড়াতেও হবে। কেমন ক'রে? রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে বলেছেন — "...রূপের মধ্যে সত্যের আবির্ভাব হলে সত্য সেই রূপ থেকেই মুক্তি দেয়।"[৬] 'রূপের মধ্যে সত্যের আবির্ভাব' আর রূপের সত্যতা একই কথা। এ-রূপ তো জগতেরই রূপ, তাহ'লে রূপের সত্যতা অর্থ কি আক্ষরিক যথাযথতা? দর্পণের প্রতিবিম্ব যেমন মূলের রূপের আক্ষরিক যথাযথতা রক্ষা ক'রে সত্য হয়? সাহিত্য কি রিয়ালিটির প্রতিকৃতিরচনা, প্রতিবিম্ব-নির্মাণ, অনুকৃতি? বলা বাহুল্য, তা নয়। তার উপায়ও নেই, তার প্রয়োজনও নেই।

প্রথমত, রিয়ালিটির জটিল চলিষ্ণু সীমাহীন বহুলতার যথাযথ প্রতিবিম্ব রচনা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, যথাযথ প্রতিবিম্বে বা তার চেষ্টায় রিয়ালিটির অন্তর্নিহিত সুষমা ও ঐক্য ধরা পড়ে না, তার যথার্থ তাৎপর্যটাই বাদ প'ড়ে যায়। রূপের সত্য যদি রূপের যথাযথতাই হবে, তাহ'লে সাহিত্যে যে-পুনর্বিন্যাস ঘটে তার দ্বারা, সংহতির দ্বারা, তীব্রতার দ্বারা, অনুরাগের স্পর্শের দ্বারা সেই যথাযথতার হানি হবারই তো কথা। তা হয় না, সাহিত্যে সে-রূপ বরং আরো উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ যে-সত্যতার কথা বলেছেন, তা রূপের আক্ষরিক যথাযথতা নয়।

রবীন্দ্রনাথ যে 'কেবল-রূপের' কথাও বলেননি তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। কেবল-রূপ হ'লো অর্থহীন রূপ, নির্বিচার রূপ। রবীন্দ্রনাথ তার অর্থগত ঐক্যের উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। তাছাড়া, সাহিত্য যদি নিছক রূপেরই শোভাযাত্রা হবে, রূপের মধ্যে যদি গুণগত ভেদের অবকাশ না-ই থাকবে, তাহ'লে মহৎ সাহিত্যের সঙ্গে পদাতিক সাহিত্যের ভেদ করবো কী দিয়ে? সব রূপই তো রূপ, নিছক রূপ হিসাবে সবাই তুল্যমূল্য — তাহ'লে কোনো-কোনো সাহিত্যকে যে মহৎ বলি, তা নিশ্চয়ই মাত্র রূপের কারণে নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের এ-কথা স্মরণ করানো নিতান্তই বাহুল্য যে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মহৎ কীর্তিগুলিকে তাদের অগভীর ত্বক-পেলবতার জন্য শ্রদ্ধা জানাননি, শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাদের সুগভীর তাৎপর্যের জন্য। এ-তাৎপর্যকে নৈতিক তাৎপর্য বললে হয়তো একটু খাটো করা হয়, কিন্তু জীবনের তাৎপর্য বললে কিছু ভুল বলা হয় না।

রূপ যদি কেবল যথাযথই হ'তো, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথ 'অনুকরণ' কথাটিতে তেমন আপত্তি করতে পারতেন না। রূপ যদি শুধু রূপেরই হ'তো, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথ গোঁড়া ফর্মবাদীদের মতো কেবল রূপের কথাই বলতেন, সত্যের কথা বলতেন না।

রবীন্দ্রনাথ সেই রূপের কথাই বলেছেন যার মধ্যে দিয়ে জীবনের সুগভীর তাৎপর্য অভিব্যক্ত হয়। সৌষম্য সঙ্গতি ঐক্য — এ-ও সেই তাৎপর্যেরই ইঙ্গিত। তাৎপর্য জিনিসটা অস্তিত্বমাত্রের ধর্ম নয়। তাৎপর্য চেতনাগত, বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়ের সম্পর্কের বিশিষ্টতাতেই তাৎপর্যের সঞ্চার। এ-তাৎপর্যের মূল জীবন-যাপনের গভীরে। রূপ যখন কথা বলে, রূপ যখন অর্থ হ'য়ে ফুটে ওঠে, তখন সে আর নীরব অস্তিত্বমাত্র নয়। তখন সে বাণী। সাহিত্যে রূপের এই বাণীই — এই রূপবাণীই — সাহিত্যবাণী। সাহিত্যের সত্যতা। এই রূপবাণীর সত্যতা সাহিত্যের পক্ষে অন্য কোনোরকম সত্যতার দাবি অর্থহীন। সাহিত্যের সত্য হ'লো সাহিত্য-বাণীর সত্যতা, তার ট্রুথ।

অতঃপর সত্য কথাটাকে এখানে কেবল ট্রুথ অর্থেই ব্যবহার করবো। কিন্তু যথেচ্ছ প্রয়োগের ফলে ট্রুথ কথাটার অর্থও তার সুনির্দিষ্টতাকে অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে। ট্রুথ কাকে বলবো? তাৎপর্যের মতো ট্রুথ জিনিসটাও চেতনা-নিরপেক্ষ নয়। যা বিষয়ী-নিরপেক্ষ, সে থাকলে আছে না-থাকলে নেই — হয় সৎ না-হয় অসৎ, সেইখানেই শেষ। তার সম্পর্কে ট্রুথের কথা ওঠে না। ট্রুথ সত্তার নিজস্ব গুণ নয়, ট্রুথ বিষয়ীর ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে, ট্রুথ অর্থে সত্য হ'লো সত্য বচন, সত্য চিন্তা, সত্য জ্ঞান। সত্য জ্ঞান না-ব'লে শুধু জ্ঞান বলাই সঙ্গত, যাকে বলা হয়েছে প্রমা। এই জ্ঞানের পরিধি কতোদূর? এ কি শুধু বচন-সীমাতেই সীমাবদ্ধ? জ্ঞান কি শুধুই ডিস্‌কার্সিভ জ্ঞান? রবীন্দ্রনাথ তা মনে করেন না। সত্য শুধু বুদ্ধির অবধারণের সীমানাতেই সীমাবদ্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথ সত্যকে জ্ঞান বলেননি। বলেছেন, উপলব্ধি। বলেছেন — ভাব, অর্থাৎ হওয়া — হওয়ার মধ্যে দিয়ে জানা, যার নাম পাওয়া। এখানে আধুনিক সাহিত্য-শাস্ত্রীদের অনেকের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের মতের অমিল ঘটবে।

আধুনিক তত্ত্ববিদ্‌দের অনেকেই মনে করেন যে, বচন বা বাক্যই সত্যের একমাত্র প্রয়োগক্ষেত্র। অর্থাৎ সত্যতার দাবি (truth-claim) একমাত্র বাক্যের — বিশুদ্ধ বুদ্ধি-সৃষ্ট বাক্যের। পরীক্ষায় সে-দাবি টিঁকলে বাক্যটি সত্য, না-টিঁকলে তা মিথ্যা। পরীক্ষা সোজাসুজি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের পরীক্ষা। যার এই পরীক্ষাযোগ্যতা নেই, তা বচনই নয়। তার সম্পর্কে সত্যাসত্যের প্রশ্নই ওঠে না। রিচার্ড্‌স-প্রমুখ কোনো-কোনো সাহিত্যশাস্ত্রী সাহিত্যবাণীর সত্যতার দাবিকে সরাসরি অস্বীকার করেছেন। যা 'জ্ঞান' নয়, যা আবেগাত্মক, তার কোনো সত্য মিথ্যা নেই। তাঁদের মতে, সাহিত্যের কোনো বাণীই নেই। কেননা আবেগ বাক্য নয়। নয় এই জন্য যে, তার পরীক্ষা-যোগ্যতা নেই।

ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের পরীক্ষাই যে সত্যের চরম পরীক্ষা তা রবীন্দ্রনাথ মনে করেন না। এমন-কি বচনগত সত্যেরও যে এইটেই চরম মানদণ্ড সম্ভবত এ-কথাও তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত হবেন না। কিন্তু এখানে সে-প্রশ্নই ওঠে না। কারণ সাহিত্যের বাণী ন্যায়শাস্ত্রসম্মত বাক্য বা বচন নয়। নিতান্ত বচনগত 'জ্ঞান' সাহিত্যের লক্ষ্য নয়। তা যদি হ'তো — যেমন মারিতাঁ্যা বলেছেন — 'if art were a means of knowledge, it would be widely inferior to geometry।' সাহিত্যের কাছ থেকে আনন্দ ছাড়া আর কোনো প্রাপ্তি যদি আমাদের হয় তো তা সংকীর্ণ অর্থে 'নলেজ' নয়, তাকে বরং প্রজ্ঞা বললেও বলতে পারি। রবার্ট ফ্রস্ট বলেছেন, 'Poetry begins in delight and ends in wisdom'। এই কবিবাক্যকে সম্পূরণ ক'রে নিয়ে আমরাও বলতে পারি, আরম্ভে যা শেষেও তাই, সর্বত্রই প্রজ্ঞাঘন আনন্দ। 'বাচনিক জ্ঞান' কোথাও তার নাগাল পায় না।

যে-ট্রুথের অর্থ বচনগত সত্যতা, সাহিত্যের সত্য সেই জাতীয় ট্রুথ নয়। বচনের একমাত্র লক্ষ্য তথ্যপ্রকাশ। তথ্য সাহিত্যের লক্ষ্য নয়। সাহিত্যের লক্ষ্য এমন একটা-কিছুর প্রকাশ যা আরো অনেক ব্যাপক, অনেক গভীর, অনেক ব্যঞ্জনাময়। এবং অনেক মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথ যাকে ট্রুথ বলেছেন, পরীক্ষাপন্থীরা তাকে ট্রুথ বলবেন না। এ-মতবিরোধ চূড়ান্ত। চূড়ান্ত — কিন্তু অনেকখানি পরিমাণে নাম-ঘটিত।

রবীন্দ্রনাথ যাকে সাহিত্যের সত্য বলেছেন তার গ্রহণযোগ্যতার দাবি উপলব্ধির কাছে। উপলব্ধি শুধু ইন্দ্রিয়জ্ঞান নয় — শুধু দৃষ্টি নয়, দৃষ্টি এবং বোধ। তাৎপর্যের বোধ, মূল্যের বোধ, বিষয় ও বিষয়ীর এক হ'য়ে যাওয়ার বোধ। এমন এক সুপরিব্যাপ্ত ঐক্যের বোধ, এমন এক সশরীরী সমগ্রতার বোধ — এমন জীবন্ত জ্বলন্ত অনন্য বোধ যে তা কখনো বাক্যে অনূদিত হ'তে পারে না। বাক্যের — বুদ্ধি-সৃষ্ট বচনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। 'মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে।' 'মানবের জীর্ণ বাক্যে'র সম্পত্তি যে শীর্ণ ট্রুথ, তার প্রতি সাহিত্যের কোনো লোভ নেই।

বলা বাহুল্য, সাহিত্যদেহ বাক্য দিয়েই গড়া। সেই সব বাক্যের কেউ সত্য, কেউ মিথ্যা। কেউ বাচ্যার্থে আবদ্ধ, কারো ব্যঞ্জনা দূর-প্রসারী। কিন্তু তারা সম্পূর্ণভাবে পরস্পরনির্ভর, সাহিত্যে তাদের কারো কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তারা সমগ্রে সমর্পিত। তাদের সমস্ত নিজস্বতা, সমস্ত সত্যতা মিথ্যাত্ব সবই সমগ্রের মধ্যে গ'লে মিশে একাকার হ'য়ে যায়। সাহিত্যের বাণী সেই সমগ্রের বাণী। সেটা বাক্য

নয়। 'আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে' গ'ড়ে-তোলা সে এক আশ্চর্য 'মানসী-প্রতিমা'।

কিসের প্রতিমা? হৃদয়ের জগতের। কিন্তু প্রতিমা কেমন ক'রে বাণী হয়? প্রতিমা কেমন ক'রে ভাষা হয়? হয়, যদি ভাষা কথাটাকে ব্যঞ্জনার্থে গ্রহণ করি। ভ্রূবিলাস গ্রীবাভঙ্গী যে-অর্থে ভাষা, ছবি যে-অর্থে ভাষা, গান যে-অর্থে ভাষা, সাহিত্যের বাণী-প্রতিমাকে সেই অর্থে ভাষা বলতে বাধা কোথায়? "ভাষা ও ছন্দ" কবিতায় বাল্মীকির মুখে এই ভাষার প্রশস্তির কথা আমরা শুনেছি: 'প্রভাতের শুভ্র ভাষা বাক্যহীন প্রত্যক্ষ কিরণ', 'যামিনীর শান্তিবাণী...বাক্যহীন পরম নিষেধ', 'নক্ষত্রের ধ্রুব ভাষ অনির্বাণ অনলের কণা'। এ-ভাষা সংকেতের ভাষা, কিন্তু তা প্রত্যক্ষ। 'সেই মত প্রত্যক্ষ প্রকাশ কোথা মানবের বাক্যে?' সাহিত্যে মানসী-প্রতিমার ভাষা সেই প্রত্যক্ষ-প্রকাশের ভাষা।

সাহিত্যের ভাষা সংকেতধর্মী। কিন্তু সে-সংকেত রূপময়: প্রত্যক্ষ-প্রকাশই তার স্বলক্ষণ। এ হ'লো রূপের সাংকেতিকতা। যে-রসিক এই রূপের সংকেতকে চিনতে পারে, এ শুধু তার কানেই কথা বলে। অপরের কাছে নীরব। শুধু সাহিত্য নয়, সমস্ত আর্টের ভাষাই এই প্রত্যক্ষ-প্রকাশের ভাষা। এর খানিকটা পরিচয় রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই দিতে চেষ্টা করছি। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের "মন্দির"-শীর্ষক রচনার (র।১৪।৭৫২) গোড়ার দিকটা স্মরণ করা যাক।—

"উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দির যখন প্রথম দেখিলাম তখন মনে হইল, একটা যেন কী নূতন গ্রন্থ পাঠ করিলাম। বেশ বুঝিলাম, এই পাথরগুলির মধ্যে কথা আছে...।

"ঋক্‌রচয়িতা ঋষি ছন্দে মন্ত্ররচনা করিয়া গিয়াছেন; এই মন্দিরও পাথরের মন্ত্র; হৃদয়ের কথা দৃষ্টিগোচর হইয়া আকাশ জুড়িয়া দাঁড়াইয়াছে।...

"এই দেবালয়শ্রেণী তাহার নিগূঢ় নিহিত নিস্তব্ধ চিত্তশক্তির দ্বারা দর্শকের অন্তঃকরণে সহসা যে ভাবান্দোলন উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিল, তাহার আকস্মিকতা, তাহার সমগ্রতা, তাহার বিপুলতা, তাহার অপূর্বত্ব প্রবন্ধে প্রকাশ করা কঠিন — বিশ্লেষণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মানুষের ভাষা এইখানে পাথরের কাছে হার মানে; পাথরকে পরে পরে বাক্য গাঁথিতে হয় না, সে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে না, কিন্তু যাহা-কিছু বলে সমস্ত একসঙ্গে বলে, এক পলকেই সে সমস্ত মনকে অধিকার করে...।"[৭]

এ-কথা সাহিত্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য। যদিও সাহিত্যকে পরে-পরে বাক্য গাঁথতে হয়, কিন্তু সমগ্রতার মধ্যে তারা পরে-পরে দাঁড়িয়ে থাকে না, এক হ'য়ে যায়। সেই

সমগ্রতা হয়তো 'স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে না', কিন্তু একসঙ্গে 'সমস্ত মনকে অধিকার করে'।

সাহিত্যের সত্য কী এবং কী নয়, এইবারে সেই হিসাবটা একটু গুছিয়ে নেওয়া যাক। প্রথমত, তা সাহিত্যের অর্থাৎ নাটক উপন্যাস কবিতার সত্তা-ঘটিত নয়। তা বস্তুগত নয়, বাণীগত। দ্বিতীয়ত, তা বিশিষ্ট বা সংকীর্ণ অর্থে জ্ঞান নয়। তৃতীয়ত, তা সাহিত্যদেহের অন্তর্গত বা সাহিত্যদেহে পরিব্যাপ্ত কোনো বচন বা বচন-পরম্পরা নয়। তথ্য নয়।

সাহিত্যের বাণী সংকেতের বাণী। সে-সংকেত রূপের সংকেত। রূপটা জগতের — বলা বাহুল্য 'হৃদয়ের জগতের'। সে-রূপ মানবিক তাৎপর্যের সূত্রে গ্রথিত। এই তাৎপর্যের পিছনে মানুষের মূল্যবোধ ক্রিয়াশীল। এই মূল্যবোধের উৎস — শেষ পর্যন্ত — জীবন। সাহিত্যের সত্যের সঙ্গে মূল্যবোধ ও জীবনবোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।[৮]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ।"[৯] কথাটাকে একটু বদলে নিয়ে অনায়াসে বলা চলে যে, "তথ্যের মধ্যে মূল্যের প্রকাশ — ভ্যালু-র প্রকাশ, এই হ'লো যথার্থ প্রকাশ। কিন্তু সে-ভ্যালু তত্ত্ব নয়। বিশিষ্ট, মূর্ত, প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ সাহিত্যের সত্য হ'লো — তথ্য রূপ আর মূল্যের এক আশ্চর্য সমন্বয়। এমন এক সজীব ঐক্য যার মধ্যে এদের কাউকে আর আলাদা ক'রে চেনা যায় না। এই সমগ্রতাই সাহিত্য। তার বাণীকে এবং সেই বাণীর সত্যকে পৃথক্ করা যায় না। সাহিত্য সত্তা আর তার মূল্যকে অভিন্নভাবে প্রকাশ করে। সাহিত্য সত্তা ও সত্যের যুগনদ্ধ রূপ।

সমগ্রতা কথাটার মধ্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের সত্য-ভাবনার মূল তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাচ্ছি। যা-কিছু খণ্ডিত, যা-কিছু অবচ্ছিন্ন বা abstract, তা ঠিক সেই পরিমাণে অসত্য যে-পরিমাণে সে খণ্ডিত, যে-পরিমাণে সে অবচ্ছিন্ন। বিশ্বের কোনো-কিছুই বিচ্ছিন্ন নয়, বিশ্লিষ্ট নয়, সব-কিছুই অপর সব-কিছুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে ঐক্যবদ্ধ। সত্য হ'লো জীবন্ত মূর্ত অনবচ্ছিন্ন সমগ্রতা।

রবীন্দ্রনাথ সত্যের তিনরকম দাবিদারের কথা বলেছেন। শিথিল ভাষা-ব্যবহারে তাদের তিন ক্ষেত্রের তিনটিকেই সত্য বলি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্য তাদের একটিই। অপর দুটিকে বরং তথ্য বলা চলে, সত্য নয়।

এদের একটি হ'লো আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রের সত্য। প্রাণধারণের তাগিদ আমাদের দৃষ্টিকে যে-একটা সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখে, বিষয়কে

সেই যখন সীমানার মধ্যে দেখি, তখন তার একটা তির্যক বিকৃত রূপকেই মাত্র দেখতে পাই। কেননা সে-দেখা স্বার্থসম্পর্কের ফ্রেমের মধ্যে আটকে নিয়ে দেখা, লাভক্ষতির ঘোলাটে চশমার মধ্যে দিয়ে দেখা। তখন বিষয়ের যে-রূপটা আমরা দেখতে পাই তা আমাদেরই আসক্তির ছাঁচে-গড়া রূপ। সমগ্রতা-অভিমুখী তার যে নিত্য রূপ, সেটা ঢাকা প'ড়ে যায়।

সত্যের আর-এক দাবিদার বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের সত্য নীরক্ত নিরুত্তাপ নৈর্ব্যক্তিক সত্য — অমূর্ত অবচ্ছিন্ন সত্য। সে-ও সমগ্র নয়, অতএব জীবন্ত নয়। বিজ্ঞানের দেখা নিছক জ্ঞানের দেখা, জ্ঞান-অনুভব-বাসনা-সমন্বিত উপলব্ধির দেখা নয়। 'হৃদা মনীষা মনসা' উপলব্ধি করা নয়। যা অবিশ্লেষ্য তাকে চিরে-চিরে দেখা। বিষয়কে মানব-সম্পর্কের বাইরে ফেলে দেখা।— তাৎপর্যের জগৎ থেকে, মূল্যের জগৎ থেকে সরিয়ে ফেলে দেখা। বিষয়কে তার প্রাণের ভূমি থেকে উপড়ে নিয়ে বীক্ষণাগারের মরা-আলোয় দেখা। এ-ও সত্যদৃষ্টি নয়।

আরো-এক দেখা আছে। মানব-উপলব্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নয়, মূল্যের ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত ক'রে নয়, কোনো কৃত্রিম সীমানা টেনে দিয়ে নয়, দেয়াল ফ্রেম গণ্ডী সমস্ত ভেঙে দিয়ে, সমস্ত ছদ্ম-আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে — বিষয়কে সত্তা ও চৈতন্যের মহাসমগ্রতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অসীমের মধ্যে দেখা'। ব্যবহারিক দৃষ্টি যেমন একটা বিশিষ্ট-দৃষ্টি, বিজ্ঞানের দৃষ্টি যেমন বিশিষ্ট-দৃষ্টি, এ-দৃষ্টি তেমনি তৃতীয় কোনো বিশিষ্ট-দৃষ্টি নয়। এ হ'লো আমাদের সত্তার সমগ্র দৃষ্টি। এ-দৃষ্টি বিশিষ্ট-দৃষ্টিকে খণ্ডন করে না, নিজের মধ্যে সমীকৃত করে। তাই সাহিত্যে তথ্য খণ্ডিত হয় না। তথ্যের পাত্রেই সত্য প্রকাশিত হয়। এ-দৃষ্টি ব্যক্তিগত হ'য়েও সর্বজনীন। এ-দৃষ্টি নিরাসক্ত অথচ ভালোবাসায় উদ্দীপিত। এর সামনে অবচ্ছিন্নতা ঘুচে যায়, ছদ্মবেশ খ'সে পড়ে, বিষয়ের 'আবরণ-ভঙ্গ' হয়। জগৎ সংসারের সঙ্গে তার ঐক্য প্রকাশিত হয়।

তথাকথিত বাস্তবে এই ঐক্য অপ্রকাশ থাকে ; সাহিত্যে তার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটে। ইতিহাসের রামের থেকে এই কারণেই বাল্মীকির ধ্যানদৃষ্টির রামচন্দ্র সত্যতর। রাম নামে কেউ না-থাকলেও ক্ষতি ছিলো না। রামায়ণের মর্মগত সত্যতার তাতে হানি ঘটতো না। বাল্মীকির রাম কোনো তথ্যবিশেষের প্রতিকৃতি নয়। রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র যে-মানব-উপলব্ধির প্রতীক, উপলব্ধির জগৎ-ই তার সত্যতার মানদণ্ড। হৃদয়ের জগতের বাইরে আর-কোথাও তার সমর্থনও নেই, খণ্ডনও নেই।

'হৃদয়ের জগৎ' ব্যাপারটা ঠিক কি? রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই এ-কথার উত্তর দেওয়া যাক।—

"বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর-একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে।...হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষ-রূপে আপনার করিয়া লই।"[১০]

মনের মধ্যের এই জগৎটাই হৃদয়ের জগৎ। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, মনের মধ্যে এ-জগৎ আপনা-থেকে গজিয়ে ওঠেনি।—

"নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত,
... ...
বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত স্বরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।"[১১]

'বাহিরের জগৎ'ই মনের মধ্যে এসে 'হৃদয়ের জগৎ' হ'য়ে উঠেছে। এ হ'লো স্বী-কৃত জগৎ। কিন্তু যে-মন স্বীকার ক'রে নিলো, সে-ই বা কী?—

"আমি আছি এবং আর-সমস্ত আছে, আমার অস্তিত্বের মধ্যে এই যুগল-মিলন।... আমি আছি এবং না-আমি আছে, এই দুই নিরন্তর ধারা আমার মধ্যে ক্রমাগতই একীভূত হয়ে আমাকে সৃষ্টি করে চলেছে...।"[১২]

তাছাড়া, এ-জগৎ কার মনের মধ্যের জগৎ? কোনো একলা মানুষের প্রাইভেট জগৎ নয়, সব মানুষের — সমগ্র মানবতার মনের জগৎ। তাই রবীন্দ্রনাথ কখনো একে বলেছেন মানুষের জগৎ, কখনো বলেছেন মানব-বিশ্ব, কখনো বলেছেন — বিশ্বমানবমনের জগৎ।

সাহিত্য শুধু হৃদয়ের প্রকাশ নয়, হৃদয়ের জগতের প্রকাশ। জগতের প্রকাশ বললেই কি খুব ভুল হবে? 'জগৎ' এবং 'হৃদয়ের জগৎ' এরা কি একান্তই পৃথক? বহির্জগৎ-ই হৃদয়ের মধ্যে এসে হৃদয়ের জগৎ হয় এবং হৃদয়ের মধ্যেই বহির্জগৎকে পাই, অন্যত্র নয়। "বস্তুত বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।"[১৩]

সাহিত্য বহিঃপ্রকৃতি ও মানবচরিত্রের ভাবমূর্তি। মানবচরিত্র যেহেতু প্রকৃতিরই

অঙ্গ, সেই হেতু এ-কথা সঙ্গতভাবেই বলা চলে যে, সাহিত্য প্রকৃতিরই প্রকাশ — জগৎ ও জীবনেরই মানসী প্রতিমা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, মন প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করে, আর সাহিত্য মন থেকে সঞ্চয় করে। যদি সরাসরি প্রকৃতি থেকে আহরণ করতো, যদি মানসী-প্রতিমা না হ'য়ে শুধু প্রতিকৃতিই হ'তো, তাহ'লে হয়তো একে অনুকরণই বলা চলতো। কিন্তু মাঝখানে রয়েছে মন। রবীন্দ্রনাথের কথায় "প্রকৃতি হইতে মনে ও মন হইতে সাহিত্যে যাহা প্রতিফলিত হইয়া উঠে তাহা অনুকরণ হইতে বহুদূরবর্তী।"[১৪] দূরবর্তী হ'তে পারে, কিন্তু নিঃসম্পর্কিত নয়। মাঝখানে একটি মাত্র ধাপ, হৃদয়। ধাপটা গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ধাপে প্রকৃতির মর্মসত্যের কিছু বদল ঘটে কি? ঘটবার কথা নয়, কারণ একমাত্র হৃদয়ই তো প্রকৃতির মর্মসত্যকে চিনতে পারে। তাছাড়া, মানব-হৃদয়ে প্রতিফলিত নয়, এমন প্রকৃতির সন্ধান কে জানে? আমাদের দেখার বাইরে প্রকৃতির কোনো 'রূপ' আছে কি? তেমন প্রকৃতি আমাদের পক্ষে একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব ছাড়া আর কী?

কবিদৃষ্টি যদি সত্যিই সত্যদৃষ্টি হয়, যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাহ'লে, হৃদয়ের মধ্যে যে-রূপটা ধরা পড়ে সেইটেই প্রকৃতির সত্যতম রূপ। কবির কাব্যে যদি 'হৃদয়ের জগতে'র মর্মসত্যটা সত্যিই ধরা প'ড়ে থাকে, তাহ'লে তার মধ্যে তথাকথিত বহির্জগতের সত্যটাও অবশ্যই ধরা পড়বে। কারণ সত্য তো আর দুটো নয়, একটাই। সন্দেহ নেই, সাহিত্য অনুকরণ থেকে দূরবর্তী; কারণ প্রকৃতি সম্পূর্ণ অননুকরণীয়। দূরবর্তী, কারণ সাহিত্যের বাণী — বাণী ব'লেই — প্রতীকধর্মী, অনুকরণধর্মী নয়। তার সত্যতা প্রত্যক্ষ সাংকেতিকতায়; এ-সত্যতা প্রতীকের সত্যতার সমগোত্রের।[১৫]

কিন্তু প্রতীকও প্রতীকায়িতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। রবীন্দ্রনাথ অনুকরণ কথাটায় আপত্তি করেছেন, কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে রিয়ালিটির নিত্য-সংযোগের কথা তিনি অস্বীকার করেননি। অনুকরণবাদী এ্যারিস্টট্‌ল-ও কিন্তু এর থেকে খুব বেশি দাবি করেননি। সংগীতকে যখন তিনি প্রকৃতির অনুকরণ ব'লে — অত্যুত্তম অনুকরণ ব'লে — গণ্য করেন, তখন বুঝতে হবে অনুকরণ কথাটা তাঁর কাছে নিতান্তই একটা পারিভাষিক শব্দ। কাব্যকে তিনি ইতিহাসের থেকে মহার্ঘতর মনে করেন, যা ঘটেছে তার হুবহু বর্ণনার থেকে, যা ঘটতে পারে তাকে তিনি সাহিত্যে বেশি মূল্য দিতে প্রস্তুত। রবীন্দ্রনাথের মতো এ্যারিস্টট্‌লের কাছেও ইতিহাসের রামের থেকে বাল্মীকির মনোভূমির রাম সত্যতর। তাহ'লে এ-কথা কি ভাবতে পারি না যে, রবীন্দ্রনাথ যাকে সত্য ব'লে আখ্যা দিয়েছেন, এ্যারিস্টট্‌ল তাকেই অনুকরণ ব'লে

অভিহিত করেছেন? দুয়েরই মাপকাঠি যখন জীবনের স্বাক্ষর, তখন — এমন-কি হ'তে পারে না যে, অভিধা দুটো ভিন্ন হ'লেও, অভিধেয় প্রায় একই বস্তু?

বস্তুত সত্যকে রাখতে হ'লে রিয়ালিটির অধিকারকে স্বীকার ক'রে নিতেই হবে। হয়তো সে-রিয়ালিটি মানবিক রিয়ালিটি। হয়তো কেন, নিশ্চিতই — তাই স্বাভাবিক মানবিক রিয়ালিটিই মানুষের কাছে একমাত্র রিয়ালিটি, অপর-কিছুর পরিচয় মানুষের জানা নেই। আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনায় এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে-দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত হয়েছে তা সকলেরই সুবিদিত। মানুষের কাছে জগৎ-ও মানবিক, সত্যও মানবিক। মানবিক জগৎ মানেই হৃদয়ের জগৎ। আসলে জগৎ দুটো নয়, জগৎ একটাই। হৃদয় দিয়ে তাকে গ্রহণ করি, উপলব্ধিতে তাকে স্বীকার করি, ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে সে হ'য়ে-ওঠে, তাই তাকে বলি হৃদয়ের জগৎ।

এই মানবিক রিয়ালিটিরই নাম জীবন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "জীবন মহাশিল্পী। সে যুগে যুগে দেশে দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলছে।··· জীবনের এই সৃষ্টিকার্য যদি সাহিত্যে যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে পারে তবেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে।"[১৬]

সাহিত্যের উপর জগৎ ও জীবনের অধিকারের কথা এর থেকে স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আর কীভাবে বলা চলতো? তিনি বলেছেন, সাহিত্যে "যেখানে জীবনের স্বহস্তের পরিবেশন, সেখানে রসের বিকৃতি নেই।···যেখানে জীবনশিল্পীর নৈপুণ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেখানে মৃত্যুর প্রবেশদ্বার রুদ্ধ।"[১৭] সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছেন, "এই হল স্বয়ং জীবনের কল্পিত ছবি।"[১৮] বলেছেন, "আশ্চর্য মানুষের অমর কীর্তি জীবনের চিরস্বাক্ষরিত।"[১৯]

উক্তিগুলি সরল ও স্বচ্ছ; কোনো নিগূঢ় ব্যাখ্যার অবকাশ রাখেনি। অতঃপর নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে সত্য জীবনেরই সত্য, আমাদের সুপরিচিত সত্য। জীবন সাহিত্যের অনুকরণের আদর্শ নয় বটে, কিন্তু সে-ই সাহিত্যের মৌল উদ্‌বেজক, সে-ই সাহিত্যের উপাদান, সাহিত্যের সামগ্রী। এবং সে-ই সাহিত্য-রূপের চরম নিয়ামক। জীবনই সত্যের উৎস।

এইবারে আমরা আবার সেই পুরানো প্রসঙ্গে ফিরে আসতে পারি: লীলা আর সত্যের সঙ্গতির প্রসঙ্গ। সাহিত্য যদি সত্যিই রিয়ালিটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহ'লে আর তার মধ্যে স্রষ্টার সত্যিকারের মুক্তির অবকাশ কোথায়? সাহিত্যকে যদি কোনো-রকম বাইরের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার ক'রে নিতে হয়, তাহ'লে আর লীলা বলবো তাকে কোন্ জোরে? বলতে পারি, নিয়ন্ত্রণটা যদি বাইরের না হয়। বলতে পারি, লীলা আর সত্য

দুই-ই যদি এক হয়; সত্যলাভই যদি মানুষের মুক্তিলাভের পথ হয়। লীলা যদি জীবনেরই স্বধর্ম হয়। এই উত্তরই রবীন্দ্রনাথের উত্তর। আমি আর না-আমি যুগলে মিলিত: এই যুগনদ্ধ রূপই সাহিত্যরূপ। স্রষ্টা আর রিয়ালিটি পৃথক্ নয়। রিয়ালিটির নিয়ন্ত্রণ স্রষ্টারই আত্মনিয়ন্ত্রণ। তারই নাম মুক্তি, তাকেই বলি লীলা।

সাহিত্য হ'লো 'সহিত-ত্ব', যার অর্থ মিলন। কার সঙ্গে কার মিলন? ভামহ বলেছেন, শব্দের সঙ্গে অর্থের। ওটা বাহ্য। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সকলের সঙ্গে সকলের। গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্য যে-মিলনে, সাহিত্য সেই মিলনেরই আনন্দরূপ। সেই আনন্দের মধ্যে বিশ্বের মানবরূপ ও মানুষের বিশ্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। মিলনের পিছনে মিলনের আনন্দ ছাড়া যখন আর কোনো ফলাকাঙ্ক্ষা নেই তখন একে লীলা ছাড়া আর কী বলা যায়? এই অহেতুক আনন্দই মানুষের স্বধর্ম, জীবনের স্বধর্ম। স্বধর্মপালনেই মানুষের সত্যলাভ, স্বধর্মপালনেই তার মুক্তি।

অনেকের কাছেই এ-সমাধান সন্তোষজনক ব'লে মনে হবে না। আসলে এটা সমাধানই নয়। তার কারণ এতে সমস্যাটাকেই অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু যাঁর কাছে জীবনই লীলাময়. যিনি বিশ্বাস করেন যে, সত্যই লীলা, লীলাই সত্য, তাঁর কাছে এখানে আদৌ কোনো সমস্যা নেই।

পাশ্চাত্য লীলাবাদীরা সাধারণত অতোদূর যেতে ইচ্ছুক নন। তাঁদের কাছে এটা দুরূহ উভয়-সংকট। হয় তাদের বলতে হবে, সাহিত্য সত্য-অসত্যের ধার ধারে না। যেমন ইস্থেট্‌রা বলেছেন। অথবা আধুনিককালে যেমন রিচার্ড্‌সরা ব'লে থাকেন। আর না-হয় তাঁদের বলতে হবে, কবিরা সত্যদ্রষ্টা, সত্যস্রষ্টা নন। এবং কাব্য সেই দৃষ্ট-সত্যেরই প্রকাশ। যেমন রিয়ালিস্টরা বলেন। প্রথম বিকল্পে সাহিত্যের গৌরবহানি। দ্বিতীয়তে রোমান্টিকতার গৌরবহানি। দুই কূল রক্ষার মানসে কেউ-কেউ এক তৃতীয় পন্থাও অবলম্বন করেন। সে হ'লো শ্রুতিমধুর অস্পষ্টতার ধূম্রজাল রচনা, গম্ভীর অর্থহীনতার বাগাড়ম্বর। তাতে সত্য, সাহিত্য এবং রোমান্টিকতা তিনেরই গৌরবহানি।

ভারতীয় লীলাবাদ স্রষ্টা ও সৃষ্টির, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদাভেদকে এমন রমণীয়ভাবে একাকার ক'রে দিয়েছে যে, পাশ্চাত্য রোমন্টিসিস্টদের কাছে যা ছিলো দুস্তর সংকট, রবীন্দ্রনাথের কাছে তা-ই হয়েছে স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গের উল্লাস। রোমান্টিসিস্টদের কেউ-কেউ অবশ্য শেলিং অথবা হেগেলের হাত ধ'রে সংকট পার হ'তে চেষ্টা করেছেন। তাতে সংকটের সুরাহা যদি-বা হয়, সাহিত্যের শেষরক্ষা হয় কিনা বলা কঠিন। সে যা-ই হোক, ঔপনিষদিক মিস্টিকতায় উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের আমি ও না-আমির

ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌ দৃষ্টি ও সৃষ্টির যে-অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বে গিয়ে উপনীত হয়েছে, সেখানে সাহিত্যতত্ত্বের কোনো সমস্যাই আর সমস্যা নয়।

সহজেই মনে হ'তে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের এই উত্তর একটি বিশেষ পরাতত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেই পরাতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যই কঠিন এই সমস্যাটির সমাধানকে এমন অভাবিতরকমের সরল ক'রে দিয়েছে। কিন্তু এই পরাতত্ত্ব সম্পর্কে যদি আমরা নিঃসংশয় হ'তে না পারি? রবীন্দ্রনাথের নিবিড় ঐক্যতত্ত্বকে যদি আমরা গ্রহণ না করি? তাহ'লে কি লীলা আর সত্যের জোড় খুলে যায়? তাহ'লে কি ওদের যে-কোনো একটাকে আমাদের ছাড়তেই হয়? অথবা — এমন কি হ'তে পারে না যে, রবীন্দ্রনাথের পরাতত্ত্বকে বাদ দিয়েও, আধ্যাত্মিক ভাবপরিমণ্ডলের বিশিষ্টতা থেকে সরিয়ে এনেও, সত্য আর মুক্তিকে মেলানো যায় — মানুষের স্বভাবের মধ্যেই তাদের সমন্বিত করা যায়?

বিষয়টি চিত্তাকর্ষক। কিন্তু এখানে সে-আলোচনার অবকাশ নেই। কেননা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ভাবনার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ নেই।

১. "ভূমিকা", 'সাহিত্যের পথে', র। ১৪। ২৯২

২. "তথ্য ও সত্য", 'সাহিত্যের পথে', র। ১৪। ৩১২

৩. "ভূমিকা" ,'সাহিত্যের পথে'

৪. "সাহিত্যের স্বরূপ", 'সাহিত্যের স্বরূপ', র। ১৪। ৫১১

৬-৫. "সৃষ্টি", 'সাহিত্যের পথে', র। ১৪। ৩২৩

৭. এই সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞানদৃষ্টি সুজান ল্যাঙ্গারের শিল্পতত্ত্বের একটি মুখ্য প্রত্যয়। রবীন্দ্রনাথের এইসব উক্তি সুজান ল্যাঙ্গারের বহু পূর্বগামী। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য একে জ্ঞান বলেননি। নিছক জ্ঞান তাঁর মতে একটা abstraction মাত্র। ক্ষেত্রবিশেষে তিনি একে বলেছেন, ভাব অর্থাৎ হ'য়ে-ওঠা। রবীন্দ্রনাথের মতে এ হ'লো সম্যক্-দৃষ্টি, জ্ঞান-অনুভূতি-বাসনা-সমন্বিত যে-উপলব্ধি, তার সমগ্র-দৃষ্টি।

৮. শুধু সাহিত্যের সত্য নয়, ভাবতীয় মতে সমস্ত সত্যই। ভারতীয় চিন্তায় সত্য এবং মূল্য অচ্ছেদ্য। মনু থেকে মহাভারত আমাদের সকল শাস্ত্রেই এ-কথার সমর্থন মিলবে। সত্য এবং ঋত আমাদের কাছে এক। অল্প বয়সে, পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাবে, রবীন্দ্রনাথ এক সময় বাক্যের যাথার্থ্যকেই সত্য ব'লে বিবেচনা ক'বে বঙ্কিমচন্দ্রের সত্য সম্পর্কিত ধারণার প্রতিবাদ করেছিলেন। সে আজ ইতিহাসের কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পবিণত চিন্তায় সত্য প্রায় সব সময়ই একটি ভারতীয় প্রত্যয়, ইংরেজি ট্রুথ কথাটাব অনুবাদ নয়।

৯. "তথ্য ও সত্য", 'সাহিত্যের পথে', র। ১৪। ৩১৫

১০. "সাহিত্যেব তাৎপর্য", 'সাহিত্য', ব। ১৩। ৭৩৭

১১. "উপহার", 'মানসী', র। ১। ২১৭

১২. "সাহিত্যতত্ত্ব", 'সাহিত্যেব পথে', র। ১৪। ৩৫২-৩

১৩. "সাহিত্যের তাৎপর্য", 'সাহিত্য', র। ১৩। ৭৩৯

১৪. "সাহিত্যের বিচাবক", 'সাহিত্য', র। ১৩। ৭৪৬

১৫. এ-প্রসঙ্গে আর্নস্ট কেসিরের-এর বিভিন্ন আলোচনা স্মরণীয়। কেসিরের মনে করেন আমাদের 'হৃদয়েব জগৎ'-টা পুবোপুরিই প্রতীকের জগৎ, মানুষের জানা কখনোই তার বাইরে যেতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের জগতের প্রতীকধর্মিতার সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু বলেননি। আর্টের প্রতীকধর্মিতার সম্পর্কে বিশদ আলোচনাব জন্য সুজান ল্যাঙ্গাবেব গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য।

১৬. "সাহিত্যের মূল্য", 'সাহিত্যের স্বরূপ', র। ১৪। ৫৩৩

১৭. "সাহিত্যের চিত্রবিভাগ", 'সাহিত্যেব স্বরূপ', র ১৪। ৫৩৪-৫

১৮. তদেব, র। ১৪। ৫৩৪

১৯. তদেব, র। ১৪ ৫৩৬

সৌন্দর্য সামঞ্জস্য আনন্দ

'সাহিত্যের পথে' বইটি প্রথম প্রকাশের সময় (১৯৩৬) রবীন্দ্রনাথ পত্রাকারে তার যে-ভূমিকাটি লিখেছিলেন (অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি, ৮ই আশ্বিন ১৩৪৩) তাতে তিনি সৌন্দর্য সম্পর্কে নিজের ধারণার একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেন।—

"একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলেম, সৌন্দর্যরচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাঁড়ুদত্তকে সুন্দর বলা যায় না — সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেল না।

"তখন মনে এল, এতদিন যা উল্টো করে বলছিলুম তাই সোজা করে বলার দরকার। বলতুম, সুন্দর আনন্দ দেয় তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।"[১]

যে-ধারণাটাকে রবীন্দ্রনাথ এখানে বাতিল ব'লে ঘোষণা করলেন, তার মূল কথাটা কী? মূল কথাটা হ'লো এই — সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। কিন্তু আনন্দটা দূরের লক্ষ্য। সাহিত্যের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য, অব্যবহিত লক্ষ্য সুন্দর। সাহিত্যের কাজ সৌন্দর্যরচনা।

একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবো, পূর্ব-পোষিত এই ধারণার সবটাই রবীন্দ্রনাথ এখানে বাতিল ক'রে দিচ্ছেন না। আনন্দই যে সাহিত্যের লক্ষ্য এ-কথা তিনি এখনো স্বীকার করছেন। কিন্তু সাহিত্যের কাজ যে সৌন্দর্যরচনা, এ-কথা এখন আর তিনি স্বীকার করছেন না। অর্থাৎ মতের বদলটা হয়েছে সৌন্দর্যকে নিয়ে, আনন্দকে নিয়ে নয়। তাঁর এখনকার অর্থাৎ সংশোধিত মতকে বিশ্লিষ্ট ক'রে বললে দাঁড়াচ্ছে :

এক. সাহিত্যের বা আর্টের সৌন্দর্য, আর ব্যবহারিক জীবনে সচরাচর যাকে আমরা সৌন্দর্য বলি অর্থাৎ প্রচলিত সৌন্দর্য, এ দুই সম্পূর্ণ আলাদা। ভাঁড়ুদত্ত সাহিত্যের সুন্দর, কিন্তু জীবনের সুন্দর নয়, অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে সুন্দর নয়।

দুই. সৌন্দর্য অর্থে যদি প্রচলিত সৌন্দর্য ধরি, তাহ'লে সৌন্দর্যরচনা সাহিত্যের কাজ নয়।

তিন. সাহিত্যের লক্ষ্য আনন্দ। যা-কিছু আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যের সামগ্রী।

চার. প্রচলিত অসুন্দরও সাহিত্যে আনন্দ দিতে পারে, অতএব সাহিত্যে সুন্দর হ'তে পারে।

পাঁচ. সাহিত্যে — যদি তা সত্যিই সাহিত্য হয় — সকলেই আনন্দকর অতএব সাহিত্যে সকলেই সুন্দর।

সব জড়িয়ে দাঁড়ালো এই যে, যদিও সাহিত্যে সবই সুন্দর, তবুও সৌন্দর্যরচনা সাহিত্যের মুখ্য কাজ নয়। মুখ্য হচ্ছে আনন্দ।

কথাটা যখন সাহিত্যকে নিয়েই, জীবনকে নিয়ে নয়, কথাটা সাহিত্যের কাজ নিয়ে, সাহিত্যের লক্ষ্য নিয়ে — শেষ পর্যন্ত সাহিত্যরচয়িতা কী দেন এবং সাহিত্য-পাঠক কী পান, তা-ই নিয়ে, তখন একটা প্রশ্ন এখানে অবশ্যই উঠতে পারে। জীবনে যা-ই হোক-না কেন, সাহিত্যে ভাঁড়ুদত্তও যখন আনন্দ দেয়, সে-ও যখন 'সাহিত্যের সুন্দর'— সফল সাহিত্যের সব-কিছুই যখন সুন্দর, তখন কেন বলবো না যে, সৌন্দর্যরচনাই সাহিত্যের কাজ? যা আনন্দকর তারই অপর নাম যখন সুন্দর, তখন সৌন্দর্যরচনার কথায় রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ এতো আপত্তি কেন?

আপত্তি দুই কারণে। প্রথমত তত্ত্বগত, দ্বিতীয়ত ব্যবহারিক।

আগে ব্যবহারিকের কথাই বলি। সাহিত্যের কাজ সৌন্দর্যরচনা — এ-কথা বললে অনেকখানি ভুল বুঝবার আশঙ্কা থাকে। আশঙ্কা এই জন্য যে, সৌন্দর্য বলতে সাধারণত আমরা প্রচলিত সৌন্দর্যকেই বুঝে থাকি।

প্রচলিত সুন্দরের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি এ-জন্য নয় যে তা প্রচলিত। এই জন্য যে তা আদৌ সুন্দর নয়। অথবা তা অতি নিম্নস্তরের সুন্দর। তা সংকীর্ণ, খণ্ডিত এবং স্বার্থ-সংসর্গে দূষিত। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে এই নিম্নস্তরের স্বার্থদুষ্ট সৌন্দর্যের ধারণাকে সম্পূর্ণ দূর ক'রে দিতে চান। সৌন্দর্যরচনা সাহিত্যের কাজ — এ-কথা বললে এমন আশঙ্কা আছে যে, আমরা ভুল ক'রে ভেবে বসবো, ওই-রকম নিম্নস্তরের সৌন্দর্যরচনাই বুঝি সাহিত্যের কাজ। হয়তো ভেবে বসবো, জীবনে যে-সব জিনিসকে আমরা সুন্দর ব'লে জানি, সাহিত্যের কারবার বুঝি বেছে-বেছে কেবল তাদের নিয়েই। ধ'রে নেবো, জীবনের অসুন্দরেরা — জীবনের দুঃখ কষ্ট গ্লানি, জীবনে যা বীভৎস ভয়ানক ঘৃণাকর — সাহিত্যেও তারা বুঝি বর্জনীয়।

এ-প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে সুন্দর-অসুন্দরের জাতিভেদ স্বীকার করেন না। পাশ্চাত্য ইস্থেট্‌রা যে-অর্থে সৌন্দর্যের পূজারি, রবীন্দ্রনাথ সে-অর্থে মোটেই সৌন্দর্যের পূজারি নন। 'সাহিত্য' গ্রন্থের "সৌন্দর্য ও সাহিত্য" প্রবন্ধে ইস্থেট্‌দের সম্বন্ধে তিনি যে-সব অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা মোটেই প্রশংসাসূচক নয়।—

"য়ুরোপে সৌন্দর্যচর্চা সৌন্দর্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধুয়া আছে। সৌন্দর্যের বিশেষ ভাবের অনুশীলনটা যেন একটা বিশেষ বাহাদুরির কাজ, এইরূপ ভঙ্গিতে একদল লোক তাহার জয়ধ্বজা উড়াইয়া বেড়ায়।...

"য়ুরোপের সাহিত্যে সৌন্দর্যের দোহাই দিয়া, যাহা-কিছু প্রচলিত, যাহা-কিছু প্রাকৃত,তাহাকে তুচ্ছ, তাহাকে humdrum বলিয়া একেবারে ঝাঁটাইয়া দিবার চেষ্টা কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায়। ...সৌন্দর্যের টান মানুষের মনকে যদি সংসার হইতে এমনি করিয়া ছিনিয়া লয়, মানুষের বাসনাকে তাহার চারিদিকের সহিত যদি কোনো মতেই খাপ খাইতে না দেয়, যাহা প্রচলিত তাহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রচার করে, যাহা হিতকর তাহাকে গ্রাম্য বলিয়া পরিহাস করিতে থাকে, তবে সৌন্দর্যে ধিক্ থাক্।"[২]

এই ধিক্কারের প্রয়োজন আছে ব'লেই রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যরচনাকে সাহিত্যের কাজ বলতে আপত্তি করেছেন। এ-আপত্তি ব্যবহারিক।

এইবারে তত্ত্বগত আপত্তির কথা। আগে-আগে তিনি যে-রকমই ভেবে থাকুন-না কেন, এইখানে এসে, অর্থাৎ 'সাহিত্যের পথে'র ভূমিকা রচনার কাছাকাছি কালে এসে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয়ে অনুভব করছেন যে, সাহিত্য-অভিজ্ঞতায় আনন্দই প্রাথমিক উপলব্ধি, এবং সেই কারণে সাহিত্যতত্ত্বে আনন্দই প্রাথমিক প্রত্যয়। আনন্দকে বোঝাবার জন্য তার থেকে মৌলিক অপর কোনো প্রত্যয় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পূর্বে এ-কথাটা রবীন্দ্রনাথ এতো স্পষ্ট ক'রে কখনো ভাবেননি। এখন বুঝেছেন, আগের প্রত্যয়টাকে — মৌল প্রত্যয়টাকে — আগে বলা দরকার। এবং সেইটে পর্যাপ্ত হ'লে অন্য-কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এখন বুঝেছেন যে, সৌন্দর্যরচনা সাহিত্যের কাজ, এ-কথা বললে ব্যাপারটাকে উল্টো ক'রে বলা হয়। "...এতদিন যা উল্টো করে বলছিলুম তাই সোজা করে বলার দরকার। বলতুম, সুন্দর আনন্দ দেয় তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।"[৩]

এইবারে রবীন্দ্রনাথের সংশোধিত সৌন্দর্যসিদ্ধান্তের মূল কথাটাকে একটু বুঝে নেওয়া যাক।

সেই মূল কথাটা হ'লো এই যে, সাহিত্যের লক্ষ্য সুন্দর নয়, সাহিত্যের লক্ষ্য আনন্দ। সুদূর বা শেষ লক্ষ্যও তাই, নিকট বা প্রত্যক্ষ লক্ষ্যও তাই। আপাত-দৃষ্টিতে কথাটা সরল। কিন্তু এর তাৎপর্য বহুদূরগামী। বর্তমান প্রসঙ্গে সেই তাৎপর্য আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তা হ'লো এই যে, সাহিত্যে সুন্দরের উপলব্ধি কোনো স্বতন্ত্র উপলব্ধিই নয়। আনন্দই আদি মধ্য অন্ত। এ-কথাটা ঠিক এইভাবে রবীন্দ্রনাথ কোথাও স্পষ্ট ক'রে বলেননি বটে, কিন্তু তিনি যা বলেছেন তা থেকে স্বাভাবিকভাবেই এ-কথা অনুসৃত হয়। এই সিদ্ধান্তের উপর ভর ক'রে আরো এক ধাপ অনায়াসে এগিয়ে যাওয়া যায়। যেহেতু সাহিত্যিকের — অথবা সাহিত্যরসিকের — সাক্ষাৎ সাহিত্য-অভিজ্ঞতাতে সুন্দর ব'লে আলাদা কোনো-কিছুর অস্তিত্ব নেই, সেইহেতু সাহিত্যের প্রসঙ্গে সুন্দর কথাটির প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর এবং অসার্থক।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সাহিত্যের আনন্দ হ'লো মানুষের নিজেকে পাওয়ার আনন্দ। নিজেকে পাওয়ার একটা অপরিহার্য শর্ত আছে। নিজেকে অপরের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। অপরের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে তারই মধ্যে নিজেকে ফিরে পেতে হবে। মানুষ নিজেকে যথার্থভাবে পায় বহুর মধ্যে, বিচিত্রের মধ্যে। ইয়াগোর সঙ্গে ইয়াগো হ'য়ে, ওথেলোর সঙ্গে ওথেলো হ'য়ে, ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তার অন্ধতা হ'য়ে, কর্ণের সঙ্গে তার নিষ্ফল বীরত্ব হ'য়ে। সব-কিছুই সে হ'তে চায়। "রামও হয় হনুমানও হয়, ঠিকমতো হতে পারলেই খুশি। তার মন গাছের সঙ্গে গাছ হয়, নদীর সঙ্গে নদী।…মানুষের আপনাকে নিয়ে এই বৈচিত্র্যের লীলা সাহিত্যের কাজ। সে লীলায় সুন্দরও আছে অসুন্দরও আছে।"[৪]

বলা বাহুল্য, উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটিতে যে সুন্দর-অসুন্দরের কথা আছে, তা ব্যবহারিক জীবনেরই সুন্দর-অসুন্দর। সাহিত্যের লীলায় সকলেই আনন্দকর, তাদের মধ্যে কে যে প্রচলিত অর্থে সুন্দর, আর কে-বা প্রচালিত অর্থে অসুন্দর, সে-কথা একেবারেই অবান্তর। সাহিত্যে 'ঠিকমত হতে পারলেই খুশি'। এই হওয়াটাই সাহিত্যে আসল কথা। যাকে অবলম্বন ক'রে এই হ'য়ে-ওঠা, "সে অসুন্দর হলেও মনোরম; সে রস-স্বরূপের সনন্দ নিয়ে এসেছে।"[৫]

যে ঠিকমতো হ'য়ে-উঠেছে, যার মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেকে পাই, তারই আছে

রস-স্বরূপের সনন্দ। নিজেকে পাওয়ার আনন্দ, অর্থাৎ আত্মোপলব্ধির আনন্দই রস-স্বরূপের এই সনন্দ।

'আত্মোপলব্ধির আনন্দ' কথাটায় অনাবশ্যক বাগ্‌বিস্তার আছে। কারণ আত্মোপলব্ধি আর আনন্দ আলাদা নয়। আত্মোপলব্ধি নিজেই আনন্দ, এবং সব আনন্দই শেষ পর্যন্ত আত্মোপলব্ধি। তা-ই বা কেন, সব উপলব্ধিই আত্মোপলব্ধি, সব অনুভবই আত্মানুভব। সব অনুভবেই আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের কাছে এইটেই মূল তত্ত্ব।

"ভাবে জানি আপনাকেই...।"[৬] কিন্তু শুধু আপনাকেই নয়, আপনাকে জানা অর্থই অপর সকলকে জানা। সব অনুভবই যুগপৎ আত্মানুভব এবং সর্বানুভব। বলতে পারি, সব অনুভবই সত্যানুভব।

নিবিড় অনুভব, এই হ'লো রস-স্বরূপের সনন্দ। সে-অনুভব সুখের হ'তে পারে, দুঃখের হ'তে পারে, শান্তির হ'তে পারে, অশান্তির হ'তে পারে। সে-অনুভব যা স্নিগ্ধ মধুর কোমল তারও হ'তে পারে, আবার যা ভয়ানক বীভৎস ঘৃণাজনক তারও হ'তে পারে। যে-বহুর সঙ্গে মিলনে, যে-বিচিত্রের সঙ্গে একাত্মতায় মানুষের 'আত্ম-অভিজ্ঞতা প্রবল ও বহুল' হয়, তার মধ্যে হাসি এবং অশ্রু, আশা এবং নৈরাশ্য, কমেডি এবং ট্র্যাজেডি সবই আছে। সব-কিছুকে নিয়েই জীবনের সমগ্রতা। সৌন্দর্য নয়, জীবনের প্রবলতা ও বহুলতা — জীবনের সমগ্রতা, এই হ'লো সাহিত্যের লক্ষ্য।

সাহিত্য মানুষের মিলনের অভিযান, স্বীকরণের অভিযান। যতোটুকু আমাদ্বারা স্বীকৃত, সেইটুকুই আমার সত্য, সেইটুকুই আমার বাস্তব — সেইটুকুই আমার চারি-দিকের হাঁ-ধর্মী মণ্ডলী। কিন্তু কথাটা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলা ভালো।—

"সংসারে আমাদের সকলেরই চার দিকে এই হাঁ-ধর্মীর মণ্ডলী আছে — এই বাস্তবদের আবেষ্টন ; তাদের সকলকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে আমাদের সত্তা আপনাকে বিচিত্র করেছে, বিস্তীর্ণ হয়েছে...। তাদের মধ্যে রাজাবাদশা আছে, দীন-দুঃখীও আছে, সুপুরুষ আছে, সুন্দরী আছে, কানা খোঁড়া কুঁজো কুৎসিতও আছে...। এ ছাড়া আছে ভাবাবেগের বাস্তবতা — দুঃখ-সুখ বিচ্ছেদ-মিলন লজ্জা-ভয় বীরত্ব-কাপুরুষতা।... বাইরে থেকে মানুষের এই আপন-করে-নেওয়া সংগ্রহ, ভিতর থেকে মানুষের এই আপনার-সঙ্গে-মেলানো সৃষ্টি, এই তার বাস্তবমণ্ডলী — বিশ্বলোকের মাঝখানে এই তার অন্তরঙ্গ মানবলোক — এর মধ্যে সুন্দর অসুন্দর, ভালো মন্দ, সংগত অসংগত, সুরওয়ালা এবং বেসুরো, সবই আছে। · মানুষ আপন মনের একান্ত অনুভূতি থেকে তাদের বলে নিশ্চিত সত্য। এই সত্যের বোধ দেয় আনন্দ, সেই আনন্দেই

তার শেষ মূল্য। তবে কেমন করে বলব, সুন্দরবোধকে বোধগম্য করাই কাব্যের উদ্দেশ্য।"[৭]

এই কথাই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যমীমাংসার শেষ কথা। সত্যের আনন্দই সাহিত্যের চরম মূল্য। সত্যের আনন্দই সাহিত্যের সব-সময়ের লক্ষ্য। 'সুন্দরবোধকে বোধগম্য করা' সাহিত্যের কাজ নয়।

সত্যের আনন্দকে আমরা সামঞ্জস্যের আনন্দও বলতে পারি। অন্যদিক থেকে, একে মিলনের আনন্দ বলতেও বাধা নেই। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, মিলনের জন্যই সাহিত্য সাহিত্য। সাহিত্যের শক্তি মেলাবার শক্তি। বস্তুত সাহিত্য মানেই মিলন।

কার সঙ্গে কার মিলন? এ-মিলন সর্বতোমুখী। সকলের সঙ্গে সকলের। লেখকের সঙ্গে বিষয়ের, বিষয়ের সঙ্গে পাঠকের এবং লেখকমনের সঙ্গে পাঠকমনের। মিলন মানুষের সঙ্গে বিশ্বের এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের। মিলন বিশ্বসত্যের সঙ্গে মানবসত্যের।

আমাদের অব্যবহিত চৈতন্যে মিলনই আদি-সত্য এবং মিলনই শেষ-সত্য। কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে দেখলে, এমন কিছু পূর্ব-শর্তকে স্বীকার করতেই হবে যা না স্বীকার করলে মিলনের অর্থ হয় না। এরা মিলনতত্ত্বের বাইরের কোনো সত্য নয়, এদের নিয়েই মিলন মিলন ব'লে গণ্য। মিলনকে সত্য ব'লে মানার অর্থই এদের সত্য ব'লে মানা।

মিলনের প্রথম পূর্ব-স্বীকৃতি ঐক্য। মৌল একটা ঐক্য না-থাকলে, আত্যন্তিক অনৈক্য থাকলে মিলন সম্ভব হ'তে পারে না। সেই-যে 'রাজা' নাটকের গানে আছে, যে-রাজার রাজত্বে সবাই রাজা, সেইখানেই রাজার সঙ্গে সবাই মিলতে পারে, সেই গানের নিহিতার্থটা বোধহয় এখানে স্মরণ করতে পারি। মিলন হ'তে হ'লে মিল থাকতেই হবে।

মিলনের অপর পূর্ব-স্বীকৃতি আপাতদৃষ্টিতে এর বিপরীত। ঐক্য যেখানে সম্পূর্ণ ভেদ-বর্জিত, একাকার এবং নিত্য-সিদ্ধ, সেখানে মিলন কথাটাই অর্থহীন। মিলতে হ'লে একা নয়, দু-জন চাই। মিলন একটা সজীব ক্রিয়াশীলতা। তার জন্য শুধু ঐক্য নয়, অনৈক্যকেও চাই: কোথাও একটা ভিন্নতা, বহুত্ব, বৈচিত্র্য, বিরোধ থাকতেই হবে। হয়তো তা আপেক্ষিক অনৈক্য, আপাতবিরোধ। কিন্তু মৌল ঐক্যের মতো এই আপেক্ষিক ভিন্নতাও মিলনের অপরিহার্য পূর্ব-শর্ত। ভিন্নতাকে যতোই আপেক্ষিক বলি, মিলনের মধ্যে শেষ অবধি সে তার অস্তিত্বকে অটুট রাখে। তা রাখে ব'লেই

বৈচিত্র্য মূল্যবান। অথবা, উল্টো ক'রেও বলতে পারি, রূপ সত্য ব'লেই, বৈচিত্র্য সত্য ব'লেই, বহু সত্য ব'লেই, অর্থাৎ কিনা বেড়া ভেঙে বাধা ডিঙিয়ে মিলতে হয় ব'লেই—মিলনকে বলি সাধনা। শুধু সাধনা নয়, লীলা। কথাটা রাবীন্দ্রিক হবে না, নচেৎ বলতাম অ্যাড্‌ভেঞ্চার।

উত্তরণ কথাটা বোধকরি আপত্তিকর হবে না। মিলন অর্থই খণ্ডতার উত্তরণ। তথ্যের ভূমিতে কোথাও একটা খণ্ডতার দ্বন্দ্ব না-থাকলে সত্যে পৌঁছবো কার উত্তরণের মধ্যে দিয়ে? উত্তরণ ঘটলেও তথ্যটা কিন্তু মিথ্যা হ'য়ে যায় না। তথ্য তখন নতুন তাৎপর্য পায়। যথার্থ বা সার্থক হ'য়ে ওঠে। সেই তাৎপর্যময়, ভাবময় সার্থক তথ্যকেই সত্য বলি।

যে-এক বহু-কে সমন্বিত করে না, যে-ঐক্য বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য নয়, তেমন ঐক্যকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেননি। আবার, যে-বহু ঐক্যে সমন্বিত নয়, যে-বৈচিত্র্য একের প্রকাশবৈচিত্র্য নয়, তেমন বহুকেও রবীন্দ্রনাথ সত্য ব'লে গ্রহণ করেননি। রবীন্দ্রনাথের কাছে ফাঁকা ঐক্যও মিথ্যা, অসংলগ্ন বৈচিত্র্যও মিথ্যা। এদের জীবন্ত সামঞ্জস্যই সত্য। সংগীত যেমন বিচিত্র ধ্বনিপুঞ্জের সুবিন্যস্ত সুবিহিত সামঞ্জস্যময় ঐক্য — প্রাণস্পন্দিত সৌষম্য, রবীন্দ্রনাথ যে-ঐক্যের কথা বলেছেন, সে-ও তেমনি বহুবিচিত্র খণ্ডসত্য-পুঞ্জের নিবিড় সামঞ্জস্যময় প্রাণবন্ত ঐক্য।

যেখানেই এই প্রাণস্পন্দিত সৌষম্য আমাদের সামনে অনাবৃত ক'রে নিজেকে মেলে ধরেছে, সেইখানে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বরহস্যের চাবিকাঠির সন্ধান পেয়েছেন, সে গানেই হোক, আর ফুলেই হোক, আর মানুষের ব্যক্তিসত্তার মধ্যেই হোক। সামঞ্জস্যের মধ্যে যখন দেখি, সামঞ্জস্যকে যখন দেখি, তখনই সত্যকে যথার্থভাবে দেখি।—

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি।[৮]

যেখানেই আমরা এই সৌষম্যকে আবিষ্কার করি, সেইখানেই — তার মধ্যেই আমরা নিজের মর্মগত সত্যকে দেখতে পাই। তার সঙ্গেই আমরা আমাদের আত্মীয়তা অনুভব করি। সেইখানেই বিশ্ব-সত্যের সঙ্গে আমাদের আত্ম-সত্যের মিলন ঘটে।

"গোলাপ-ফুলে আমরা আনন্দ পাই। বর্ণে গন্ধে রূপে রেখায় এই ফুলে আমরা একের সুষমা দেখি। এর মধ্যে আমাদের আত্মারূপী এক আপন আত্মীয়তা স্বীকার করে...। অন্তরের এক বাহিরের একের মধ্যে আপনাকে পায় বলে এরই নাম দিই আনন্দরূপ।

"গোলাপের মধ্যে সুনিহিত সুবিহিত সুষমাযুক্ত যে ঐক্য, নিখিলের অন্তরের মধ্যেও সেই ঐক্য। সমস্ত সংগীতের সঙ্গে এই গোলাপের সুরটুকুর মিল আছে; নিখিল এই ফুলের সুষমাটিকে আপন বলে গ্রহণ করেছে।"[৯]

যে-সৌষম্যের কারণে গানকে সুন্দর বলি, যে-সৌষম্যের কারণে গোলাপকে সুন্দর বলি, শিল্পে সাহিত্যে রচনা বিশেষকে সুন্দর বলি, সেই সৌষম্যই বিশ্বজগতের চরম সত্য।

"গোলাপফুল আমার কাছে যে কারণে সুন্দর, সমগ্র জগতের মধ্যে সেই কারণটি বড়ো করিয়া রহিয়াছে। বিশ্বের মধ্যে সেইরূপ উদারপ্রাচুর্য অথচ তেমনি কঠিন সংযম; তাহার কেন্দ্রাতিগ শক্তি অপরিসীম বৈচিত্র্যে আপনাকে চতুর্দিকে সহস্রধা করিতেছে এবং কেন্দ্রানুগ শক্তি এই উদ্দাম বৈচিত্র্যের উল্লাসকে একটিমাত্র পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে মিলাইয়া রাখিয়াছে।"[১০] এই-যে একদিকে রূপ-বৈচিত্র্যের অজস্রতা এবং অন্যদিকে সুবিহিত ঐক্য, একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন জগতের আনন্দলীলা। "জগতের আনন্দলীলাকেও আমরা যতই পূর্ণতররূপে দেখি ততই জানিতে পারি, ভালোমন্দ সুখদুঃখ জীবনমৃত্যু সমস্তই উঠিয়া ও পড়িয়া বিশ্বসংগীতের ছন্দ রচনা করিতেছে; সমগ্রভাবে দেখিলে এ ছন্দের কোথাও বিচ্ছেদ নাই...।"[১১]

একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন জগতের মূল সুর। তিনি বলেছেন, এই মূল সুরটিকে ধরতে পারলে, তখন বৃহৎ সামঞ্জস্যের মধ্যে সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়। তখন সকলেই রূপবান। কেউ আর আলাদা ক'রে সুন্দর নয়, কেউ আর আলাদা ক'রে অসুন্দরও নয়। তখন কেউই আলাদা নয়। সকলেই বৃহৎ সামঞ্জস্যে গ্রথিত। তখন ব্যবহারিক জীবনের প্রচলিত-সুন্দর সৌন্দর্যে তার বিশেষ অধিকারের দাবি পরিত্যাগ করে। তখন তথাকথিত অসুন্দরও তার ছদ্মবেশ উন্মোচন করে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, আমাদের সামঞ্জস্যবোধ যখন জাগ্রত হয়, তখনই সৌন্দর্যবোধ পূর্ণভাবে জ্ব'লে ওঠে। তখন সমস্ত আংশিকতা নিরস্ত হয়। তখন সত্যকেই সুন্দর ব'লে জানি। তখন কিছুই অসুন্দর থাকে না। "তখন কী হয়? তখন দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়া সমস্তই সুন্দর হয়, তখন সত্য ও সুন্দর একই কথা হইয়া উঠে। তখনই বুঝিতে পারি, সত্যের উপলব্ধিমাত্রেই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য।"[১২]

সামঞ্জস্য অর্থ হ'লো রূপ-বৈচিত্র্য এবং তাদের আভ্যন্তরীণ ঐক্য —ঐক্যে-বিধৃত বহুবিধতা। আনন্দের মতো, সত্যের মতো, সৌষম্য বা সামঞ্জস্যও রবীন্দ্রনাথের

সাহিত্যতত্ত্বের একটি মৌল তত্ত্ব। শুধু সাহিত্যতত্ত্বের নয়, রবীন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্বেরও, বিশ্বতত্ত্বেরও।

সামঞ্জস্যের বোধ অন্য-কোনো বোধের উপর নির্ভরশীল নয়। তাকে অন্য-কিছু দিয়ে চিনি না। সে স্বপ্রকাশ। তাকে দিয়েই আমরা সত্তার চরিত্র-মহিমাকে অনুধাবন করি। তাকে দিয়েই আমরা বিশ্বভুবনকে চিনি। তার সূত্রেই আমরা বিশ্বভুবনকে আমাদের আত্মীয় ব'লে অনুভব করতে পারি।

সত্য, আনন্দ এবং সামঞ্জস্য বস্তুত পৃথক্ নয়। কিন্তু আমাদের বোধের দৃষ্টিকোণের দিক থেকে তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় আছে। সেইখানেই তাদের তত্ত্বগত পাদপীঠ।

যা আছে তা আছে ব'লেই তাকে সত্য বলি। এখানে সত্য কথাটাতে সত্তার সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি — বিশুদ্ধ অস্তিত্ব-গৌরবের ঘোষণা। সামঞ্জস্য কথাটাতে সত্তার চরিত্র-মহিমার স্বীকৃতি। আনন্দ কথাটাতে তার আস্বাদময়তার স্বীকৃতি। তার মধ্যে দিয়ে উপলব্ধির চরমত্ব ঘোষিত হয়, সত্তার মানবিকতা ও মানসিকতা সূচিত হয়, মিলন ও প্রেমের গৌরব প্রতিষ্ঠা পায়।

বোধের জন্য আর-কোনো পৃথক্ দৃষ্টিকোণের প্রয়োজন নেই, অবকাশও নেই। সত্তার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের মধ্যে পরিচয়ের আর-কোনো নতুন দিক অবশিষ্ট নেই, আর-কোনো স্বতন্ত্র তত্ত্বগত ভূমি নেই।

সামঞ্জস্যই বলি, আনন্দই বলি আর সত্যই বলি, প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব পরিচয় আছে, নিজস্ব একটা তত্ত্বগত পাদপীঠ আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিণত সাহিত্যচিন্তায় সুন্দরের কোনো নিজস্ব পরিচয় নেই, তত্ত্বগত প্রতিষ্ঠাভূমি নেই। সুন্দর যেন অপর-কোনো-একটা-কিছুর নাম। কখনো শুনি আনন্দই সৌন্দর্য। কখনো শুনি সামঞ্জস্যই সৌন্দর্য। আবার কখনো বা শুনতে পাই, সত্যই সৌন্দর্য। কিন্তু কখনোই এ-রকম শুনি না — অন্তত পরিণত সাহিত্যচিন্তার পর্বে কখনোই এ-রকম শুনি না যে, সৌন্দর্যই সামঞ্জস্য, সৌন্দর্যই আনন্দ বা সৌন্দর্যই সত্য।

আনন্দকেই যদি সৌন্দর্য নামে ডাকি, সামঞ্জস্যকেই যদি সৌন্দর্য নাম দিয়ে চালাতে চাই, তাতে বাড়তি লাভ কিছু নেই। কেননা তার দ্বারা নতুন কিছুই বলা হ'লো না।

তবু যে আমরা সুন্দর বলি, তার কারণ অভ্যাস দুর্মর। ব্যবহারিক ক্ষেত্রের সংস্কারকে আমরা তত্ত্বের ক্ষেত্রেও বহন ক'রে নিয়ে আসি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সুন্দর কথাটিকে একেবারে বর্জন করতে পারেননি। বলা দরকার যে, তেমন বর্জনের প্রস্তাবও তিনি করেননি। সৌন্দর্য সম্পর্কে নিজের মত পরিবর্তনের ঘোষণার

নিহিতার্থ শুধু এই যে, সৌন্দর্য নয়, আনন্দই প্রাথমিক সত্য — সাহিত্যতত্ত্বে আনন্দই প্রাথমিক প্রত্যয়। সত্যবোধ বা সামঞ্জস্য-চেতনা, এরই অপর নাম সৌন্দর্যচেতনা। বিষয় এবং বিষয়ীর মিলনলব্ধ যে-আনন্দ, তারই নামান্তর সৌন্দর্য। সামঞ্জস্য অর্থেই সৌন্দর্য কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ, অন্য-কোনো অর্থে নয়। সুষম ব'লেই সুন্দর, সুন্দর ব'লে সুষম নয়। সত্য ব'লেই সুন্দর, সুন্দর ব'লে সত্য নয়।

সৌন্দর্য কথাটাকে এই অর্থে গ্রহণ করেছেন ব'লেই রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে মঙ্গলকে সুন্দর বলতে পেরেছেন। পেরেছেন এই জন্য যে, রবীন্দ্রনাথের মতে সামঞ্জস্য অর্থই মঙ্গল এবং মঙ্গল অর্থই সামঞ্জস্য। সুন্দরের মতো মঙ্গলও সত্যের নামান্তর।

তা যদি হয়, তাহ'লে মানতে হবে, সুন্দর যেমন প্রাথমিক উপলব্ধি নয়, মঙ্গলও তাই। অব্যবহিত স্বয়ংসিদ্ধ প্রত্যয় নয়, সুন্দরের মতো মঙ্গলও সাধিত প্রত্যয়। সত্য ব'লেই — সামঞ্জস্যের কারণেই, আনন্দের কারণেই, যেমন সুন্দর সুন্দর, ঠিক তেমনি, সত্য ব'লেই, সামঞ্জস্যের কারণেই, আনন্দের কারণেই মঙ্গল মঙ্গল। আরো এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারি। সামঞ্জস্যের কারণেই, আনন্দের কারণেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তারাজ্যে সুন্দর এবং মঙ্গল অভিন্ন।

বিষয় এবং বিষয়ীর সামঞ্জস্যকে, বিষয় এবং বিষয়ীর আনন্দময় মিলনের সৌষম্যকে — অথবা আরো সোজা কথায়, বিষয় এবং বিষয়ীর মিলনকেই রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য বলেছেন। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যভাবনার — যদি একে সৌন্দর্যভাবনাই বলি — তার অন্যতম প্রধান বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতাকে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদগুলির সঙ্গে একে মিলিয়ে দেখা দরকার।

সৌন্দর্য সম্পর্কে বাজার-চলিত মতগুলিকে আমাদের প্রয়োজনের দিক থেকে আমরা মোটামুটি তিনটি বৃহৎ গোত্রে ভাগ ক'রে ফেলতে পারি। ভাগটা অন্য-কোনো দিক থেকে নয়, ভাগটা বিষয় এবং বিষয়ী সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীকে অবলম্বন ক'রে। বর্তমান প্রসঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গীর কথাটাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথম গোত্রে বিষয়ভিত্তিক বা অবজেক্টিভ মতবাদ : সৌন্দর্য একটা বস্তুগত গুণ, বস্তু সেই গুণের কারণেই সুন্দর। দ্বিতীয় গোত্রে পড়বে বিষয়ীভিত্তিক বা সাবজেক্টিভ মতবাদ : সৌন্দর্য ব'লে কোনো বস্তুগত গুণ নেই। ভোক্তার মনের উপলব্ধি-বিশেষের নামই সুন্দরের উপলব্ধি। তৃতীয়টি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। একে বলতে পারি, বিষয়-বিষয়ীভিত্তিক বা সাবজেক্টিভ-অবজেক্টিভ সৌন্দর্যতত্ত্ব : সৌন্দর্য বস্তু এবং মন এই দুয়ের সংযোগ-সাপেক্ষ। সৌন্দর্যে বস্তু এবং মন দুয়েরই দান আছে।

প্রথম মতে, সৌন্দর্য একটা তথ্য। বস্তু যেমন একটা স্বাধীন তথ্য, সৌন্দর্যও তাই। এই মতবাদের মর্মকথা হ'লো এই যে, সৌন্দর্য বস্তুজগতের জিনিস। তা বিষয়েরই নিজস্ব গুণ বা ধর্ম, সম্পূর্ণভাবে বিষয়ী-নিরপেক্ষ। যা অসুন্দর, দেখবার কেউ না-থাকলেও তা অসুন্দর। বিষয়ীর থাকা না-থাকা, দেখা না-দেখা সৌন্দর্যের অস্তিত্বের পক্ষে অবান্তর। যা সুন্দর তা সুন্দর হ'য়েই আছে, যা অসুন্দর তা-ও অসুন্দর হ'য়েই আছে, বিষয়ী শুধু আবিষ্কার করে মাত্র। অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য অনাবিষ্কৃত অসৌন্দর্য থাকতে পারে এবং আছে।

অবজেক্‌টিভ মতের অনুসিদ্ধান্ত হ'লো এই যে, সৌন্দর্য একটা তথ্যগত অনুপাত এবং তথ্যগত মাপজোকের ব্যাপার। চেষ্টা করলে তত্ত্ববিদ্ সৌন্দর্যের মাপজোকের তদ্‌গত সূত্রগুলিকে আবিষ্কার করতে পারেন, অন্তত তার কোনো আত্যন্তিক বাধা নেই। সূত্র আবিষ্কারের পর তার সাহায্যে কে সুন্দর কে সুন্দর নয় তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করাও সম্ভব হবে। বলা প্রয়োজন যে, বিষয়ভিত্তিক সৌন্দর্যতত্ত্বের সমর্থকেরা বহুকাল থেকেই সৌন্দর্যের তদ্‌গত মাপকাঠি নিরূপণের চেষ্টা ক'রে আসছেন। অদ্যাবধি কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত তো দূরে থাক, বহুজনস্বীকৃত সিদ্ধান্তও পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয় মতটি এর বিপরীত। তার মূল কথা হ'লো এই যে, সৌন্দর্য ব'লে বস্তুগত কোনো সত্য নেই। যা আছে সে হ'লো সুন্দর লাগা। অর্থাৎ সৌন্দর্য বিষয়ে নেই, আছে বিষয়ীর মনে। বিষয় নিজে সুন্দরও নয়, অসুন্দরও নয়, সে কেবল ভ্যালু-বর্জিত একটা সত্তা, একটা নিরপেক্ষ তথ্যমাত্র। বিষয়ী না-থাকলে সুন্দর অসুন্দর কিছুই থাকে না। বিষয়ী তার আপন মনের মাধুরী দিয়ে বিষয়কে সুন্দর দেখে। সৌন্দর্য আবিষ্কার নয়, রচনা। বিষয়ের গুণ নয়, দৃষ্টির গুণ। বলতে পারি, দৃষ্টির আরোপ। সৌন্দর্য একটা সাবজেক্‌টিভ ভ্যালু।

তৃতীয় মতবাদ অর্থাৎ সাবজেক্‌টিভ-অবজেক্‌টিভ সৌন্দর্যতত্ত্ব অনেকটা পূর্বোক্ত দুই মতের সমন্বয়। এর বক্তব্যটা এই যে, সৌন্দর্য বিষয়েরই গুণ বটে, কিন্তু তা বিষয়ী-নিরপেক্ষও নয়। সৌন্দর্যের হেতু আছে বিষয়ে, কিন্তু তার আবির্ভাব বিষয়ীর মনে। বিষয় এবং বিষয়ীর সংযোগ না-ঘটা পর্যন্ত সৌন্দর্য নেই। বিষয়ী না-থাকলেও সৌন্দর্যের হেতুগুলি বিষয়ে লগ্ন থাকে। কিন্তু তা সৌন্দর্য নয়, সৌন্দর্যের সুপ্ত সম্ভাবনা। বিষয়ীর দৃষ্টিপাতেই সুপ্ত সম্ভাবনা বাস্তব সত্য হ'য়ে ওঠে। সুতরাং বিষয়ীর গুরুত্ব অনেকখানি। কিন্তু বিষয়ের গুরুত্বও কিছুমাত্র কম নয়। বিষয়ী যে-কোনো বিষয়কেই খুশিমতো সুন্দর দেখতে পারে না, সুন্দররূপে প্রতিভাত হবার যোগ্যতাটা বিষয়ের মধ্যেই থাকা চাই।

এইবারে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-সিদ্ধান্ত এই তিন গোত্রের কোন্‌টিতে পড়বে? অথবা যদি কোনো-একটা বিশেষ গোত্রে না-ও ফেলি, রবীন্দ্রনাথ এর কাকে কতোটুকু সমর্থন করতে পারেন?

সহজেই বোঝা যায়, বিষয়ভিত্তিক মতবাদ মোটেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার অনুকূল নয়। সামঞ্জস্যকেই যদি সুন্দর বলি, তাহ'লেও তা নিছক বিষয়ভিত্তিক নয়। কেননা, আমরা আগেই দেখেছি, সামঞ্জস্য বিষয়ী-নিরপেক্ষ একটা তদ্‌গত মাপজোকের ব্যাপারই নয়। সামঞ্জস্য একটা উপলব্ধিগত সত্য। সামঞ্জস্যসাধন একটা সজীব প্রক্রিয়া, বিষয় এবং বিষয়ীর একটি সক্রিয় সহযোগিতা।

কিন্তু বিষয়ীভিত্তিক মতবাদ? এ-ও কি রবীন্দ্র-চিন্তার অনুকূল নয়? এইখানে একটু খট্‌কার কারণ আছে। এই মতবাদের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় এমন অনেক উক্তি রবীন্দ্র-রচনায় পাওয়া যাবে। বিশেষ ক'রে কবিতায়। আমি দেখলাম ব'লেই সুন্দর সুন্দর হ'লো, আমি সুন্দর বললাম ব'লেই গোলাপ হ'লো সুন্দর, এই ধরনের পঙক্তি রবীন্দ্র-কাব্যে মোটেই দুর্লভ নয়। তাহ'লে কি ধ'রে নেওয়া যায় না যে, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যভাবনা সাবজেক্‌টিভ সৌন্দর্যতত্ত্বের সমগোত্রীয়?

এ-রকম মনে করলে ভুল করবো। কারণ যে-মত কেবলই বিষয়ীভিত্তিক, তা-ও রবীন্দ্র-চিন্তার অনুকূল হ'তে পারে না। স্মরণ রাখতে হবে, তত্ত্বমীমাংসা আর কবিতা ঠিক এক বস্তু নয়। তত্ত্বমীমাংসার আদালতে কবিতার সাক্ষ্য সব সময় খুব নির্ভর-যোগ্য হয় না। সাক্ষ্য দেওয়া কবিতার কাজও নয়। কবিতার কেবল বাচ্যার্থ-টুকুকেই সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়, ব্যঞ্জনাকে নয়। বাচ্যার্থের সাক্ষ্য ভগ্নাংশের সাক্ষ্য, সমগ্র কবিতার সাক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে, কবিতায় নানা সুরের নানান্ রঙের কথা পাবো। পক্ষে বিপক্ষে দু-রকমই পাওয়া যাবে — বাছাই করা সহজ হবে না। এ-সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের সামগ্রিক ভাব-পরিমণ্ডলের উপরেই আমাদের বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

সেই ভাব-পরিমণ্ডলের কথা স্মরণ রাখলে — রবীন্দ্র-ভাবনার আভ্যন্তরীণ সংগতির দিকে দৃষ্টি রাখলে, এ-কথা বোঝা মোটেই কঠিন হবে না যে, রবীন্দ্রনাথ এমন কোনো মতকেই সমর্থন করতে পারেন না, যা একা বিষয় বা একা বিষয়ীর উপর জোর দেয়, যার অপরিহার্য পূর্বস্বীকৃতি বিষয় এবং বিষয়ীর স্বাতন্ত্র্য। প্রথম মতবাদে কেবল বিষয়েরই স্বীকৃতি, দ্বিতীয় মতবাদে বিষয়ীরই স্বীকৃতি। দুয়ের কোনোটিই রবীন্দ্র-চিন্তার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে না।

তৃতীয় মতবাদে সৌন্দর্যকে ফ্যাক্‌ট এবং ভ্যালু দুইভাবেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ এই তৃতীয় মতেরই সমর্থক। কেননা, এই সৌন্দর্যতত্ত্বে বিষয় এবং বিষয়ী উভয়েই সমান অপরিহার্য। উপরন্তু উভয়ের সংযোগও অপরিহার্য।

তবু, এ-কথা স্পষ্ট ক'রেই বলা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথ এই তৃতীয় মতটিকেও সমর্থন করতে পারেন না। পারেন না তার কারণ, এই তৃতীয় মতেরও এমন কতকগুলি পূর্ব-স্বীকৃতি আছে যা রবীন্দ্র-চিন্তার বিরোধী। প্রথম ও দ্বিতীয় মতবাদের মতো তৃতীয় মতবাদেরও অন্যতম পূর্ব-স্বীকৃতি হ'লো বিষয় এবং বিষয়ীর স্বাতন্ত্র্য। অপর একটি অপরিহার্য পূর্ব-স্বীকৃতি হ'লো এই যে, সৌন্দর্যের সম্ভাবনা বা সৌন্দর্যের বীজ বিষয়-বিশেষে আছে, বিষয়বিশেষে নেই, অর্থাৎ সুন্দর-অসুন্দরের ভেদটা সত্য এবং নিত্য। তৃতীয় একটি অনতিপ্রচ্ছন্ন পূর্বস্বীকৃতির কথাও এখানে উল্লেখ করা দরকার। তা হ'লো এই যে, সৌন্দর্যবোধ একটি বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র ধরনের বোধ। তা সত্যবোধ বা মঙ্গলবোধ থেকে আত্যন্তিকভাবে ভিন্ন।

এই তিন পূর্ব-স্বীকৃতির কোনোটিকেই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যভাবনা প্রচলিত তিন গোত্রের ত্রিবিধ সৌন্দর্যসিদ্ধান্তের কোনোটির সঙ্গেই মিলবে না। রবীন্দ্র-চিন্তার মৌল প্রকৃতিই এতো ভিন্ন ধরনের যে এদের সঙ্গে কোথাও তার কোনো সাধারণ ভূমি নেই। এরা যে-অর্থে সৌন্দর্য-সন্ধানী, সে-অর্থে সৌন্দর্য-সন্ধান রবীন্দ্র-চিন্তার স্বভাববিরুদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যসিদ্ধান্তকে আর-একবার স্মরণ ক'রে নেওয়া যাক।—

প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের মতে বিষয় এবং বিষয়ী অচ্ছেদ্য। এরা অযুতসিদ্ধ। সত্য এদের নিত্য-সম্মিলন। একেই তিনি সৌন্দর্য বলেছেন। সৌন্দর্য একটা বাড়তি উপাধি ছাড়া আর-কিছুই নয়। উপাধিটা অনাবশ্যক। সূক্ষ্মভাবে দেখলে অযৌক্তিক।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, সুন্দর-অসুন্দরের ভেদটা সত্য নয় — না সাহিত্যে, না জীবনে। কেউ অসুন্দর নয়, কেউ সুন্দর নয়, সকলেই রূপবান।

তৃতীয়ত, সৌন্দর্যবোধ ব'লে আলাদা কোনো বোধ নেই। তথাকথিত সৌন্দর্য-বোধ সত্যবোধেরই নামান্তর। সৌন্দর্যদৃষ্টি ব'লে কোনো বিশিষ্ট ধরনের দৃষ্টি নেই। সত্য-দৃষ্টিই, অর্থাৎ আবরণ-মুক্ত দৃষ্টিই সৌন্দর্যদৃষ্টি। চেতনা অর্থই সৌন্দর্য-চেতনা, কেননা চেতনা অর্থই সামঞ্জস্য-চেতনা। চেতনা অর্থই আনন্দ।

পাশ্চাত্য চিন্তায় সৌন্দর্যদর্শন বা সৌন্দর্যতত্ত্ব ব'লে যেমন একটা মোটামুটিভাবে

স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই, রবীন্দ্র-চিন্তায় তা পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্র-চিন্তা মুখ্যত তদ্‌মুখী নয়, মুখ্যত অন্তর্মুখী, মুখ্যত উপলব্ধিমুখী। রবীন্দ্র-চিন্তার মূল ধাঁচটা ভারতীয়।

আগেই বলেছি, সৌন্দর্য সংক্রান্ত পাশ্চাত্য মতগুলি যে-অর্থে সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা বা সৌন্দর্যসিদ্ধান্ত, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবিষয়ক প্রস্তাব মোটেই সে-জাতের বস্তু নয়। রবীন্দ্র-চিন্তায় এমন-কোনো স্বতন্ত্র — এমন-কি আপেক্ষিক অর্থেও স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবনা-প্রবাহ নেই, যাকে পৃথক্‌ ক'রে সৌন্দর্যভাবনা আখ্যা দেওয়া যায়। সৌন্দর্য সেখানে একটি আনুষঙ্গিক প্রত্যয়, আনুষঙ্গিক প্রস্তাব।

আনন্দের তত্ত্ব, সামঞ্জস্যের তত্ত্ব, এই হ'লো রবীন্দ্র-চিন্তার মৌল তত্ত্ব। সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসার উত্তর হিসেবে এই তত্ত্বকেই রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট ব'লে মনে করেন। অথবা ইচ্ছা করলে আরো এক ধাপ পিছিয়ে যেতে পারি। গিয়ে বলতে পারি, যেহেতু আনন্দই প্রথমতম উপলব্ধি, সেইহেতু সামঞ্জস্যও নয় — আনন্দই আদিতম তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের কাছে আনন্দই পরিপূর্ণতম বাস্তব — উপলব্ধিই পরিপূর্ণতম সত্য।

সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসি, লজ্জা-ভয় — এরই নাম আনন্দ। অভিজ্ঞতারই অপর নাম আনন্দ। সে-অভিজ্ঞতা কখনো ললিত, কখনো কঠোর। তা কখনো দুঃখকর, কখনো লজ্জাজনক। সে-অভিজ্ঞতা কখনো ভয়ানক, কখনো হাস্যকর, কখনো ঘৃণ্য। তাই দিয়েই জীবন গড়া। সব-কিছুকে নিয়েই জীবনের পূর্ণতা। জীবনের ভাণ্ডারে যা-কিছু আছে, সাহিত্য তার সবারই আস্বাদ চায়।

'সাহিত্যের পথে'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজের যে মত পরিবর্তনের কথা বলেছেন, সে-পরিবর্তনের আসল তাৎপর্য এইখানে। এ হ'লো সুলভ সৌন্দর্যবাদকে বাতিল ক'রে দিয়ে জীবনের পূর্ণতার সত্যকে স্বীকার ক'রে নেওয়া। এই কথা বলা যে, অভিজ্ঞতাই জীবন, তারই অপর নাম আনন্দ। এই কথা ঘোষণা করা যে, সাহিত্যের কাজ জীবনের পরিচয় দেওয়া, জীবনের আস্বাদ দেওয়া।

১. র । ১৪ । ২৯১

২. র । ১৩ । ৭৭৪ ৫

৩-৪. 'ভূমিকা'', 'সাহিত্যের পথে', র । ১৪ । ২৯১

৫. তদেব, র । ১৪ । ২৯২

৬. তদেব, র । ১৪ । ২৯১

৭. 'সাহিত্যের স্বরূপ', র । ১৪ । ৫১০

৮. 'গীতবিতান', র । ৪ । ১১

৯ ''তথ্য ও সত্য'', 'সাহিত্যের পথে', র । ১৪ । ৩১৩

১০-১১. ''সৌন্দর্য ও সাহিত্য'', 'সাহিত্য' র । ১৩ । ৭৭৪

১২. ''সৌন্দর্যবোধ'', 'সাহিত্য', র । ১৩ । ৭৬০

সূত্র-সংকলন

সাহিত্য আমাদের কেবল আনন্দই দেয় না, নানা দিক থেকে তা আমাদের জীবনকে নানাভাবে স্পর্শ করে। সুতরাং সাহিত্য যে আমাদের মনে নানা বিভিন্ন ধরনের জিজ্ঞাসার জন্ম দেবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তবে এইসব জিজ্ঞাসার, প্রত্যেকটিই খাঁটি সাহিত্যিক জিজ্ঞাসা নয়। আনন্দ-জিজ্ঞাসাই সাহিত্যতত্ত্বের কেন্দ্রগত জিজ্ঞাসা। অন্য অধিকাংশ প্রশ্নই সাহিত্যতত্ত্বের আনুষঙ্গিক প্রশ্ন।

কিন্তু বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখারও প্রয়োজনীয়তা আছে। সাহিত্য যেমন আমাদের জীবনকে নানাভাবে স্পর্শ করে, আমরাও তেমনি সাহিত্যকে নানা দৃষ্টিতে দেখে থাকি। সবরকম দেখাই সাহিত্যরসিকের বা সাহিত্যতাত্ত্বিকের দেখা নয়। সাহিত্য হিসেবে দেখাটাই সাহিত্যতাত্ত্বিকের আসল দেখা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সাহিত্যতাত্ত্বিকের বা সাহিত্যরসিকের দেখার মধ্যেও বহুবিধতার অবকাশ আছে। সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে গ্রহণ ক'রেই, আমাদের ভূমিকার বিভিন্নতা অনুযায়ী আমাদের দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতা ঘটে। কখনো আমাদের ভূমিকা স্রষ্টার ভূমিকা, তখন সাহিত্যকে আমরা বিশেষভাবে স্রষ্টার দৃষ্টিকোণ থেকেই বুঝতে চাই। কখনো আমরা নিছক তত্ত্বজিজ্ঞাসু — নিছক দার্শনিক, তখন সাহিত্যকে আমরা আমাদের জগৎ-তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাই। কখনো আমরা নিছক ভোক্তা — একক, বিষয়ান্তর-বিস্মৃত, রসমগ্ন সম্ভোগকারী। তখন আমাদের বিশিষ্ট প্রাপ্তিটাই আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাস্য বিষয়। কখনো আমরা প্রত্যক্ষভাবে সমাজসচেতন গোষ্ঠীগত মানুষ। তখন আমাদের দৃষ্টিকোণ স্রষ্টারও নয়, ভোক্তারও নয়, তখন আমাদের দৃষ্টিকোণ সমাজের দৃষ্টিকোণ। সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকাই তখন আমাদের একমাত্র বিচার্য বিষয়।

এই দৃষ্টিভূমিগুলির প্রত্যেকটিই সত্য। এর প্রত্যেকটি দেখাই সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে দেখা। সাহিত্যকে জানবার এবং বুঝবার পক্ষে এদের প্রত্যেকটিই সমান-ভাবে মূল্যবান। সাহিত্যতত্ত্ব এর কোনোটিকেই সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে না।

ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভূমি থেকে সাহিত্যকে দেখার ফলে আমাদের মনে যে-সব ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উদয় হয়, সাহিত্যশাস্ত্রীদের কাছে আমরা তার প্রত্যেকটিরই সন্তোষজনক উত্তর প্রত্যাশা করি। এই উত্তর যতো বিস্তৃত ক্ষেত্রকে স্পর্শ করবে

— যতো বেশি পরিমাণ সমস্যার সমাধান দিতে পারবে, সাহিত্যতত্ত্বের মতবাদবিশেষও ততো পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবে।

বলা বাহুল্য, মতবাদবিশেষের গুরুত্ব কেবল ক্ষেত্রের বিস্তারের উপরেই নির্ভর করে না। আরো-একটা জিনিসের উপর তা নির্ভর করে। সে হ'লো, গভীরতা এবং সামগ্রিকতা — বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরগুলির পারস্পরিক সঙ্গতি। বস্তুত, এইসব উত্তরের সঙ্গতিপূর্ণ সমগ্রতাই মতবাদবিশেষে সিস্টেমের গৌরব এনে দেয়। যে ঐক্য-বিধায়ক শক্তি এই অন্তঃসঙ্গতিকে রক্ষা করে, সিস্টেমের দিক থেকে দেখলে সেই আভ্যন্তরীণ শক্তিটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সাহিত্যতত্ত্ববিশেষের ভিত্তি-স্থানীয় প্রত্যয়ই তার অন্তঃসঙ্গতির মূল উৎস।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যত্ত্বের অন্তঃসঙ্গতির উৎস কোথায়? কোন্ বিশেষ প্রত্যয়কে আমরা এই সাহিত্যতত্ত্বের ভিত্তিস্থানীয় প্রত্যয় ব'লে গ্রহণ করতে পারি?

এক কথায় এর উত্তর দিতে হ'লে বলবো — আনন্দ। বলা বাহুল্য যে, এই আনন্দ মুক্ত। কিন্তু সব আনন্দই মুক্ত। মুক্ত না হ'লে তা আনন্দই নয়। মুক্তি আর আনন্দ এখানে প্রায় সামর্থক।

উপলব্ধির দিক থেকে দেখলে যাকে বলি আনন্দ, ক্রিয়াশীলতার দিক থেকে তাকেই বলতে পারি প্রকাশ, যার অর্থ হ'লো বিস্তার বা মিলন — বিচিত্রের সঙ্গে নিরন্তর সংযোগ-সাধনে বিচিত্র ও বহুল হ'য়ে-ওঠা। বিচিত্রের মধ্যে যে-ঐক্য তাকে যখন বলি সামঞ্জস্য, তখন অনায়াসে বলতে পারি যে, সামঞ্জস্যই সত্তার স্বরূপ। উপলব্ধি, ক্রিয়াশীলতা ও সত্তা পৃথক্ নয়। সুতরাং প্রকাশ, আনন্দ ও সামঞ্জস্য এরাও অভিন্ন। শুধু আনন্দ বললেই যথেষ্ট হ'তে পারতো, কিন্তু তাতে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের পূর্ণ তাৎপর্য সুস্পষ্ট হ'তো না। আনন্দটা যে মিলনেরই আনন্দ, তারই নাম যে প্রেম, এই কথাটাও স্পষ্ট ক'রে বলা দরকার। বস্তুত, প্রকাশ, আনন্দ ও সামঞ্জস্যের অভিন্নতাই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের কেন্দ্রস্থ প্রত্যয়।

এই যে নিরন্তর হ'য়ে-ওঠার প্রক্রিয়া — এই যে সামঞ্জস্যময় প্রকাশানন্দের লীলা, এরই নাম ক্রিয়েটিভিটি — সৃজনশীলতা। মানুষ ও বিশ্বের যে অন্তহীন বিরহ মিলনের পালার কথা, আমি ও না-আমির যে-নিত্য-সংযোগের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এই সৃজনশীলতার আলোকেই তাকে বুঝে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের মানবব্রহ্মবাদকেও এই সৃজনশীলতার সঙ্গেই মিলিয়ে দেখতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, প্রকাশের সত্য একান্তভাবেই মানব-সত্য। নিজেকে নিরন্তর বিস্তৃত করা, অপরের সঙ্গে মিলিত করা, মিলনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে

ঐশ্বর্যবান ক'রে তোলা, নিজেকে বিচিত্র ও বহুল ক'রে তোলা, এই হ'লো মানুষের স্বধর্ম। এরই মধ্যে দিয়ে মানুষ আত্মসত্যকে অর্জন করে।

নিজেকে অর্জন করার নামই প্রকাশ। তারই অপর নাম আনন্দ। সৃষ্টির প্রথম সত্য প্রকাশ, আর সৃষ্টির শেষ সত্য ভালোবাসা। ঈষৎ ভিন্ন ভাবানুষঙ্গে এবং যৎসামান্য তির্যক ব্যঞ্জনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাতেও অনেকটা এই কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন —

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে,
সৃষ্টির প্রথম রহস্য, — আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য — ভালোবাসার অমৃত।[১]

সৃষ্টির প্রথম রহস্যকে আলোকের প্রকাশ না-ব'লে প্রকাশের আলোক বললেও ভুল হয় না। প্রেমের আলোকও বলা চলে। কেননা, একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবো, এখানে প্রথম আর শেষের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই, কোনো ভেদও নেই। আরো একটু তলিয়ে যদি দেখি, তাহ'লে এ-ও বুঝতে পারবো যে, প্রেমের মধ্যে আত্ম-উৎসর্জন আর প্রকাশের পথে আত্ম-লাভ, এরা একই সত্যের দুই দিকের দুই রূপ। এই সত্যকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — সৃজন।

এই হ'লো মৌল প্রত্যয়, যাকে বলতে পারি রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বের কেন্দ্রস্থ শক্তি। এইবারে বিভিন্ন দৃষ্টিভূমির বিশিষ্ট প্রশ্নগুলির প্রসঙ্গ। দৃষ্টিভূমিগুলি কী, তা আমরা আগেই দেখেছি। কিন্তু প্রশ্নগুলি কী?

প্রথমত, খাঁটি তত্ত্বজিজ্ঞাসুর প্রশ্ন: সাহিত্য কী, তার স্বরূপ কী, বস্তুবিশ্বে — সত্তার জগতে তার স্থান কোথায়? এই একান্ত দার্শনিক প্রশ্নের দার্শনিক উত্তরে সাহিত্য-প্রেমিকের জিজ্ঞাসা কতোদূর তৃপ্ত হয় তা বলা কঠিন। হয়তো হয় না। কিন্তু কিন্তু সুদীর্ঘকাল ধ'রে এই প্রশ্নই সাহিত্যতত্ত্বের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়-রূপে মর্যাদা পেয়ে এসেছে। দ্বিতীয় হ'লো স্রষ্টার দিকের প্রশ্ন। অথবা সৃষ্টি-সংক্রান্ত এবং স্রষ্টা-সংক্রান্ত প্রশ্ন। প্রথমত, সৃষ্টি ব্যাপারটা কী? সৃজন-ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য কোথায়? এবং আনুষঙ্গিকভাবে প্রতিভা কী, কল্পনার কাজ কী ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, স্রষ্টার রহস্য। সৃষ্টিতে স্রষ্টার ভূমিকা কী, সৃজনক্রিয়ায় স্রষ্টার স্থান কতোখানি, শিল্পবস্তুতে রচয়িতার ব্যক্তিত্ব কতোখানি স্থান পায়, ইত্যাদি। তৃতীয় প্রশ্ন ভোক্তার দিকের। ভোক্তার মনে সাহিত্যের ক্রিয়া কী? যদি বলি আনন্দ, তো সে-আনন্দের স্বরূপ কী? যদি বলি রস, তো সে-রস কেমনভাবে সঞ্চারিত হয়? চতুর্থ প্রশ্ন সমাজের। সমাজ অর্থ এখানে মূলত ভোক্তাসমাজ। সুতরাং রস বা আনন্দ যে

এখানেও একটা বড়ো কথা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমাজ অর্থই যখন পারস্পরিক সম্পর্ক, আনন্দ ছাড়াও এখানে আরো অনেক বিবেচনার বিষয় আছে। কল্যাণ-অকল্যাণ, সামাজিক অগ্রগতি-পশ্চাৎগতির প্রশ্ন এখানে অপরিহার্য। সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকা কী, সাহিত্য সমাজকে কী কী দিতে পারে বা পারে না, সমাজ সাহিত্যকে কী চোখে দেখবে, সমাজের অধিকারকে রচয়িতা কতোখানি স্বীকার ক'রে নেবেন, এইসব সমাজগত জিজ্ঞাসা একক ভোক্তাকেও স্পর্শ করে। কেননা 'একক ভোক্তা' একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্বমাত্র — আসলে মানুষমাত্রেই সামাজিক জীব।

বিভিন্ন দিকের এইসব প্রশ্ন সামনে রেখে এইবার আবার রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। স্বভাবতই, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের কাছেও আমরা এই প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটির সুস্পষ্ট উত্তর প্রত্যাশা করবো। বস্তুত, সেই উত্তরসমূহকে গ্রথিত এবং সমন্বিত ক'রেই রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বের সমগ্রতা। অন্যদিকে, সমগ্রতা যদি অখণ্ড হয়, তাহ'লে এ-ও প্রত্যাশা করবো যে, সেই উত্তরগুলির প্রত্যেকটিই পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করবে, তাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বের অন্তর্নিহিত ঐক্যশক্তি সমানভাবে আভাসিত হবে, তাদের প্রত্যেকটিই রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বের মৌল প্রত্যয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকবে।

এ-কথা বলা বোধকরি অনাবশ্যক যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের সাধারণ পরিচয় দেবার প্রয়াসে এর আগে যে-সব বিষয়ের আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হয়েছি, তা মুখ্যত এই দিকে দৃষ্টি রেখেই। এখন, সেই সাধারণ পরিচয়ের উপান্তের কাছে এসে আমাদের কাজ শুধু পূর্বের আলোচনাসমূহের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা। অর্থাৎ বিভিন্ন দৃষ্টিভূমির বিশেষ বিশেষ প্রশ্নের উত্তরগুলিকে — রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বের বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত-সমূহকে পাশাপাশি সাজিয়ে নেওয়া।

সিদ্ধান্তগুলি এখন আর আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়, সেই কারণে এখানে তাদের উল্লেখই যথেষ্ট হবে, বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক পুনরুক্তির সৃষ্টি করবে।

রবীন্দ্রনাথ কখনো দার্শনিকের মতন ক'রে সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেননি। সাহিত্য কী, ঠিক কোন্ জাতীয় বস্তু — বস্তুবিশ্বে তার স্থান কোথায়, প্রাচীন সাহিত্য-শাস্ত্রীরা এ-প্রশ্নকে যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ মোটেই তা করেননি। সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর যা-কিছু বক্তব্য সবই তাঁর সাক্ষাৎ সাহিত্য-অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ ক'রে আছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে জীবনটাও একটা সৃষ্টি। যাকে জগৎ বলি, জীবন বলি, তা-ও

সাহিত্য। যা শিল্প বা সাহিত্য নামে পরিচিত, তা জীবনেরই বিশিষ্ট প্রকাশ। তা অনুকরণ নয়, স্বাধীন সৃষ্টি। তবে, তাকে জীবনের রূপায়ণ বলতে কোনো বাধা নেই।

জীবনের রূপায়ণ, এই অর্থে সাহিত্যকে অনুকরণ বলা যায় কি? কয়েকটি বাধা আছে। প্রথমত ব্যবহারিক বাধা। অনুকরণ কথাটির একালে প্রচুর অর্থাবনতি ঘটেছে। প্রাচীন পারিভাষিক অর্থটি এখন সীমিত ক্ষেত্রের বাইরে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃত। রবীন্দ্রনাথ কথাটিকে এখনকার প্রচলিত, অর্থাৎ অবনত অর্থেই ব্যবহার করেছেন। এখনকার দিনে সাহিত্যকে অনুকরণ বললে বিভ্রান্তি অবধারিত।

দ্বিতীয় বাধা তত্ত্বগত। যে-রূপায়ণ সৃষ্টিও বটে, তাকে অনুকরণ বলা চলে না। জীবন মানেই এক অন্তহীন রূপায়ণ-প্রক্রিয়া, অন্তহীন সৃজনশীলতা। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ জীবনকে সাহিত্য বলেছেন। আমরা যাকে সচরাচর সাহিত্য ব'লে থাকি, তা সেই বৃহৎ সৃজন-প্রবাহেরই একটি ধারা। সেই বৃহৎ সৃজন-প্রবাহের মধ্যে তথাকথিত জীবন এবং তথাকথিত সাহিত্য পরস্পরের সঙ্গে একাকার হ'য়ে থাকে। সেখানে সাহিত্য যেমন জীবনকে অনুসরণ করে, জীবনও তেমনি সাহিত্যকে অনুসরণ ক'রে চলে; জীবন যেমন সাহিত্যকে সৃষ্টি করে, সাহিত্যও তেমনি জীবনকে সৃষ্টি ক'রে চলে। জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে কোনো পূর্ব-পর নেই, কোনো পারম্পর্য নেই। অনুকরণে পারম্পর্য আছে। আদর্শ আগে, অনুকরণ পরে।

রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্যের মাঝখানের কঠিন ভেদরেখাকে মুছে দিয়েছেন। অনুকরণে নিজের বাইরে, নিজের থেকে পৃথক্ এবং পূর্বগামী একটা আদর্শ থাকতে হবে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে জীবন সাহিত্যের আদর্শ ব'লে স্বীকৃতি পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, সে-আদর্শ বস্তুত সাহিত্যের বহির্ভূত নয়, সাহিত্যের অনাত্মীয় নয়, এমন-কি মূলত পৃথক্‌ও নয়। দুই-ই মানব-সৃজিত। একই সৃজনশীলতা উভয়ক্ষেত্রে সমভাবে ক্রিয়াশীল। তুলনায় বরং সাহিত্যের মধ্যেই মানুষের আত্মকর্তৃত্ব অধিকতর পরিস্ফুট, কেননা সাহিত্যেই কল্পনা সম্পূর্ণ বাধাহীন, এইখানেই 'প্রয়োজন' সম্পূর্ণ পরাভূত।

প্রশ্ন হ'তে পারে, জীবন আসক্তির রাজ্য, সাহিত্য নিরাসক্তির। দুয়ের মাঝখানে অনেকখানি দূরত্ব। কিন্তু এ-আপত্তি চূড়ান্ত হ'তে পারে না। তার কারণ জীবনের সবটাই আসক্তি নয়। তাহ'লে ভালোবাসা জিনিসটা মিথ্যা হ'য়ে যেতো। যিনি 'ভালোবাসার অমৃত'কেই সৃষ্টির চরম সত্য ব'লে জানেন, তিনি আসক্তিকে নিশ্চয়ই চরম বলবেন না, অতএব তাঁর কাছে এ-আপত্তি অর্থহীন। রবীন্দ্রনাথের মতে, ভালোবাসাই জীবনকে সত্য ক'রে তোলে, ভালোবাসাই জীবনকে সাহিত্য

ক'রে তোলে। চিত্তের আবরণ ভগ্ন হ'য়ে গেলে, জীবন ও সাহিত্যের সমস্ত দূরত্ব ঘুচে যায়।

কেউ হয়তো এ-প্রশ্নও করতে পারেন যে, জীবন প্রত্যক্ষ বাস্তব আর সাহিত্য যা দেয় সে হ'লো মায়া-জগৎ। বাস্তব আর মায়ার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। কিন্তু এ-সিদ্ধান্তও নিতান্তই অর্ধসত্য। জীবনের মধ্যেও যে অনেক মায়া বাসা বেঁধে থাকে, তা কি আমরা জানি না? মায়া হ'লেই মিথ্যা হয় না। জীবনের ফাঁকগুলিকে মায়া দিয়ে পূরণ ক'রে নিয়েই জীবনকে আমরা সত্য ক'রে তুলি — মায়াকেও। কিন্তু সে-তর্ক এখন থাক। প্রশ্ন হ'লো, সত্যিই কি সাহিত্য কেবলই মায়া? এ-মায়ার প্রকৃতি বিচিত্র, মিথ্যার পথে ডেকে নিয়ে এ-মায়া আমাদের একেবারে সত্যের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে দেয়। মায়া হ'য়েও সাহিত্য আমাদের বাস্তবের মর্মসত্যের সন্ধান ব'লে দেয়। গ্যেটের উক্তি স্মরণ করি: "Man can find no better retreat from the world than art, and man can find no stronger link with the world than art"।

সাহিত্য ক্ষণিকের বটে, কিন্তু তার ক্ষণগুলিই নিত্য। সাহিত্য খেলনা বটে, কিন্তু সেই খেলনাই জীবনের নিগূঢ়তম সত্যের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেয়। জীবন নিজেই নিজের যে-সব সত্যের সন্ধান জানে না, সাহিত্যই জীবনকে সেই সব সত্যের সন্ধান ব'লে দেয়। ঘনীভূত জীবন-সত্যই সাহিত্যের সত্য।

এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে জীবনের থেকে 'অধিকতর সত্য' বলেছেন। সাহিত্য জীবনের অধমর্ণ নয়, সাহিত্য জীবনের দিব্যদৃষ্টি।

এরপর সৃষ্টির দিকের প্রশ্ন আর স্বতন্ত্রভাবে উত্তরের অপেক্ষা রাখে না। সৃষ্টি হ'লো স্বাধীনভাবে, অপ্রয়োজনের আনন্দে, অভিনববস্তুনির্মাণ। রবীন্দ্রনাথের মতে আমি আর না-আমির মিলনের মধ্যে দিয়েই মানুষের অভিনব-আত্মতানির্মাণ, তাতেই মুক্তি, তাতেই আনন্দ। আমি আর না-আমির মিলনেই সৃষ্টি। এই মিলনসাধনেই মানুষের স্বধর্মাচরণ। সৃষ্টি যুগপৎ বিশ্বসত্যের এবং মানুষের আত্মসত্যের রূপায়ণ, এমন রূপায়ণ যার মধ্যে মানুষের মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ। যেখানে কল্পনা বাধাহীন, সেইখানে মিলনও বাধাহীন। যেখানে কল্পনা বাধাগ্রস্ত, সেইখানে সৃষ্টিও বাধাগ্রস্ত।

রবীন্দ্রনাথের মতে, নিজত্বের উৎসর্জনের মধ্যে দিয়ে মানবত্ব অর্জনের নামই প্রতিভা। নিজের মধ্যে 'বিশ্বমানবমনের' প্রতিষ্ঠার শক্তিই প্রতিভা। এই শক্তিরই অপর নাম কল্পনা। সম-অনুভূতি বা একাত্মতা-বোধই কল্পনার মূল কথা। কল্পনার

সাহায্যে আমরা বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করি, খণ্ডতার চেতনাকে পার হ'য়ে সমগ্রতার বোধে প্রতিষ্ঠিত হই। তারই নাম সৃষ্টি। তাকেই বলি প্রকাশ।

ব্যক্তিত্ব কথাটাকে চল্‌তি সংকীর্ণ অর্থে ধরলে, সৃষ্টিতে ব্যক্তিত্বের উৎসর্জন। বৃহৎ অর্থে ধরলে, ব্যক্তিত্বের অর্জন। দুয়ের পার্থক্য আসক্তিতে। সৃষ্টির প্রধানতম শর্তই আসক্তিবর্জন।

এইবারে ভোক্তার দিকের প্রশ্ন। ভোক্তার মনে সাহিত্যের ক্রিয়া কী? সোজা কথায়, রস-সঞ্চার। ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের রসবাদী ধারাগুলিতে ভোক্তার সম্পর্কে এবং ভোক্তার চিত্তে রস-সঞ্চার ব্যাপার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে। সে-তুলনায়, দু-একটি নগণ্য ব্যতিক্রমকে উপেক্ষা করলে, সৃষ্টির দিকের বা স্রষ্টার দিকের আলোচনা নিতান্তই যৎসামান্য। এইটেই স্বাভাবিক। রস-কেন্দ্রিক সাহিত্য-তত্ত্ব অর্থই হ'লো রসিক-কেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্ব। রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে স্রষ্টাও রসিক, স্রষ্টাও ভোক্তা। সেই কারণে স্রষ্টার স্বতন্ত্র আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের আলোচনার ভারকেন্দ্র সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তা, সম্ভবত সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক ব'লেই মুখ্যত সৃষ্টি-কেন্দ্রিক সাহিত্যচিন্তা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে স্রষ্টার দিকের প্রশ্নগুলিই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সকলেই স্রষ্টা — ভোক্তাও স্রষ্টা। সেই কারণে ভোক্তার স্বতন্ত্র আলোচনা অনেকটা অনাবশ্যক ব'লেই বোধকরি বিবেচিত হয়েছে। ভারতীয় রসবাদীরা সাহিত্যের যে-আনন্দের কথা বলেছেন, তা সম্ভোগের আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের যে-আনন্দের কথা বলেছেন, তা প্রধানত সহিতত্বের বা মিলনের আনন্দ — অর্থাৎ সৃষ্টির আনন্দ।

এমন বললে ভুল হবে যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে ভোক্তার দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে। এই কথাই বলতে হবে যে, সেখানে ভোক্তাও স্রষ্টার গুরুত্ব স্রষ্টার মর্যাদা লাভ করেছে। আসল কথাটা এই যে, ভারতীয় রসবাদীদের কাছে রসের গুরুত্বই সব থেকে বেশী। স্রষ্টার স্বতন্ত্র ভূমিকাকে অস্বীকার না-ক'রেও, স্রষ্টাকে তাঁরা প্রধানত রসিকরূপেই দেখতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে সৃষ্টির গুরুত্বই সর্বাধিক। ভোক্তার স্বতন্ত্র ভূমিকাকে তিনি অস্বীকার করেননি, সাহিত্য যে রসাত্মক বাক্য এ-কথা তিনিও একধিকবার বলেছন। তা সত্ত্বেও ভোক্তাকে তিনি স্রষ্টারূপে — শুধু ভোক্তা কেন, মানুষমাত্রকেই তিনি স্রষ্টারূপে দেখেছেন। এইটেই তাঁর কাছে সব থেকে বড়ো কথা।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে, ভোক্তৃত্বে এককেরই অধিকার, সম্ভোগ একটা

নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ এমন কথা বলবেন না। কেননা তাঁর মনে বিচ্ছিন্ন একক — নিছক একলা-মানুষ একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব, বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই। ঠিক তেমনি, স্রষ্টা-ভূমিকাও একলা-মানুষের নয়। "সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে···।"[২] তাহ'লে সাহিত্য কার, কে সৃজনকর্তা? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সাহিত্যকারের ··· মানবত্বই সৃজনকর্তা।"[৩] এই মানবত্বকে তিনি বলেছেন 'বিশ্বমানবমন'। "লেখককে যখন আমরা অত্যন্ত নিকটে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখি তখন লেখকের সঙ্গে লেখার সম্বন্ধটুকুই আমাদের কাছে প্রবল হইয়া উঠে; তখন মনে করি গঙ্গোত্রীই যেন গঙ্গা সৃষ্টি করিতেছে।"[৪] সম্মিলিত মানুষই সৃষ্টিকর্তা — সে-ই মানুষকে মানুষ ক'রে তুলেছে। সমাজ সভ্যতা সাহিত্য বিজ্ঞান সবই তার সৃষ্টি। "সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মন, মনের নিগূঢ় এবং অমোঘ নিয়মেই আপনাকে কেবলই প্রকাশ করিয়া অপরূপ মানসসৃষ্টি পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে। তাহার কত রূপ, কত রস, কতই বিচিত্র গতি।"[৫]

স্রষ্টাই হোক্ আর ভোক্তাই হোক্, কেউ যখন একলা-মানুষ নয়, মানুষের সমস্ত অনুভব সমস্ত চিন্তা সমস্ত কর্মের মধ্যেই যখন 'সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মনে'র দান আছে, তখন সাহিত্যকে সমষ্টির দিক থেকে দেখার প্রয়োজনীয়তাকে আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না। এইখানেই সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকার প্রশ্ন। এইখানেই সামাজিক কল্যাণ অকল্যাণ শুভাশুভের প্রশ্নের গুরুত্ব।

আর-একটি প্রশ্নও প্রায়ই উত্থাপিত হ'য়ে থাকে : সাহিত্যের লক্ষ্য কী? আপাত-দৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে প্রশ্নটি যেন সাহিত্যের নিজস্ব ভূমিরই প্রশ্ন, সাহিত্য নিজেই যেন আপন কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসু।

আসলে, সাহিত্যের নিজস্ব লক্ষ্য বা নিজস্ব অভিপ্রায়ের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। সাহিত্য আছে, এইটেই তার শেষ কথা। অভিপ্রায় থাকতে পারে স্রষ্টার, ভোক্তার, সমাজের। শুধু থাকতে পারে কেন, থাকেও। সে-অভিপ্রায় একরকমের নয়, একাধিকরকমের। কিন্তু তার সবগুলোই ঠিক সাহিত্যিক অভিপ্রায় নয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে, স্রষ্টা ভোক্তা সমাজ তিনেরই সাক্ষাৎ অভিপ্রায় আনন্দ। এইটেই মুখ্য অভিপ্রায় এবং সাহিত্যিক অভিপ্রায়। সাহিত্য আনন্দ ছাড়াও আরো অনেকরকম উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হ'য়ে থাকে। তাতে নিন্দনীয় কিছু নেই। সেইসব উদ্দেশ্যের মধ্যে অনেকগুলিই খুব গুরুত্বপূর্ণ, খুব মূল্যবানও হ'তে পারে। সাধারণভাবে তাদের সাহিত্য এলাকার বাইরের বিষয় ব'লে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি বটে।

কিন্তু মুশকিল হয় তখনই, যখন নিছক সাহিত্যগত আনন্দের সঙ্গে সেইরকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ জীবন-মূল্যের বিরোধ ঘটে। প্রশ্ন ওঠে, সত্যই কি সামাজিক শুভাশুভের প্রশ্নকে আমরা কখনো সম্পূর্ণ ভুলে থাকতে পারি? কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্ন কি আনন্দকেও স্পর্শ করে না?

রবীন্দ্রনাথের কাছে সমাজকল্যাণের প্রশ্নটি কখনোই অগ্রাধিকার পায়নি। তবে, সত্যিকারের সাহিত্য যে কখনো অকল্যাণকর হ'তে পারে, এমন সন্দেহকে রবীন্দ্রনাথ কদাচিৎ-ই প্রশ্রয় দিয়েছেন। সমাজের দৃষ্টি দিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তাকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই অস্বীকার করেননি। কিন্তু তাঁর বিবেচনায় সে-প্রসঙ্গটি সাহিত্যতত্ত্বের নিজস্ব প্রসঙ্গ নয়। সমাজ যখন আর্টিস্টের কাছে কল্যাণের দাবি নিয়ে সরাসরি এসে উপস্থিত হয়, তখন সমাজেরও ক্ষতি, আর্টেরও ক্ষতি। গ্যেটের ভাষায় রবীন্দ্রনাথও বলতে পারেন, "A work of art may have a moral effect, but to demand moral purpose from the artist is to make him ruin his job"।

আনন্দ আর কল্যাণের মধ্যে কখনো যে বিরোধ ঘটতে পারে, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ মোটেই বিশ্বাস করেন না। রবীন্দ্রনাথের কাছে কল্যাণ অর্থই হ'লো সামঞ্জস্য। সামঞ্জস্য অর্থই বিচিত্রের ঐক্য, সামঞ্জস্য অর্থই মিলনসাধন। তা সব সময়ই আনন্দকর। বস্তুত, রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বে কল্যাণ, সত্য, আনন্দ এবং সুন্দর অভিন্ন। কিন্তু যেহেতু রবীন্দ্র-চিন্তায় স্রষ্টার ভূমিকাই সব সময় অগ্রাধিকার পেয়েছে, সেইহেতু আনন্দই এখানে সব থেকে গোড়াকায় সত্য ব'লে গৃহীত হয়েছে। সমাজের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে তারই নাম কল্যাণ। সামঞ্জস্য ছাড়া কল্যাণের অপর-কোনো মাপকাঠি নেই। লক্ষ করলেই বুঝতে পারবো, রবীন্দ্রনাথের নীতিবোধও ইস্থেটিক নীতিবোধ, রবীন্দ্রনাথের নীতিতত্ত্ব শিল্পীর নীতিতত্ত্ব। সৌষম্যই সেখানে শেষ কথা।

বলা বাহুল্য, এ-সৌষম্য শেষ পর্যন্ত মানুষের উপলব্ধি-ব্রহ্মাণ্ডেরই সৌষম্য। এর ভিত্তি মানুষ ও বিশ্বের অযুতসিদ্ধ সম্পর্ক, আমি আর না-আমির নিরন্তর বিরহ-মিলন-প্রবাহ। প্রবাহটাই সত্য, আলাদা ক'রে মানুষও নয়, বিশ্বও নয়। এই প্রবাহই মানববিশ্ব। আবার এই প্রবাহই বিশ্বমানব। একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানবব্রহ্ম।

১. ১৫, 'পত্রপুট', র । ৩ । ৩৮১

২. ''সাহিত্যের তাৎপর্য'', 'সাহিত্য', র।১৩।৭৩৯

৩. ''সাহিত্যের বিচারক'', 'সাহিত্য', র।১৩।৭৪৭

৪-৫. ''সাহিত্যসৃষ্টি'' 'সাহিত্য', র।১৩।৭৯৩

কয়েকটি মন্তব্য

আমরা দেখেছি, যা-কিছু মিলন ঘটায়, রাবীন্দ্রিক পরিভাষায় তাকেই সাহিত্য বলা যেতে পারে। মিলন কথাটার অর্থ বহু-বিস্তৃত। মানুষের প্রায় সমস্ত ক্রিয়ার মধ্যেই মানুষ নিজেকে বাইরে সম্প্রসারিত করে এবং বাহিরকে নিজের মধ্যে স্বীকৃত করে। সে-দিক থেকে দেখলে, সূক্ষ্ম অর্থে মানুষের প্রায় সব ক্রিয়াই মিলন-সাধক। রবীন্দ্রনাথের অর্থকে গ্রহণ করলে, মানুষের সব ক্রিয়াই সাহিত্য। মানুষ সব সময়ই প্রকৃতিকে, মানব-সমাজকে এবং বিশ্বজগৎকে ছুঁয়ে আছে। মানুষ সব সময়ই প্রকৃতির সঙ্গে, মানব-সমাজের সঙ্গে, বিশ্বজগতের সঙ্গে মিলতে চেষ্টা করছে। মানুষের গোটা জীবনটাকে একটা নিরবচ্ছিন্ন মিলনসাধন-প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। সে-দিক থেকে, সমগ্র মানবজীবনকেই আমরা সাহিত্য বলতে পারি।

বলতে পারি বটে, কিন্তু বলি না। সাহিত্য কথাটাকে আমরা রাবীন্দ্রিক অর্থে ব্যবহার না-ক'রে সাধারণত প্রচলিত অর্থেই ব্যবহার ক'রে থাকি। প্রচলিত অর্থে সাহিত্য অনেক সংকীর্ণ এবং বিশিষ্ট ব্যাপার। সাহিত্য হ'লো ইংরেজিতে যাকে বলে লিটারেচার, ভাষারচিত শিল্প — কাব্য নাটক গল্প উপন্যাস ইত্যাদি।

কেউ যদি জীবনকেই সাহিত্য বলেন — অস্তিত্বমাত্রকেই সাহিত্য বলেন ? জীবন যদি সত্যিই সহিতত্ব-সাধক হয়, অস্তিত্বমাত্রেই যদি মিলনসাধন-প্রক্রিয়া হয়, সেক্ষেত্রে জীবনকে বা অস্তিত্বমাত্রকে সাহিত্য বললে আপত্তি করার কিছু নেই। যিনি সেই-রকম বিশ্বাস করেন, তিনি অনায়াসে সাহিত্য কথাটাকে এইরকম সুবৃহৎ অর্থেও ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রচলিত অর্থে যা সাহিত্য, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। যিনি লিটারেচারের তত্ত্ব চান, তাঁকে জীবনের তত্ত্ব পরিবেশন করলে তাঁর কৌতূহল নিবৃত্ত হবে না।

রবীন্দ্রনাথ জীবনকেই সাহিত্য বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি মিলন-ব্যাপারের সাধারণ সত্যের দিকে। লিটারেচার যে-মিলন ঘটায় তা জীবনের বৃহৎ মিলন-ব্যাপারের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। প্রচলিত অর্থে যা সাহিত্য, তাকে নিয়েই যাঁদের জিজ্ঞাসা, তাঁদের সমস্ত কৌতূহল কিন্তু ওই ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকে নিয়েই — তার বিশিষ্টতাকে নিয়ে, তার স্বাতন্ত্র্যকে নিয়ে। কাব্য-জিজ্ঞাসু নাট্য-জিজ্ঞাসু — বিশিষ্ট

অর্থে সাহিত্য-জিজ্ঞাসু পাঠকের প্রসারিত হাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমুচ্চ দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ তুলে দিয়েছেন। যিনি জীবনতত্ত্ব চান না, যিনি থিয়োরি অব লিটারেচারই চান, তার বেশিও নয়, কমও নয়, তাঁর বিশেষ জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর এই দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা যে কেবলই একটা দর্শনতত্ত্ব এমন বললে হয়তো একটু বাড়াবাড়ি হবে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় একাধিক স্তর আছে। এক-এক স্তরে আলোচনার ঝোঁক এক-এক রকম। কখনো ঝোঁকটা যথার্থই আর্টমুখী, প্রচলিতঅর্থেই সাহিত্যমুখী। আবার কখনো-কখনো ঝোঁকটা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই দর্শন-অভিমুখী।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার যে-দিকটা 'সাহিত্যতত্ত্ব' নামে পরিচিতি বা স্বীকৃতি পেয়েছে, তার ঝোঁক অল্প-বিস্তর দর্শন-অভিমুখী। অথবা বলতে পারি, সেই অভিমুখী আর্ট এবং জীবনের যা সাধারণ-ভূমি, সত্তা এবং শিল্প যেখানে এক।

আগেই দেখেছি, সহিতত্ব বা মিলন — এইখানেই আর্ট ও জীবনের সমধর্মিতা। সাহিত্যতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথের একাগ্র দৃষ্টি এই দিকে। কিন্তু জীবন যে ঢালাও অর্থে মিলন-সাধক, আর্টকে ঠিক সেই অর্থে মিলন-সাধক বললে আর্টের বিশেষ রহস্যটাই না-বলা থেকে যায়। আর্টের দ্বারা সংসাধিত মিলন যে একটা বিশেষ-ধরনের মিলন, এ-কথা মানতেই হবে। এই বিশেষত্বকে নিয়েই সাহিত্য-জিজ্ঞাসুর, আর্ট-জিজ্ঞাসুর আসল কৌতূহল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে আর্ট বা সাহিত্যের এই বিশিষ্টতার দিকটি বহুল-পরিমাণে উপেক্ষিত হয়েছে।

কিন্তু এই দর্শন-অভিমুখী সাহিত্যচিন্তাকে বাদ দিলেও, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তায় আর-একটি ধারার সন্ধান পাওয়া যায় যা বরাবরই প্রত্যক্ষ সাহিত্যবস্তুকে স্পর্শ ক'রে আছে। তা হয়তো কিছু অবিন্যস্ত এবং অসম্পূর্ণ, সেই কারণে তাকে হয়তো তত্ত্ব বলাও সঙ্গত হবে না, কিন্তু সাহিত্যজিজ্ঞাসুর আসল প্রাপ্তি সেইখানেই। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতায়, গানে, নাটকে, ভ্রমণকথায়, চিঠিপত্রে — না-চাইতেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের যত্রতত্র তা ছড়িয়ে আছে। কিন্তু যেহেতু তা সুগ্রথিত নয়, যেহেতু তার তত্ত্ব-রূপটি সুপ্রকটিত নয়, এবং যেহেতু সাহিত্যতত্ত্ব নামে অপর একটি সুপরিচিত ধারা সব সময় আমাদের চোখের সামনে বিরাজমান, সেইহেতু এইসব ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত মত মন্তব্য ও ইঙ্গিতকে সরকারীভাবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব হিসাবে গণ্য করা হয় না। সাহিত্যতত্ত্বরূপে সরকারীভাবে স্বীকৃত প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই দর্শনধর্মী দর্শন-ঘেঁষা বা দর্শন-নির্ভর। আমাদের সচেতন প্রত্যাশা তাদেরই কাছে। আশাভঙ্গ যদি কিছু ঘ'টে থাকে, তাদের দ্বারাই ঘটেছে।

ঝোঁকের তারতম্য অনুসারে এইসব প্রবন্ধগুলিকে আমরা মোটামুটিভাবে দুই ধারায় ভাগ করতে পারি। এক, যা জীবনতত্ত্বের সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই একাত্ম — যা দর্শনতত্ত্বেরই প্রায় নামান্তর। দুই, যা দর্শন-নির্ভর কিন্তু মূলত সাহিত্যতত্ত্ব। প্রথম ধারার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের মূল-অংশের অধিকাংশ প্রবন্ধ। দৃষ্টান্ত হিসেবে "কবির কৈফিয়ত", "সাহিত্য", "সৃষ্টি" ইত্যাদি প্রবন্ধের নাম করতে পারি। এইসব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের দার্শনিক পূর্ব-স্বীকৃতির পরিচয় পাওয়া যাবে, কিন্তু থিয়োরি অব লিটারেচারে সাধারণত যে-সব সাহিত্য-প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজি, তা এখানে মিলবে না।

দ্বিতীয় ধারার সাহিত্যচিন্তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন মিলবে 'সাহিত্য' গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহে। প্রবন্ধগুলি দর্শন-নির্ভর, কিন্তু একান্তভাবে দার্শনিক নয়। এখানেও দার্শনিক পূর্ব-স্বীকৃতি আছে, কিন্তু মূল আলোচনাটা তাকে নিয়ে নয়, মূল বক্তব্য সাহিত্য-প্রশ্নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। সাধারণ সাহিত্যজিজ্ঞাসু হিসেবে আমাদের যা-কিছু প্রশ্ন, তা এই দুই ধারাকে মিলিয়ে নিয়েই।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের পূর্ব-স্বীকৃতিগুলি কী ? সব থেকে উল্লেখযোগ্য পূর্ব-স্বীকৃতি দুটি। এক, মিলন বা আনন্দের তত্ত্ব। দুই, রবীন্দ্রনাথের মানবব্রহ্মবাদ। এর যে-কোনো একটিকে অস্বীকার করলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের সামগ্রিক আবেদন আমাদের আছে অনেকখানি ক'মে যাবে। পূর্ব-স্বীকৃতিদুটিকে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করাই ভালো। প্রথমে আনন্দবাদের কথা ধরা যাক।

সত্তা যে রস-স্বরূপ, উপলব্ধিমাত্রেই যে আনন্দময়, এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথ একেবারে গোড়াতেই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। যিনি এই তত্ত্বকে অস্বীকার করেন, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বকে তিনি কীভাবে গ্রহণ করবেন ? মনে রাখতে হবে, তত্ত্বটি স্বতঃসিদ্ধও নয়, সর্বজন উপলব্ধিগম্যও নয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন ঐকান্তিক আনন্দবাদী, তেমনি ঐকান্তিক দুঃখবাদীর সংখ্যাও দার্শনিকদের মধ্যে কম নয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন, দুঃখটাও আনন্দ, তেমনি, আনন্দটাও দুঃখ, এ-কথা বলবারও লোকের অভাব নেই।

জগৎ আনন্দময় কি দুঃখময়, সত্তা রস-স্বরূপ কি যন্ত্রণা-স্বরূপ, এ-প্রশ্নের মীমাংসা সাহিত্যতত্ত্বের কর্ম নয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের অন্যতম প্রধান পূর্ব-স্বীকৃতির সত্যতা যাচাই করা এখানে আমাদের কাজ নয়। আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, কোনো সাহিত্যতত্ত্ব যখন বিশেষ কোনো দর্শন-প্রস্থানের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হ'য়ে পড়ে, তখন তার গ্রহণীয়তা সীমিত হ'য়ে পড়ে।

একটা কথা এখানে স্মরণ রাখতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ আনন্দ

কথাটাকে মোটেই প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করেননি। রবীন্দ্রনাথের কাছে উপলব্ধি আর আনন্দ সমার্থক। দুঃখ ছদ্মবেশী আনন্দ নয়, দুঃখরূপেই তা আনন্দ, উপলব্ধি ব'লেই তা আনন্দ। আনন্দ কথাটার প্রচলিত ভাবানুষঙ্গকে যদি বাদ দিতে চাই, তাহ'লে এমনও বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের কাছে উপলব্ধিমাত্রেই মূল্যবান — অপর-কিছুর জন্য নয়, নিছক উপলব্ধি ব'লেই। কেননা, রবীন্দ্রনাথের কাছে উপলব্ধিই জীবন। একে আনন্দবাদ না-ব'লে উপলব্ধিবাদ অথবা জীবনবাদও বলতে পারি।

আনন্দবাদ বলতে সাধারণত যে-তত্ত্বকে আমরা বুঝে থাকি, সেই আনন্দবাদ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের পূর্ব-স্বীকৃতি নয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের পূর্ব-স্বীকৃতি, বরং বলতে পারি, উপলব্ধিবাদ অথবা জীবনবাদ। এ-সাহিত্যতত্ত্ব জীবনরসিকের সাহিত্যতত্ত্ব। সাহিত্যরসিকমাত্রেই জীবনরসের রসিক। এই দিক থেকে দেখলে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের এই পূর্ব-স্বীকৃতিকে সাহিত্যরসিকের সাক্ষাৎ সাহিত্য-অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত ব'লে দাবি করা যায়। অন্তত তাকে একান্তভাবে দার্শনিক সিদ্ধান্ত ব'লে অভিযুক্ত করার কোনো যুক্তি থাকে না।

এইবারে রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বের দ্বিতীয় পূর্ব-স্বীকৃতি, অন্য নামের অভাবে যাকে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের মানবব্রহ্মবাদ।

মানবব্রহ্ম কথাটা নতুন। কথাটার কোনো ঐতিহ্যগত পশ্চাৎপট নেই। মানব কথাটা বহু-ব্যঞ্জনাবহ, ব্রহ্ম কথাটা ততোধিক। উভয়ের মিলনে যে নতুন শব্দটি সৃজিত হ'লো, তার অর্থও যেমন অনির্দিষ্ট, ইঙ্গিতও তেমনি নানামুখী। প্রয়োগের প্রসঙ্গ থেকে অনুমান করতে পারি, 'নর-নারায়ণ', 'জীব-শিব', 'সোহম্', 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি কথার ভাবানুষঙ্গ থেকে মানবব্রহ্ম কথাটার ভাবানুষঙ্গ সম্পূর্ণ পৃথক্। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত অর্থটা যে ঠিক কী, তা নির্ণয় করা সহজ নয়।

মানব এবং ব্রহ্ম, এই দুই পৃথক্ ভাবভূমির পৃথক্ কথাদুটিকে সার্থকভাবে সমন্বিত করতে হ'লে এমন একটি তৃতীয় ভাবভূমির প্রয়োজন, যেখানে ব্রহ্মও আর পুরাতন পরিচিত ব্রহ্ম নয়, মানবও আর পুরাতন পরিচিত মানব নয়, যেখানে তৃতীয় শক্তির প্রভাবে দুয়েরই মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। এই তৃতীয় শক্তির উৎস কোথায়?

এই শক্তির উৎস উপনিষদের ব্রহ্মও নয়, রক্তমাংসের মানুষও নয় — কেননা তারা তৃতীয় ভাবভূমির শক্তি নয়। রক্তমাংসের বাস্তব মানুষের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অনবহিত ছিলেন না। প্রয়োজনের জগতে আবদ্ধ সেই মানুষের প্রত্যক্ষ বাস্তবতাকে রবীন্দ্রনাথ তথ্য বলেছেন, সত্য বলেননি। এ-ক্ষেত্রে বরং উপনিষদের

ব্রহ্মের কথা সহজেই মনে আসতে পারে। কেননা ঔপনিষদিক-বৈষ্ণবীয়-হেগেলীয় ব্রহ্মবাদী ভাবকল্পনার নিদর্শন রবীন্দ্র-সাহিত্যে সুপ্রচুর।

কিন্তু মানবব্রহ্মের ক্ষেত্রে এইসব সাধারণ নিদর্শনের উপর খুব বেশি নির্ভর করা সঙ্গত হবে না। রবীন্দ্রনাথ আশৈশব ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের পরিমণ্ডলে লালিত। রবীন্দ্র-সাহিত্যেও একেবারে প্রথম থেকেই তার সাক্ষাৎ পাই। তখন কিন্তু তার সঙ্গে মানব কথাটিকে যুক্ত করার কোনো প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেননি। মানবব্রহ্ম কথাটা রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের সৃষ্টি। চিন্তা ও অনুভবের ক্ষেত্রে নতুন-কিছু না-ঘটলে, কোনো নতুন চেতনা বা নতুন প্রয়োজন উপস্থিত না-হ'লে, এই-ধরনের একটা নতুন নামকরণে রবীন্দ্রনাথ প্রবৃত্ত হবেন কেন ? রবীন্দ্র-চিন্তার পরিণতি-পর্বের একটা বিশেষ ধাপে এসে না-পৌছনো পর্যন্ত আমরা ঔপনিষদিক ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ পাই, মানবব্রহ্মের সাক্ষাৎ পাই না। চিন্তার যে-স্তরে এসে মানবব্রহ্মের সাক্ষাৎ পেলাম, সেই স্তরে তারই একাধিপত্য। এর রূপ এতো স্বতন্ত্র যে এর পাশে উপনিষদের ব্রহ্মকে অনেক পেছনে ফেলে-আসা দূরের জিনিস ব'লে মনে হয়।

তৃতীয় শক্তির উৎস উপনিষদের ব্রহ্ম নয়, রক্তমাংসের বাস্তব মানুষও নয়, সে হ'লো রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, ইতিহাসের মানুষ — মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শ। এই আদর্শকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের মধ্যেকার মানব। বলেছেন, দেবতা। কথাটা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন,

"মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে।...

"কিন্তু, মানুষের আর একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। ...সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।"[১]

মানুষের এই শেষোক্ত দিকটিকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মনুষ্যত্ব — মানুষের ধর্ম। এই শক্তি প্রত্যেক মানুষের অন্তরে সদা-জাগ্রত, সতত ক্রিয়াশীল। এই শক্তিই মানব-সম্মিলনের মধ্যে নিজেকে অভিব্যক্ত করে। এই শক্তিই মানব সভ্যতার অগ্রগতির শক্তি। একে রবীন্দ্রনাথ দেবতাও বলেছেন, আবার মানবও বলেছেন।

"আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। ... সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে ... ।"[২]

'মানুষের ধর্মে'র গোড়াতেই আবার এই একই কথা পাচ্ছি। এখানে রবীন্দ্রনাথ

মানুষকে দেখেছেন তার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের দিক থেকে। প্রাণীর ক্রমবিকাশে প্রতিযোগিতা যেমন সত্য, সহযোগিতাও তেমনি সত্য। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস প্রধানত সহযোগিতা ও সংযোগের ইতিহাস। প্রতিযোগিতার থেকে সহযোগিতা মানুষের পক্ষে অনেক বড়ো সত্য, কেননা প্রতিযোগিতায় মানুষের জৈবধর্মই অভিব্যক্ত, সহযোগিতাতেই মানুষের মনুষ্যধর্ম।—

"তার [মানুষের] সফলতা সহযোগিতায়। [মানুষ] বুঝতে পারে বহুর মধ্যে সে এক।...দেখতে পায় জ্ঞানে কর্মে ভাবে যতই সকলের সঙ্গে যে যুক্ত হয় ততই সে সত্য হয়। যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা।"[৩]

বক্তব্যকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে এ-ও বলতে পারি যে, যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই সংযোগই মানুষকে মানুষ ক'রে তুলেছে এবং উত্তরোত্তর পূর্ণতর ক'রে তুলছে। মানুষ প্রথমাবধি গোষ্ঠীবদ্ধ, সমাজবদ্ধ — প্রথমাবধিই সম্মিলিত। সহযোগিতা ও সম্মিলনের মধ্যে নিহিত মূল্যগুলিই যথার্থ মানব-মূল্য। সেই আদর্শের ঘনীভূত রূপকেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানব বলেছেন। রবীন্দ্র-নাথের মতে, এই বিশ্বমানবই মানুষকে মানবত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি বলেছেন, "সাহিত্যে বিশ্বমানবই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে।"[৪]

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের এই প্রকাশলীলাকে কেবল সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ক'রে দেখেননি। মানুষের কোনো মূল্যবান কর্মসাধনাকেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসাধনা থেকে জাতিগতভাবে পৃথক্ ব'লে মনে করেন না। রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষের সমস্ত মানবোচিত কর্মপ্রয়াসের মধ্যেই — মানুষের সমাজ সংসার সংস্কৃতি সব-কিছুর মধ্যেই বিশ্বমানবের প্রকাশলীলা অব্যাহত। মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে বিশ্বমানবেরই আত্মপ্রকাশের ইতিহাস।

মানব-ইতিহাসের এই ব্যাখ্যা কি বিজ্ঞানসম্মত? জীববিজ্ঞানে অভিব্যক্তিবাদের যে-ব্যাখ্যা ডারউইনের নামের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে আছে, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এতাবৎকাল পর্যন্ত মানব অভিব্যক্তির সমস্ত প্রচলিত ব্যাখ্যাই মোটামুটিভাবে সেই ডারউইনীয় ব্যাখ্যার অনুসরণ ক'রে এসেছে। প্রায় সমস্ত ব্যাখ্যারই জোর মানুষের মৌল জৈবতার উপর। প্রায় সমস্ত ব্যাখ্যারই মূলসূত্র এই যে, সভ্যতায় মানুষের এই জৈবতার মধ্যে বা মানুষের মনুষ্যত্বের মধ্যে কোনো গুণগত পরিবর্তন ঘটে না। ফ্রয়েড-প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরাও মানুষের অন্তর্নিহিত এই পশুত্বকে আমাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছেন। এই ব্যাখ্যাই যদি একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা হয়, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথের মানবতত্ত্ব অবশ্যই অবৈজ্ঞানিক মানবতত্ত্ব।

কিন্তু সম্প্রতিকালের অনেক নৃতত্ত্ববিদ্ ও পুরাতত্ত্ববিদ্, অনেক সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী এইধরনের জৈবতা-ভিত্তিক মানবতত্ত্বের সম্পর্কে গভীর অনাস্থা প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। বায়োলজির সত্যকে তাঁরা অস্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁদের মতে, নিছক বায়োলজি নয়, মানব ইতিহাসের অগ্রগতিতে পারস্পরিক সহযোগিতার, প্রেম-প্রীতি-সৌহার্দ্যের গুরুত্ব সমধিক। মানুষ যে সামাজিক জীব হিসেবেই মানবিক তাৎপর্যের অধিকারী, সামাজিক জীব হিসেবেই যে মানুষ যথার্থভাবে মানুষ হ'য়ে উঠেছে এবং উঠছে, মানব-সম্মিলনের মধ্যে যে-সত্য নিহিত সেই সত্যই যে মানুষের সমস্ত অগ্রগতির উৎস, এঁরা সকলেই কম-বেশী এই সিদ্ধান্তের সমর্থক।

মানব-ইতিহাসের অগ্রগতির প্রসঙ্গে সহযোগিতা, প্রীতি ও সৌভ্রাত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে-সব কথা বলেছেন, তার অনেক কথাই আধুনিক গবেষকেরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করবেন। যে-মানুষ মেলে এবং মেলায়, শেখে এবং শেখায় দেয় এবং নেয়, যে-মানুষ নিজের মধ্যে দিয়ে অপরকে এবং অপরের মধ্যে দিয়ে নিজেকে পায়, সেই মানুষই যে সভ্যতার সঞ্চালক শক্তি, রবীন্দ্রনাথের মতো এঁরাও এই সত্যে আস্থাশীল। ঠিক মানবব্রহ্মে না-হোক্, রবীন্দ্রনাথের মতো এঁরাও মানব-সম্মিলনের সত্যে বিশ্বাসী, মানব-সত্যে বিশ্বাসী। মানবব্রহ্ম বলতে রবীন্দ্রনাথ যদি সমাজবদ্ধ সংস্কৃতিবদ্ধ মানুষকেই বুঝে থাকেন, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথের মানবব্রহ্মবাদকে আজ আর বিজ্ঞান সম্মত নয় ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কিন্তু মানবব্রহ্ম বলতে রবীন্দ্রনাথ কি সত্যিই সমাজবদ্ধ, সংস্কৃতিবদ্ধ মানব-সম্মিলনকেই বুঝেছিলেন? আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের মানবব্রহ্মবাদ ঠিক যে কী বস্তু তা নির্ণয় করা সুকঠিন। রবীন্দ্রনাথ মানব-সম্মিলনের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু তার তাৎপর্য যে কোন্ অভিমুখী তা স্পষ্ট করেননি। সমাজবদ্ধতা ও সংস্কৃতিবদ্ধতা বলতে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক যা বোঝেন, রবীন্দ্রনাথও যে অবিকল সেই জিনিসই বুঝেছেন, এ-কথা জোর ক'রে বলবার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকের বক্তব্যের মিল যেমন অনেকখানি, পার্থক্যও তেমনি কম গভীর নয়।

প্রথম পার্থক্য স্পষ্টতার। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য একই সঙ্গে বিভিন্ন ভাবভূমিকে স্পর্শ ক'রে আছে, কিন্তু কোনো ভাবভূমিতেই খুব দৃঢ়ভাবে লগ্ন নয়। উপরন্তু, কবিকল্পনার প্রবলতার ফলে, এবং ইতস্তত রোমান্টিকতার ঐন্দ্রজালিক বর্ণসন্নিপাতের কারণে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর রহস্যকুহেলিমণ্ডিত, অন্তত কোনো

ক্ষেত্রেই তা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের মতো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয় — পরিষ্কারভাবে কাটা-ছাঁটা নয়। দ্বিতীয় পার্থক্য গভীরতর। তার উৎস রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী সংস্কার।

নৃতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বে আধুনিক গবেষকেরা যাকে বলেছেন সমাজ ও সংস্কৃতি, জানিনা রবীন্দ্রনাথ হয়তো তাকেই মানব-সম্মিলন বলেছেন, কিন্তু তা যদি হয়ও, রবীন্দ্রনাথ এই মানব-সম্মিলন নামের মধ্যে দিয়েই ব্যাপারটাকে অনেকখানি শোধিত ক'রে নিয়েছেন। এই মানব-সম্মিলনকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সর্বজনীন মন। লক্ষনীয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাছে এই সর্বজনীন মন মানব-সম্মিলনের ফল নয়, মানব-সম্মিলনের ভিত্তি। এই ভিত্তিকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বিশ্বমানব। রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশ্বমানব মনটাই প্রাথমিক সত্য।

এ শুধু নামেরই তফাৎ নয়, এই পথে অলক্ষ্যে ভাবেরও তফাৎ এসে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বমানবকে অথবা বিশ্বমানব মনকে এমন একটি স্বতন্ত্র সত্তারূপে, এমন একটি চিরন্তন আদর্শরূপে দেখেছেন— এমন একটি স্বয়ংসিদ্ধ সত্যরূপে দেখেছেন, আধুনিক গবেষকদের মূলত বস্তুবাদী চিন্তাধারার মধ্যে যাকে স্থান দেওয়া সুকঠিন। মানুষের সমাজবদ্ধতার সত্যকে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি আদর্শায়িত ভাব-সত্তায় পরিণত করেছেন, যাকে সহজেই উনবিংশ শতকের রোমান্টিক ভাববাদী চিন্তার ফসিল ব'লে মনে হ'তে পারে।

আসল কথা, আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি প্রত্যক্ষ সমাজ-পরিবেশের বাস্তব সত্যের দিকে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সেই বাস্তবের অন্তর্নিহিত আদর্শ-সত্যের দিকে। রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষ অর্থই মানবত্ব, এবং মানবত্ব অর্থই মানবত্বের ভাব-সত্য, এবং মানবত্বের ভাব-সত্য অর্থই মানবত্বের দুরধিগম্য আদর্শ, যার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ মানুষকে ক্রমাগত সামনের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের মতে মানবত্বের এই আদর্শই মানুষকে মানুষ ক'রে তুলছে, মানব-সভ্যতাকে অন্তহীন সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই আদর্শই মানবজাতির সমস্ত অগ্রগতির মুখ্য প্রেরণা — মূল প্রযোজক শক্তি। কথাটা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি। বস্তু-সত্তাকে ভাব-সত্তায় উর্ধ্বায়িত করার ঝোঁকটা এই স্বল্পায়তন উদ্ধৃতির মধ্যেও লক্ষ করা যাবে।—

"...মানুষের সেই প্রকাশই শ্রেষ্ঠ যা একান্ত ব্যক্তিগত মনের নয়, যাকে সকল কালের সকল মানুষের মন স্বীকার করতে পারে। বুদ্ধির বর্বরতা তাকেই বলে যা এমন মতকে এমন কর্মকে সৃষ্টি করে যাতে বৃহৎ কালের সর্বজনীন মন আপনার সায় পায় না। এই সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করাতেই মানুষের

অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎমানুষ হয়ে উঠছে, তার সমস্ত সাধনা এই বৃহৎমানুষের সাধনা। এই বৃহৎমানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের জাত, অন্তরে আছে এক মানব।"[৫]

কিছু-কিছু মিল থাকলেও, রবীন্দ্রনাথের মানবব্রহ্মবাদ আর আধুনিক কালের সমাজতত্ত্ব-ভিত্তিক ঐতিহাসিক মানবতাবাদ ঠিক এক বস্তু নয়। মিল যতোই থাক, তফাৎটাও স্মরণ রাখতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, ঔপনিষদিক উত্তরাধিকারকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই একেবারে মুছে ফেলেননি। সামাজিক বলক্রিয়ার প্রচলিত জড়বাদী — অথবা ডায়লেকটিক্যাল ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ কখনোই পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করেননি। ক্রমবিকাশের ইতিহাসে মানুষের যে-সব সমুচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ অভিব্যক্ত হয়েছে, সেই সব আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ মানুষের দৈনন্দিন-জীবনযাত্রা থেকে উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত অচল নিত্য-সত্যরূপে কল্পনা করেছেন। সেই আদর্শ-সত্যকেই রবীন্দ্রনাথ দেবায়িত ক'রে তাকে মানবব্রহ্ম নাম দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ব্যাখ্যাকে মানবব্রহ্মের সূত্র ধ'রে বিশুদ্ধ সমাজতত্ত্ব-ভিত্তিক সাহিত্যব্যাখ্যা ব'লে দাবি করলে ভুল করা হবে।

কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও স্মরণ রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের মানবব্রহ্মে মানবাতীত ব্রহ্মের স্থান নেই। উনবিংশ শতকের সুলভ আধ্যাত্মিকতার প্রায় কিছুই এর মধ্যে স্থান পায়নি। এ-কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্পষ্ট ক'রে বলেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর সাধনা নিখিলমানবকে উপলব্ধি করার সাধনা। সেই প্রসঙ্গে আরো বলেছেন—

"আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্র আছে — তিনি নিখিলমানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হবার কথা কেউ যদি বলেন, তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়াতে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানব-বুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা না-থাকা মনুষ্যের পক্ষে সমান।"[৬]

রবীন্দ্রনাথের মানবব্রহ্মবাদে নানা বিভিন্নমুখী চিন্তা, নানা বিচিত্র অনুভব উপলব্ধি একসঙ্গে এসে মিশেছে। এর মধ্যে ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ যেমন আছে, তেমনি আছে

রেনেসাঁসের মানবিকতার আদর্শ। এর মধ্যে পজিটিভিস্টদের ঐতিহাসিকতা ও বাস্তবিকতার প্রেরণা যেমন আছে, তেমনি আছে উনবিংশ শতকীয় রোমান্টিকদের উর্ধ্বায়িত কবি-কল্পনা। এর মধ্যে সাবজেক্টিভপন্থী ভাববাদীদের বিষয়ী-কেন্দ্রিক ভাবনা-বীজ — অস্মিতার তত্ত্ব যেমন ক্রিয়াশীল, তেমনি ক্রিয়াশীল আধুনিক সমাজতত্ত্ব-নৃতত্ত্ব সমর্থিত মানব-সম্মিলনের তত্ত্ব। এই সমস্ত জটিল, বিচিত্র এবং অল্পবিস্তর বিরুদ্ধ উপাদানকে গলিয়ে সম্পূর্ণভাবে এক ক'রে ফেলা অসাধারণ সৃজনীপ্রতিভার পক্ষেও দুঃসাধ্য কাজ।

শেষ পর্যন্ত হয়তো এর মধ্যে ভাব ও রূপের কিছু অনিশ্চয়তা থেকেই গিয়েছে। পূর্ণাঙ্গ একটি দার্শনিক প্রত্যয় হিসেবে একে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ কখনোই করেননি। তা না-করুন, আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, সাহিত্যতত্ত্বের নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই তত্ত্বের কী স্বরূপ-নির্ণয় কী যৌক্তিকতা নিরূপণ কিছুই সম্ভব নয়।

সাহিত্যতত্ত্বের ভূমিতে দাঁড়িয়ে এই সব মৌলিক বিশ্বাস নিয়ে তর্ক তুলে লাভ নেই। তত্ত্বটির ভাব-কেন্দ্র যখন সুনিরূপিত নয়, সীমারেখা যখন সু-উচ্চারিত নয়, তখন প্রত্যেকেই একে অনেকখানি পরিমাণে আপন অভিপ্রেত অর্থের দিকে টেনে নিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেন। সাহিত্যপাঠক হিসেবে এখানে আমরা শুধু একটি কথাই বলতে পারি। মানবব্রহ্মের যে-ব্যাখ্যাটা রক্তমাংসের মানুষের যতো কাছাকাছি, সেই ব্যাখ্যা সাহিত্যেরও ততো কাছাকাছি পৌঁছবে। শুধু সাহিত্যের নয়, সাহিত্যতত্ত্বেরও।

সম্মিলিত মানুষকেই যদি রবীন্দ্রনাথ মানবব্রহ্ম ব'লে থাকেন, মানব-সম্মিলন যদি সত্যিই মানব-সম্মিলন হয়, তাহ'লে সাহিত্যপাঠকের কাছে তা বিনা বাধায়, সাহিত্য-তত্ত্বের পূর্ব-স্বীকৃতিরূপে গৃহীত হ'তে পারে। কেননা সাহিত্য যে একই সঙ্গে মানব সম্মেলক এবং মানব-সম্মিলনের ফল, সাহিত্য যে একই সঙ্গে মিলনের মধ্যে জীবনকে আস্বাদ করায় এবং আস্বাদ্য ক'রে তোলে, এ-বোধ সাহিত্য পাঠকের সাক্ষাৎ উপলব্ধি-সঞ্জাত।

পূর্ব-স্বীকৃতি নিয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বিষয়ান্তর থেকে স'রে এসে, বিশেষ ক'রে দর্শনের মীমাংসাহীন তত্ত্ব মীমাংসার রাজ্য থেকে স'রে এসে, এইবারে আমরা সরাসরি সাহিত্যতত্ত্বের প্রশ্নগুলিরই মুখোমুখি হ'তে চাই। দার্শনিকের কাছে যা-ই হোক না কেন, খাঁটি সাহিত্যজিজ্ঞাসুর কাছে সেইগুলিই জরুরি প্রশ্ন।

রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য দার্শনিক প্রশ্নের উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। বিশেষত

তাঁর পরিণত সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রে। এর ফলে তাঁর সাহিত্যচিন্তার দার্শনিক গৌরব হয় তো অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এই গৌরবের বিনিময়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব যা হারিয়েছে, তা-ও নিতান্ত কম নয়। হারিয়েছে সাহিত্যের জীবন্ত সংস্পর্শ, সাহিত্যবস্তুর সাক্ষাৎ সঙ্গসুখ। সাহিত্যপাঠকের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা থেকে যে-সব বিশিষ্ট সাহিত্যগত প্রশ্ন অব্যবহিতভাবে উদ্‌ভূত হয়, রবীন্দ্রনাথের উর্ধ্বাকাশ-চারী সাহিত্যতত্ত্বে সেই সব প্রশ্নের উত্তর কমই মিলবে। পাঠকের সান্ত্বনা শুধু এই যে, ভূমিতলচারী আর-একটা সাহিত্যচিন্তাধারাও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সাহিত্য-আলোচনার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে, তাকে সাহিত্যতত্ত্ব বলি আর না-বলি।

সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের পরিণত সাহিত্যচিন্তায় — যেমন 'সাহিত্যের পথে'র প্রবন্ধগুলিতে — তত্ত্বগত সিস্‌টেম পূর্ণাঙ্গ হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু সাহিত্যবোধের ক্ষেত্রে কেবল সিস্‌টেমের পূর্ণাঙ্গতাই বোধকরি যথেষ্ট নয়। সাহিত্যশাস্ত্রীদের কাছে আমাদের আরো-একটা বড়ো প্রত্যাশা আছে। সাহিত্যতত্ত্বকে উর্ধ্বাচারী হ'য়েও ভূমি স্পর্শ ক'রে থাকতে হবে, সাহিত্যতত্ত্বকে কাব্য নাটক গল্প উপন্যাসাদিরই তত্ত্ব হ'তে হবে। প্রত্যাশা এই যে, সাহিত্যতত্ত্বের সাহায্যে আমরা যেন কাব্যনাটক উপন্যাস বা গল্প বিশেষকে আরো নিকট ক'রে পেতে পারি, তাদের রসগ্রহণ যেন পূর্ণতর হয়। প্রত্যাশা এই যে, সাহিত্যতত্ত্বের প্রসাদে আমাদের সাক্ষাৎ সাহিত্য-অভিজ্ঞতা যেন উজ্জ্বলতর হয়, কাব্য-নাটকাদির বোধ যেন স্বচ্ছতর হয়, তাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং বিচার যেন পরিচ্ছন্নতর ও নিশ্চিততর হয়। প্রত্যাশা এই যে, সাহিত্যতত্ত্ব যেন সমালোচনাতত্ত্বকে এবং সমালোচনাতত্ত্ব যেন ব্যবহারিক সমালোচ-নাকে সাহায্য করতে পারে। সাহিত্যতত্ত্ব যেন a priori. আপ্তবাক্যের সমষ্টিমাত্র না-হয়, তা যেন সাহিত্যবস্তু থেকেই উদ্‌ভূত হয়, এবং অন্যপক্ষে তা যেন সাহিত্য বস্তুতেই প্রযুক্ত হ'তে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার যাত্রারম্ভ তাঁর প্রত্যক্ষ সাহিত্য-অভিজ্ঞতায়। কিন্তু দর্শনের যে-শিখরচূড়ায় তার যাত্রা সারা হয়েছে, সেই উর্ধ্বলোক থেকে আবার সাহিত্যের সমভূমিতে নেমে আসা বড়ো সহজ নয়। সমভূমিতে নামা তো দূরের কথা, তত্ত্বের কোনো আপেক্ষাকৃত নিম্নতর ধাপে নেমে আসাতেও তার উৎসাহ নেই। তার দৃষ্টি উর্ধ্বতম ও ব্যাপকতম সত্যের দিকে। খুঁটিনাটিতে — পুঙ্খতায় তার বিশেষ অনাগ্রহ। সেই কারণে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের তত্ত্বমূল্য যতোই থাক-না কেন, তার প্রয়োগযোগ্যতা খুব বেশি নয়। কবিতা নাটক বা উপন্যাস-বিশেষের মর্ম-

গ্রহণে, রসাস্বাদনে এবং মূল্যনিরূপণে তা আমাদের খুব বেশি সাহায্য করে না। সাহিত্য যে সহিতত্ব এবং লীলা, এই সাধারণ সত্য "উর্বশী" বা "বনলতা সেন" কবিতার, 'পথের পাঁচালী' বা 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের মর্মগ্রহণের ক্ষেত্রে কতোটুকু কাজে লাগে? সাহিত্য যে প্রকাশ এবং আনন্দ, এই জ্ঞান 'আনা কারেনিনা', "নষ্টনীড়" বা 'গৃহদাহে'র. 'কিং লিয়ার', 'রক্তকরবী' অথবা 'ওয়েটিং ফর গোদো'র রসাস্বাদনে মূল্যনিরূপণে আমাদের কতোটুকু সাহায্য করতে পারে? সাহিত্য যে অপ্রয়োজন অথচ অমৃত, দায়-দায়িত্বের ঊর্ধ্বে অথচ কল্যাণ, এই সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানকে 'বিসর্জন', 'মুক্তধারা' অথবা 'চণ্ডালিকা'র নাট্যমূল্য-বিচারের ক্ষেত্রে আমরা কতোটুকু কাজে লাগাতে পারি?

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক সাহিত্যতত্ত্ব তাঁর সমালোচনাতত্ত্বকে খুব বেশি সাহায্য করেনি। ব্যবহারিক সমালোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর সাহিত্যতত্ত্বের সূত্রগুলিকে খুব বেশি কাজে লাগাতে পারেননি, সে-চেষ্টাও তিনি করেননি। তাঁর সাহিত্য-আলোচনার জগৎ এবং সাহিত্যতত্ত্বের জগৎ, এ-দুয়ের মাঝখানে কোনো প্রশস্ত সেতু নেই। রবীন্দ্রনাথের "মেঘদূত" অথবা "রাজসিংহ", "কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা" অথবা "কৃষ্ণচরিত্র", রবীন্দ্রনাথের "কাব্যের উপেক্ষিতা", অথবা তাঁর লোক-সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা, এর প্রত্যেকটিই সমালোচনা হিসেবে অসামান্য। কিন্তু এইসব সমালোচনার কোনোটিতেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দাগ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

জানি, তত্ত্ব আর প্রয়োগ এক নয়। এ-ও জানি যে, সাহিত্যতত্ত্ব আর সাহিত্য-সমালোচনা পৃথক্ বস্তু। কিন্তু তারা কতো পৃথক্? যাকে নিয়ে তত্ত্ব, যার জন্য তত্ত্ব, তার সঙ্গে যে তত্ত্বের যোগ ঘনিষ্ঠ নয়, সে-তত্ত্বের মূল্য সম্পর্কে আমরা সুনিশ্চিত হ'তে পারি না। যে-তত্ত্বের প্রয়োগযোগ্যতা নেই, প্রমাণযোগ্যতা নেই, তা আমাদের টানবে কিসের টানে?

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব আদৌ সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন কথা বলি না। কিন্তু, আগেই বলেছি, সাহিত্যের ব্যাপকতম সাধারণ-সত্যের সঙ্গেই তার যোগ। সাহিত্য কী — সে কেবল এই মৌল প্রশ্নের উত্তর দেয়, তার বেশি নয়! সাহিত্যবস্তুর অন্তরঙ্গ বিশিষ্ট সমস্যাগুলির সঙ্গে তার যোগ অত্যন্ত শিথিল। বলা বাহুল্য, সাহিত্য-তত্ত্বের সব প্রসঙ্গই সমান ব্যাপকতার দাবি করতে পাবে না। যেখানে প্রশ্নগুলি ব্যাপকতার অভিমুখী — বলতে পারি দার্শনিক সমুচ্চতার অভিমুখী, সেইখানে রবীন্দ্র-নাথের উৎসাহ, সেইখানে রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ। যেখানে তা নয়, সেইখানে

মনোযোগ অপেক্ষাকৃত শিথিল। এই প্রসঙ্গে রস, ভাব, কল্পনা, বাস্তব, তথ্য, সত্য, অপ্রয়োজন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়ের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রত্যয়গুলির একমুখ প্রত্যক্ষ সাহিত্যবস্তুর সঙ্গে, সাহিত্যের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে লগ্ন। আর-এক মুখ পরিস্রুত তত্ত্বরূপে উর্ধ্বাভিমুখী। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যয়গুলিকে গ্রহণ করেছেন শেষোক্ত দিক থেকে। প্রত্যক্ষ সাহিত্য-অভিজ্ঞতার স্পর্শ সেখানে স্তিমিত।

অনেক ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারের শিথিলতা থেকেই এ-বিষয়ে তার অমনোযোগ স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। পূর্বোক্ত রস ইত্যাদি শব্দকে প্রায় একই প্রসঙ্গে কখনো তিনি প্রচলিত সাধারণ অর্থেও ব্যবহার করেছেন, আবার কখনো একান্ত পারিভাষিক অর্থেও ব্যবহার করেছেন। শুধু তাই নয়, কখনো সে-পরিভাষা বিশিষ্ট প্রয়োগক্ষেত্রের স্বীকৃত এবং বহু-প্রচলিত পরিভাষা, আবার কখনো তা সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পরিভাষা। একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে, বিভিন্ন অভিব্যঞ্জনায় ব্যবহারের অনিবার্য ফল বিভ্রান্তি।

উদাহরণ হিসেবে এখানে রস কথাটার উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা জানি, ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে, বিশেষত ভারতীয় সাধনার ধারার সঙ্গে — এবং সাধারণভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ খুব নিবিড়। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক সে-রকম ঘনিষ্ঠ নয়, রসবাদের সঙ্গেও নয়। বলা বাহুল্য, এটা এমন-কিছু দোষের কথাও নয়। ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের রস কথাটি একদিকে যেমন অত্যন্ত সুপরিচিত, অন্যদিকে তেমনি সাহিত্য-আলোচনার পরিধির মধ্যে তা বিশিষ্ট পারিভাষিক অর্থেই ব্যবহৃত — বহু আলোচনার দ্বারা সে-অর্থ সুনির্দিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে রস কথাটি বহু-ব্যবহৃত। কিন্তু তার সিদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট অর্থের প্রতি তাঁর মনোযোগের কোনো চিহ্ন নেই। যখন তিনি রসবাদীদেরই বাক উদ্‌ধৃত করছেন — বহু-পরিচিত এবং বহু-উদ্‌ধৃত বাক্য — তখনো না। এ-ক্ষেত্রে পাঠকের অর্থের সঙ্গে তাঁর অর্থের যে মিল হবে না. বক্তা ও শ্রোতায় ভাবসাযুজ্য ঘটবে না, অথবা রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য যে পাঠকের মন থেকে পিছলে যাবে, এটা স্বাভাবিক।

একই অমনোযোগের কারণে, ভাব রস তথ্য সত্য বাস্তব প্রভৃতি যে-সব বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এদের সকলের সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথের আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই ভাসা-ভাসা — অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ। ভাব কী ক'রে রসে পরিণত হয়, ব্যক্তিগত সত্য কী ক'রে সর্বজনীন সত্যে পরিণত হয়, তা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ক'রে বলেননি। তথ্যের মতো একটি নিন্দাভাজন বস্তু — কী ক'রে তারই পাত্রে সত্য পরিবেশিত হয়, তা-ও বোঝা সহজ নয়। বাস্তব কোন্ অপরাধে অসত্য

ব'লে গণ্য হয়, কল্পনা কী কৌশলে ঘটনাকে দেশকালের বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়, নিকট কোন্ প্রক্রিয়ায় দূরত্বে অধিষ্ঠিত হয়, যা একান্তভাবে অপ্রয়োজনীয় তা কেমন ক'রে কল্যাণকর ব'লে অথবা যা কল্যাণকর, তা কেমন ক'রে অপ্রয়োজনীয় ব'লে গণ্য হ'তে পারে, এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা অসম্পূর্ণ, ব্যাখ্যা অর্ধ-সমাপ্ত, যুক্তি-প্রমাণ অলংকার বাহুল্যের দ্বারা বাধিত।

ভাব এবং রসের প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ করছি। অভিযোগ কেবল অর্থ-বিভ্রাট নিয়েই নয়, তা আরো গভীর। অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ হ'য়ে-ওঠাকে বলেছেন ভাব, আবার কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ফীলিংকেই বলেছেন ভাব। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখতে পাই, ফীলিং অর্থে ভাবকেই তিনি রস বলেছেন, ভাবের তীব্রতাকেই তিনি রসের তীব্রতা ব'লে দাবি করেছেন। যেখানে ভাব যতো তীব্র, সেখানে রসও ততো তীব্র, ততো গভীর, কেননা ওরা অভিন্ন। ভাবের তীব্রতাতে আত্মোপলব্ধির তীব্রতা; সুতরাং ভাবের তীব্রতাতেই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব। রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডিতত্ত্ব এই দাবির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সর্বত্র এই দাবির সঙ্গতি রক্ষা করেননি। যে-কোনো লৌকিক ভাব, তা যতো তীব্র হবে, সাহিত্যে তা ততো মূল্যবান ব'লে গণ্য হবে, এই দাবিকে রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র খাড়া রাখতে পারেননি। জীবনের অনেক তীব্রতাযুক্ত ভাবকে — যেমন ক্ষুধা, যৌনতা, ঔদরিকতা, এদের রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য থেকে সরাসরি বাদ দিতে চেয়েছেন। ভাব আর রস যে এক নয়, ভাবের তীব্রতাই যে রসের তীব্রতা বা প্রগাঢ়তার কারণ নয়, রসের প্রগাঢ়তার যে অন্যতর কোনো উৎস আছে, এ-কথা রবীন্দ্রনাথের অজানা থাকবার কথা নয়। কতোখানি জানা ছিলো তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা-ভবনে অনুষ্ঠিত কোনো-একটি বিখ্যাত আলোচনা-সভার অধিবেশনে (১৯২৮) জনৈক অধ্যাপক যখন দাবি করেছিলেন যে, 'কাব্য-সাহিত্যের বিশিষ্টতা ভাবের প্রগাঢ়তায় (intensity)', তখন তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা-বলেছিলেন, সেই কথাগুলো এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।—

"তুমি যাকে প্রগাঢ়তা বলছ সেটা বস্তুত রূপসৃষ্টিরই অঙ্গ।...নাইটিঙ্গেল পাখিকে উদ্দেশ করে কীট্স একটি কবিতা লিখেছেন। তার মাঝখানটায় মানব জীবনের দুঃখ তাপ ও নশ্বরতা নিয়ে বিশেষ একটি বেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু, সেই বেদনার তীব্রতাই কবিতার চরম কথা নয়; মানবজীবন যে দুঃখময়, এই কথাটার সাক্ষ্য নেবার জন্যে কবির দ্বারে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই — তা ছাড়া,

কথাটা একটা সর্বাঙ্গীণ ও গভীর সত্যও নয় — কিন্তু এই নৈরাশ্যবেদনাকে উপলক্ষমাত্র করে ঐ কবিতাটি যে একটি বিশেষ রূপ ধরে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে সেইটেই হচ্ছে ওর কাব্যহিসাবে সার্থকতা।'[৭]

এই যে 'একটি বিশেষ রূপ ধরে সম্পূর্ণ হয়ে'-ওঠা, এর মূলে আছে — রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "রূপস্রষ্টার ইন্দ্রজাল।"[৮] রামায়ণ বেদনার কাব্য। কিন্তু সে-বেদনা লৌকিক বেদনা নয়, তা লৌকিক ভাব নয়। ক্রৌঞ্চ-মিথুন-বিয়োগজনিত বেদনায় যতোক্ষণ বাল্মীকি আর্ত ছিলেন, ততোক্ষণ সেই আর্ত অবস্থায় তিনি রামায়ণ রচনায় বসেননি, বসতে পারেন না। যখন বসেছেন, তখন তিনি ইন্দ্রজাল-রচয়িতা। তখন তিনি, রবীন্দ্রনাথের ভাষা ব্যবহার ক'রেই বলি — "রূপমুগ্ধ রূপদ্রষ্টা রূপস্রষ্টা।"

ইন্দ্রজাল কেবল রূপেরই নয়, অন্তত সংকীর্ণ অর্থে যাকে রূপ বলি, কেবল তারই নয়, আরো অনেক-কিছুর। সাহিত্যতত্ত্ব এই সামগ্রিক ইন্দ্রজালের রহস্যকে ধরবার চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব পাঠককে এই রহস্যের প্রান্তে নিয়ে গিয়েছে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করবার সুযোগ দেয়নি।

রসের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কখনো যেমন ভাবের উপর একান্তভাবে জোর দিয়েছেন, তেমনি কখনো আবার রূপের উপরেও চূড়ান্তরকমের জোর দিয়েছেন। কিন্তু রূপের রহস্যকে তিনি কখনোই যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাখ্যা করেননি। ঠিক তেমনি রসসৃষ্টির প্রসঙ্গে অলংকার এবং অত্যুক্তির উপরেও প্রচুর জোর দিয়েছেন। অথচ, রসের জগতে অলংকারের যে স্বাধীন সত্তা নেই, সাহিত্য-সৌন্দর্যের রহস্য যে নিছক অলংকার বা অত্যুক্তির রহস্য নয়, এ-কথা তাঁর থেকে বেশি আর কে জানে?

আগেই বলেছি, সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের মন স্বভাবতই পুঙ্খতা-বিমুখ, তাঁর দৃষ্টি স্বভাবতই উচ্চতম সত্যের দিকে নিবদ্ধ। নিম্নতর ক্ষেত্রে তিনি ভাষা-ব্যবহারেও অমনোযোগী। কিন্তু নিম্নতর ক্ষেত্রের বাক্-বিশৃঙ্খলা সব সময় নিম্নতর ক্ষেত্রেই অবদ্ধ থাকে না। অনেক সময় অলক্ষ্যে তা উচ্চতর তত্ত্বকেও আক্রান্ত করে। প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন, বাস্তব ও কল্পনা, তথ্য ও সত্য — রবীন্দ্রনাথের এইসব দ্বিখণ্ডীকরণের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই এ-কথা অল্পবিস্তর প্রযোজ্য।

রবীন্দ্রনাথ কঠিন সীমারেখা দিয়ে জগৎকে দুটি পৃথক্ এলাকায় বিভক্ত ক'রে দিয়েছেন। একটা হ'লো প্রয়োজনের এলাকা, মানুষের পক্ষে যা কিনা দাসত্বের এলাকা। আর একটা হ'লো অ-প্রয়োজনের এলাকা, মানুষের মুক্তির এলাকা, লীলার এলাকা। রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য মুক্তির রাজ্যের অধিবাসী — সাহিত্যের স্রষ্টাও তাই, ভোক্তাও তাই।

এই বিভাগ কতোদূর যুক্তিযুক্ত? রবীন্দ্রনাথই তো আমাদের শিখিয়েছেন, কীভাবে প্রয়োজনের জগৎই মুক্তির জগৎ হ'য়ে ওঠে, কীভাবে অসংখ্য বন্ধনের মধ্যেই মহানন্দময় মুক্তির আস্বাদ লাভ করা যায়। জগৎ দুটো নয়, জগৎ একটাই। সে-জগৎ প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মাখামাখি।

বলতে পারতাম যে, সাহিত্যের মধ্যে কেবল মুক্তি নয়, মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও অভিব্যক্ত। এই আকাঙ্ক্ষা মুক্ত-জীবের আকাঙ্ক্ষা নয়, বন্দীর আকাঙ্ক্ষা। বলতে পারতাম, সাহিত্য মুক্ত-মানুষের প্রয়াস নয়, মানুষের মুক্তিরই প্রয়াস। এই প্রয়াসে বন্ধন এবং মুক্তি দুই-ই সত্য। রবীন্দ্রনাথ যখন ঠিক সেভাবে বলেননি, তখন সে-কথা হয়তো এখানে অবান্তর হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে যে-কথা বলেছেন, সে-কথাই জগতের এইরকম দ্বিধা-বিভাজনকে সমর্থন করে?

এই বিভাগ যে কতোখানি কৃত্রিম, তা রবীন্দ্রনাথের মতো পরম ঐক্যতত্ত্বে বিশ্বাসীর পক্ষে না-জানা থাকবার কথা নয়। তিনি নিজেই তো বলেছেন, জগতের সবই সাহিত্য, বিশ্বজগৎটাই সাহিত্য। অর্থাৎ স্বরূপত সবই মুক্ত, কেউ দাস নয়, জগতের কোনো এলাকাই যথার্থভাবে দাসত্বের এলাকা নয়। জগৎ যদি সাহিত্য ও অ-সাহিত্য এই দুই ভাগে বিভক্ত না-হয়, তাহ'লে জগৎ ও জীবনকে প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন, এই দুই ভাগে ভাগ করার কোনো তাৎপর্য থাকে না। আনন্দ এবং মুক্তি যদি সমার্থক হয়, সত্তামাত্রেই যদি আনন্দময় হয়, তাহ'লে মুক্ত আর প্রয়োজনবদ্ধ এই ভাগ তত্ত্বগতভাবে সম্পূর্ণ অসার্থক।

শুধু তত্ত্বগতভাবে কেন, কার্যক্ষেত্রেও এ-ভেদ অর্থহীন। নিজের সমালোচনা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ কল্যাণের আদর্শকে খুব উঁচুতে স্থান দিয়েছেন, এ-কথা সকলেরই সুবিদিত। কিন্তু কল্যাণের ভূমি কোথায়? সে তো মানুষের কর্মেরই ভূমি। কর্মের ভূমি থেকে সরিয়ে নিলে জীবন কথাটারও অর্থ থাকে না, কল্যাণ কথাটারও তেমনি অর্থ থাকে না। মানুষের ইচ্ছা চেষ্টা কর্ম — এক কথায় মানুষের জীবন প্রয়োজনময়। এর বাইরে কল্যাণকে কোথায় খুঁজবো? আমরা জানি, কল্যাণ শূন্যাশ্রয়ী ব্যাপার নয়। কল্যাণ-অকল্যাণ দুই-ই মানবসংসারের ব্যাপার — মানুষের ইচ্ছার সঙ্গে, চেষ্টার সঙ্গে, ক্রিয়ার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সুতরাং কল্যাণ প্রয়োজনের জগতেই তাৎপর্যপূর্ণ, তার বাইরে যদি কোনো জগৎ থেকে থাকে, সেখানে নয়। বস্তুত, কল্যাণই জীবনের মহত্তম প্রয়োজন। সাহিত্য যদি কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহ'লে অবশ্যই সে প্রয়োজনের সঙ্গেও যুক্ত।

প্রয়োজন আর অপ্রয়োজনের আত্যন্তিক ভেদের সম্পর্কে যে-কথা প্রযোজ্য, তথ্য

আর সত্যের আত্যন্তিক ভেদ সম্পর্কেও সে-কথা ঠিক সমানভাবেই প্রযোজ্য। কেননা, রবীন্দ্রনাথের মতে প্রয়োজনের জগৎই তথ্যের জগৎ।

তা হ'লেও, তথ্য আর সত্যের প্রশ্নটিকে রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের প্রশ্নের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে দেখেননি, কিছুটা আলাদাভাবেই দেখেছেন। প্রশ্নটিকে আমরাও সেই কারণে যথাসম্ভব স্বতন্ত্রভাবেই বিবেচনা ক'রে দেখবো। কিন্তু এখানেও, রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বের নিজস্ব যুক্তিধারা অনুসরণ করলেই দেখতে পাবো, প্রয়োজন আর অপ্রয়োজনের জগতের মধ্যে যেমন কোনো কঠিন সীমারেখা নেই, তথ্য আর সত্যের মধ্যেও তেমনি কোনো কঠিন সীমারেখা নেই। এদের ভেদ আসক্তির দ্বারা রচিত ভেদ। সে-ভেদের কোনো নিত্যতাও নেই, সত্যতাও নেই।

এ কেবল দেখার ত্রুটি। সত্যকে যখন খণ্ডিত ক'রে দেখি, অথবা অবচ্ছিন্ন ক'রে দেখি, সত্য থেকে যখন মানবিক মূল্যকে ছাঁটাই ক'রে দিয়ে দেখি, তখন যে শীর্ণ, শুষ্ক, নীরক্ত — হৃদয়স্পর্শবর্জিত ব্যাপারটাকে পাই, তা সত্য নয়, সত্যের কঙ্কাল মাত্র। রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন তথ্য। সত্যকে যখন স্বার্থের দৃষ্টি দিয়ে বিকৃত ক'রে দেখি, রবীন্দ্রনাথ তাকেও বলেছেন তথ্য। তথ্যের স্বার্থ-সংসর্গ-সঞ্জাত বিকার যখন ঘুচে যায়, তথ্য যখন হৃদয়রাগে রঞ্জিত হ'য়ে আমাদের কাছে মূল্যবান হ'য়ে ওঠে, তথ্য যখন ক্রম-সংকীর্ণতামুখী না-হ'য়ে ক্রম-বিস্তারমুখী হয় — সমগ্রতা-অভিমুখী হয়, তখন তাকেই রবীন্দ্রনাথ সত্য বলেছেন।

কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, ভেদটা মোটেই পাকা নয়। মেঘাচ্ছন্ন সূর্য আর মেঘমুক্ত সূর্যের মধ্যে যে-ভেদ, এ-ভেদ অনেকটা সেইরকম। অনেকটা, কিন্তু পুরোপুরি নয়। কেননা মানুষের কাছে সত্যের সূর্য কখনোই একেবারে মেঘাচ্ছন্ন হয় না ; এবং পরিপূর্ণ মেঘমুক্ত সূর্য — সত্যের মহাসমগ্রতার সাক্ষাৎকার, যতোদূর মনে হয়, মানবভাগ্যে তা-ও কখনো সম্ভবপর হয় না।

ভেদটা বোধকরি আপেক্ষিক। মানুষের কোনো তথ্যই কেবল তথ্য নয়, নিছক তথ্য নয়। মানুষের সব তথ্যই প্রচ্ছন্ন সত্য। ঠিক তেমনি, মানুষের কোনো সত্যই সম্ভবত একেবারে ষোলো-আনা সত্য নয়, যাকে বলতে পারি রেডি-মেড সত্য, তা নয়। সব সত্যই সত্য হ'য়ে-ওঠা। কোনো সত্যই একেবারে হ'য়ে-যাওয়া-সত্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ তথ্যকে যে-রকম সংকীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ ক'রে দেখেছেন, তথ্য সব সময় সেই সংকীর্ণ সীমায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকে না। তথ্য যে-কোনো মুহূর্তে নিজের সীমানা লঙ্ঘন ক'রে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই থাকে। যেখানেই মানবস্বভাব জয়যুক্ত হয়, দৃষ্টির

আবিলতা কেটে যায়, সেইখানেই তথ্যের মধ্যে সত্যকে দেখতে পাই। দেখার দোষ কেটে গেলে, তথ্যই সত্যরূপে দেখা দেয় — তথ্য তথ্য থেকেই সত্য হয়। তখন বুঝতে পারি, বরাবরই সে সত্য ছিলো। তথ্যকে সত্যরূপে চেনা, স্বরূপে চেনা, একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেনে, তথ্যের পাত্রে সত্যের সঞ্চার।

রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় বাস্তবকে সত্য থেকে পৃথক্ করেছেন। তখন বাস্তব আর তথ্য তাঁর কাছে সমার্থক। ঠিক যে-কারণে প্রয়োজন আর অপ্রয়োজনের ভাগ অযৌক্তিক, যে-কারণে তথ্য আর সত্যের ভাগ অযৌক্তিক, সেই কারণেই বাস্তব আর সত্যের পৃথকীকরণ অযৌক্তিক। তার কারণ, দেখার দোষ কেটে গেলে, সেই বাস্তবের পাত্রেই সত্যের সঞ্চার হয়। তা ব'লে তখন সে অবাস্তব হ'য়ে যায় না। বাস্তব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তিসমূহের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট দ্বৈততা লক্ষ করা যায়। এ-দ্বৈততা তত্ত্বগত নয়। আসল গোলমাল, বাস্তব কথাটাকে রবীন্দ্রনাথ এক-এক সময় এক-এক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তার কোনোটার প্রতি তাঁর আকর্ষণ, কোনোটার প্রতি তাঁর বিকর্ষণ। রক্তমাংসের বাস্তবের প্রতি, প্রকৃতি, মানবসংসার, মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি, জীবনসত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রীতি ও আকর্ষণ যেমন সত্য, বস্তুবাদী সাহিত্যিকদের সংকীর্ণ অগভীর তথা-কথিত বাস্তবের প্রতি তাঁর বিরূপতাও সমানই সত্য। কখনো তাঁর কাছে বাস্তব অর্থ সত্য, আবার কখনো তাঁর কাছে বাস্তব অর্থ হ'লো সংকীর্ণ এবং অগভীর যথাযথতা।

সংকীর্ণতা যে বিষয়ের মধ্যে নিহিত নয়, আসল সংকীর্ণতা যে দৃষ্টির সংকীর্ণতা, এ-কথা রবীন্দ্রনাথের মোটেই অজানা নয়। যিনি বিশ্বাস করেন, এমন-কি বিজ্ঞানের সত্যও মানবিক সত্য, মানব-চৈতন্যের দ্বারা অনুরঞ্জিত সত্য, তিনি নিশ্চয়ই এ-কথাও জানেন যে, মানুষের কোনো তথ্যই কেবল তথ্য নয়, সব তথ্যই চৈতন্যের দ্বারা অনুরঞ্জিত, সব তথ্যই অল্পবিস্তর ভ্যালু-সমন্বিত, সুতরাং সব তথ্যই-সত্যের অংশীদার, সব তথ্যেই সত্য অন্তর্নিহিত। আগেই বলেছি, যা তথ্য সম্পর্কে প্রযোজ্য, সে-কথা বাস্তব সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সব বাস্তবই মানবিক বাস্তব, সব বাস্তবই সত্যের আধার। সে-আধার থেকে সত্যকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সুতরাং সব বাস্তবই সত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। সত্য ও বাস্তবের মধ্যে কোনো ভেদ-রেখা নেই।

বাস্তব সম্পর্কে দ্বিধার ভাব রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতত্ত্বকেও স্পর্শ করেছে।[৯] তিনি মনে করেন, যেহেতু বাস্তব (সংকীর্ণ অর্থে বাস্তবের কথাই ধরা যাক) কল্পনাস্পর্শবর্জিত, সেইহেতু তা অসত্য। কিন্তু বাস্তব যদি সব সময়ই মানবিক বাস্তব হয় — রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'মানবিক ও মানসিক' — তাহ'লে কোনো বাস্তবের পক্ষেই কি

আদৌ কল্পনাস্পর্শবর্জিত হওয়া সম্ভব? সম্ভব নয়, এইটেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের মৌল সিদ্ধান্ত।

রবীন্দ্রনাথ সত্যদৃষ্টি ও কল্পনাদৃষ্টির নিবিড় সংযোগে, সত্য ও কল্পনার অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বিশ্বাসী। কখনো কখনো তিনি বলেছেন, কল্পনাই যথার্থ সত্যদ্রষ্টা। কখনো কখনো তাঁর কথা থেকে মনে হয়, কল্পনা শুধু সত্যদ্রষ্টাই নয়, কল্পনাই সত্যস্রষ্টা — অন্তত সত্যের নিয়ামক। আবার কোথাও-কোথাও তাঁর কথার ঝোঁকটা সম্পূর্ণ উল্টো দিকে। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধের কল্পনাপ্রসঙ্গ স্মরণ করতে পারি। সেখানে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, "যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ ...।"[১০]

'সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ' কল্পনা কথাটার তাৎপর্য কী, বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা কীভাবে মিশে থাকে, বাস্তব-সত্যের সঙ্গে কল্পনার সম্পর্ক কী, এ-সব কথা রবীন্দ্রনাথ যথোপযুক্তভাবে ব্যাখ্যা বা বিচার করেননি। এই অমনোযোগের কারণেই তাঁর সাহিত্যতত্ত্বে কয়েকটি আপেক্ষিক ভেদ চূড়ান্ত দ্বিখণ্ডীকরণে পরিণত হয়েছে — কল্পনা এবং বাস্তব, বাস্তব এবং সত্য, সত্য এবং তথ্য এমন কৃত্রিমভাবে পরস্পরের থেকে পৃথক্ হ'য়ে পড়েছে, এমন অসঙ্গতভাবে পরস্পর-বিরোধী চেহারা নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে।

একটু অবহিত হ'লেই রবীন্দ্রনাথ এই সব অসঙ্গতিকে অনায়াসে পার হ'য়ে যেতে পারতেন। পার হ'য়ে যাবার সূত্র তাঁর ঐক্যতত্ত্ব-ভিত্তিক সাহিত্যচিন্তার নিজস্ব যুক্তিধারার মধ্যেই মিলবে। কিন্তু, আগেই বলেছি, সে-দিকে দৃষ্টি দেবার তাঁর অবকাশই ছিলো না। তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর সমস্ত মনোযোগ জগৎতত্ত্বকে সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে এবং সাহিত্যতত্ত্বকে জগৎতত্ত্বের সঙ্গে মেলানোর দিকে।

রবীন্দ্রনাথ জগৎ আর সাহিত্যের মিলটাই দেখেছেন, অমিলটা দেখেননি, বা দেখতে চাননি। উপরের দিকে, ব্যাপকতম সত্যের ক্ষেত্রে জগতে ও সাহিত্যে যে তাৎপর্যপূর্ণ মিল, যার সম্বন্ধে সাধারণ সাহিত্যরসিক স্বভাবতই অনবহিত, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু নীচের দিকে যেখানে অসংখ্য অমিল, যে-অমিলের সম্বন্ধে আমরা সকলেই অন্তত আংশিকভাবেও সব সময়ই সচেতন, সেই দিকটাকে রবীন্দ্রনাথ অল্পবিস্তর উপেক্ষা করেছেন। আমরা জানি, জগৎ আর সাহিত্য পুরোপুরি এক নয়, জগতের সমস্যা আর সাহিত্যের সমস্যাও এক নয়। আমরা জানি, জগৎসৃষ্টি জগৎস্রষ্টার কাছে কোনো সমস্যাই নয়, সাহিত্যসৃষ্টি সাহিত্যস্রষ্টার কাছে কেবল খেলাই নয়, সাহিত্যরচনার পেছনে অনেক

বেদনা অনেক বিফলতার, অনেক সাধনা অনেক সংগ্রামের ইতিহাস লুকোনো। আমরা জানি, জগৎ-সত্যে যে স্বয়ংসিদ্ধ মুক্তি তা সাহিত্যিকের কষ্টার্জিত হৃদয়-শোণিতসিক্ত মুক্তির সঙ্গে তুলনীয় নয়। আমরা জানি, লৌকিক আনন্দ আর সাহিত্যের আনন্দ হুবহু এক নয়, জীবনের ট্র্যাজেডি আর সাহিত্যের ট্র্যাজেডি পৃথক্‌, জীবনের সত্য আর সাহিত্যের সত্য অভিন্ন নয়। এই প্রত্যক্ষ সত্যের সম্পর্কে রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বের ঔদাসীন্য প্রায় নির্মমতার পর্যায় গিয়ে পৌঁছয়। এই ঔদাসীন্যের ফলে আমাদের অনেক অব্যবহিত সাহিত্য-প্রশ্ন হঠাৎ নীরবতার দেয়ালে বাধা পেয়ে থেমে যায়।

তার বদলে যা পেয়েছি, তা অবশ্য একেবারে অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি। তার মূল্য অবশ্যস্বীকার্য। তারই ফলে সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের সামগ্রিক বোধের মধ্যে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘ'টে গিয়েছে। দুঃখের কথা, প্রত্যাশিতের জন্য যে-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশার অতীতকে দিয়ে সে-আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয় না।

১-২. র। ১২। ৫৬৮

৩. র। ১২। ৫৬৯

৪. "বিশ্বসাহিত্য", 'সাহিত্য', র। ১৩। ৭৭১

৫. 'মানুষের ধর্ম', র। ১২। ৫৬৯

৬. "মানবসত্য", 'মানুষের ধর্ম', র। ১২। ৬১২-৩

৭. "সাহিত্যরূপ", 'সাহিত্যের পথে', র। ১৪। ৪০২

৮. তদেব, ৪০৩

৯. বর্তমান গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় "কল্পনাতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।

১০. র। ১৩। ৮১৫

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবি ও সাহিত্যশাস্ত্রীদের প্রভাবের কথা বহুজন-কথিত। রবীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ব্রহ্মবাদী ও ভাববাদী চিন্তার প্রভাব, তাঁর গতিতত্ত্বে পাশ্চাত্য গতিবাদী চিন্তার প্রভাব, এ-সব কথাও বহুকথিত। পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রসঙ্গে গ্যেটে থেকে কীট্সের নাম, শিলার থেকে ক্রোচের নাম, অথবা হেগেল থেকে বের্গসঁর নাম অত্যন্ত সহজেই উচ্চারিত হ'য়ে থাকে। এর কিছু কিছু দাবি সীমিত অর্থে সত্যও হ'তে পারে, আবার কিছু কিছু দাবি যে সর্বতোভাবেই হাস্যকর তাতেও সন্দেহ নেই।

ভাবের আদান-প্রদানের সাধারণ সত্যকে অস্বীকার করার অর্থ হয় না। এই দান-প্রতিদানের ইতিহাসের আদিও নেই, অন্তও নেই। আইডিয়ার ইতিহাস নিয়ে যাঁরাই অনুসন্ধান করেছেন, তাঁরাই জানেন :

"মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।"

— সচেতন সংবেদনশীল মনে দেশকালের প্রভাব, যুগ-পরিবেশ সমাজ-পরিবেশের প্রভাব, মানব-সভ্যতার মানব-সংস্কৃতির যে-কোনো দানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব — যদি তাকে আদৌ প্রভাব বলি, সে-প্রভাব অবশ্যই পড়বে।

যাঁরা প্রভাবের কথা বলেন, তাঁরা এইরকম সাধারণ অর্থে বলেন না, তাঁরা বিশিষ্ট অর্থে প্রভাবের কথাই ব'লে থাকেন। যা নিজের স্বাভাবিক পথ থেকে সরিয়ে নেয় না — সবলে অন্যত্র নিয়ে যায় না, বিশিষ্ট অর্থে তাকে প্রভাব বলা যায় না। এই অর্থে প্রভাব বলবো মাত্র তাকেই যা অপরকে নিজের অনুসরণকারীতে পরিণত করে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রভাবের প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের বিচার ক'রে দেখতে হবে যে, এই সব তথাকথিত প্রভাবসমূহই রবীন্দ্রনাথের চিন্তার রূপ ও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করেছে, না রবীন্দ্র-চিন্তার স্বকীয়তাই আপন পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের প্রভাবকারীদের অনুমোদন করেছে, আপন ইচ্ছা অনুযায়ী বেছে বেছে প্রভাবকারীদের মনোনয়ন ক'রে নিয়েছে।

বহিঃশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রথম বয়েসে অনেক খুঁজে পাওয়া যাবে

তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে হ'লো প্রস্তুতি-পর্বের কাহিনী। এ-রকম প্রস্তুতি-পর্ব সকলেরই থাকে, থাকতেই হবে। প্রস্তুতি-পর্বের পরে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ-রকম দৃষ্টান্ত একটিও খুঁজে পাবো না, যাকে নিঃসংশয়ে বাইরের নিয়ন্ত্রণ বলা যায়। এইটেই বরং দেখতে পাবো যে, রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা — রবীন্দ্র-চিন্তার প্রবল ব্যক্তিত্ব তথাকথিত প্রভাবসমূহকে শুধু নির্বাচনই করেনি, খুশিমতো তাদের নিয়ন্ত্রিত করেছে, রূপান্তরিত করেছে, মৌলিকভাবে পরিবর্তিত ক'রে নিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাবো, আপাতদৃষ্টিতে যাকে প্রভাব ব'লে মনে হচ্ছে, আসলে তা একটি উপলক্ষ বা উদ্‌বেজক মাত্র। অথবা দেখবো, প্রকৃতপক্ষে তা একটি স্বাধীন ও সমান্তরাল বিকাশ, তার উদ্‌ভব ও পরিণতির সমস্ত কার্যকারণ তার নিজের জীবনসত্যের মধ্যেই নিহিত, সে কেবল পরিবেশ-সাম্যজনিত একটি ভাবসাম্যের নিদর্শন মাত্র। কিন্তু সব থেকে বেশি দেখতে পাবো, প্রভাবের আমূল পরিবর্তন, প্রভাবের জন্মান্তর। প্রভাবরূপে নয়, অনুগামীরূপে।

রবীন্দ্র-চিন্তার স্বাভাবিক পরিণতিলাভে পাশ্চাত্য প্রভাবের তুলনায় প্রাচ্য ঐতিহ্যের দান অনেক বেশি। কিন্তু সেখানেও দেখতে পাবো, রবীন্দ্র-চিন্তার নিজস্ব সমন্বয়শক্তি নানা বিচিত্র উপাদানকে খুশিমতো, ঠিক নিজের প্রয়োজনমতো নির্বাচন ক'রে নিয়েছে, নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাদের সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত ক'রে নিয়েছে।

আমরা জানি, ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ, বৈষ্ণবীয় লীলাবাদ, কালিদাসের কাব্য-নাটকাদির শৈব জীবনবেদ, বুদ্ধদেবের জীবনাদর্শ (বৌদ্ধদর্শন নয়), মধ্যযুগের সন্তদের সাধনা, সুফী সাধকদের মরমিয়া সাধকদের অনুভূতিমার্গ রহস্যমার্গ, সহজিয়া পন্থা, বাউলপন্থা — রবীন্দ্র-দর্শন রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্ব নানা ধারার নানা দানে পুষ্ট। কিন্তু এ-ও আমরা জানি যে, এর কোনোটিই নিষ্ক্রিয় গ্রহণ নয়। এই গ্রহণ-বর্জনের মধ্যেও প্রতিভার নির্বাচনলীলা ক্রিয়াশীল। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই গৃহীত বস্তু রবীন্দ্র-চিন্তার কাছে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করেছে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই রবীন্দ্র-চিন্তার প্রভাবে গৃহীত বস্তুর নবজন্মলাভ ঘটেছে।

মনে রাখতে হবে, এ-সব দানকে প্রভাব বলা অসঙ্গত, এ হ'লো আমাদের জাতীয় উত্তরাধিকার। এর ক্রিয়া শুধু সচেতন আহরণের পথেই ঘটে না। এর ক্রিয়া আমাদের রক্তের মধ্যে। এর পূর্ণ পরিমাপ বা সম্যক্‌ হিসেব-নিকেশ কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু এ-কথাও তো সত্য যে, রক্তের মধ্যে কতকগুলি বাছা-বাছা পোষ-মানা উপাদানই মাত্র থাকে না। আমাদের রক্তের মধ্যে শুধু উপনিষদ্‌, শুধু বৈষ্ণব তত্ত্ব

বা শুধু বাউলগানই নেই, রক্তের মধ্যে আছে পুঞ্জীভূত সংস্কার — স্তূপীকৃত ঐশ্বর্য, রাশিকৃত জঞ্জাল, জাতীয় স্মৃতির জটিল বিচিত্র পুঞ্জীকৃত উপাদানসম্ভার। সেই অজস্রতার মধ্যে থেকে, সেই জটিল কুটিল উপাদানপুঞ্জ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে কেবল বিশেষ কয়েকটিকেই গ্রহণ করেছেন, যা নিয়েছেন তার বহু বহু গুণ যে পরিত্যাগ করেছেন, গৃহীত উপাদানের যে সম্যক্‌ 'রবীন্দ্রীকরণ' ঘটেছে, এর মূলে আছে রবীন্দ্র-চিন্তার নিজস্ব আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক বলক্রিয়া।

অনেক গ্রহণ আছে, যা গ্রহণই নয়, কেবল বচন-সংকলন। ভারতীয় অলংকার-শাস্ত্র থেকে গ্রহণ অনেকটা এই জাতের। তা কেবল বিচ্ছিন্ন দু-একটি বচনের উদ্‌ধৃতি এবং নিতান্ত ভাসা-ভাসা রকমের মৌখিক স্বীকৃতি ছাড়া গভীরতর আর-কিছুই নয়। দু-একটা উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথ রস কথাটা বহুবার ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ভারতীয় রসবাদীদের পারিভাষিক অর্থের সঙ্গে তার কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। রবীন্দ্রনাথ রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলেছেন। এটা খাঁটি রসবাদী উক্তি। কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময় লৌকিক ভাবকেই রস বলেছেন, যা রসবাদীরা কখনোই বলবেন না। তিনি বলেন, "সৌন্দর্যের রস আছে, কিন্তু একথা বলা চলে না যে, সব রসেরই সৌন্দর্য আছে।"[১] — বলা বাহুল্য, এ-কথা ভারতীয় রসবাদ-সম্মত কথা নয়। কখনো কখনো তিনি রসকে বলেছেন ঐক্যবোধ।[২] কথাটা খাঁটি রাবীন্দ্রিক, রসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে এখানেও তাঁর মিল হবে না। কখনো তিনি বলেছেন, রস অনির্বচনীয়।[৩] এখানেও অধিকাংশ রসবাদীই তাঁর বক্তব্যকে অর্থহীন ব'লে উড়িয়ে দেবেন। সাহিত্যতত্ত্বকে কেন অলংকারশাস্ত্র বলা হয় তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অলংকার জিনিসটাই চরমের প্রতিরূপ।"[৪] এখানে 'চরম' অর্থ হ'লো অসীম। "বন্ধুকে দেখি অসীমে, তাই আপনি জেগে ওঠে ভাষায় অলংকার...।"[৫] অলংকার কথাটার এই অর্থ সম্পূর্ণ অভিনব। এ-ব্যাখ্যায় ধ্বনিবাদী অলংকারবাদী কেউ-ই স্বস্তি অনুভব করবেন না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "...অলংকৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য।" এখানে অলংকার কথাটাকে যদি প্রচলিত ভারতীয় অর্থে ধরি, তাহ'লে কী অলংকারবাদী কী রসবাদী কেউ-ই এ-কথাকে গ্রহণ করবেন না। অলংকারবাদী করবেন না, কারণ তাঁরা রস মানেন না। রসবাদী করবেন না, কারণ তাঁরা কাব্যে অলংকারের স্বাতন্ত্র্য মানেন না, তাঁরা মনে করেন অলংকার একান্তভাবে রসপরতন্ত্র, রসই নিজেকে অভিব্যক্ত করার আবেগে অলংকারকে সৃষ্টি করে।

ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নীরব। এই একটি ব্যাপারই ভারতীয়

সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ঔদাসীন্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়। বলা বাহুল্য, এ-ঔদাসীন্য অবহেলা বা অশ্রদ্ধাপ্রসূত নয়। এ তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার প্রবলত্বেরই, তাঁর দুর্বার স্বকীয়ত্বেরই পরিচায়ক। এই স্বকীয়ত্বের কারণেই ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। খুব গভীর পরিচয় ঘটতে পারে এমনভাবে আকৃষ্টও করেনি।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গ্রহণ-বর্জনের মধ্যেই এইধরনের দৃশ্যত বিনম্র কিন্তু কার্যত অনমনীয় স্বকীয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে। সুপরিচিত ক্ষেত্র থেকেই রবীন্দ্রনাথের গ্রহণ-বৈশিষ্ট্যের একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে এই ব্যাপারটাকে একটু বুঝে দেখার চেষ্টা করা যাক। উপনিষদ্ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে অনেক গ্রহণ করেছেন, এ-কথা আমরা সব সময়ই ব'লে থাকি। কিন্তু সেই গ্রহণটাই কি নিষ্ক্রিয় গ্রহণ? সকলেই জানেন, সত্তা রস-স্বরূপ, এই ঔপনিষদিক তত্ত্বটি রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বের একটি মূল প্রত্যয়। যা-কিছু আছে সবই আনন্দরূপ, সবই অমৃত, উপনিষদের এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ বার-বার উদ্‌ধৃত করেছেন। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে, নিজস্ব উপলব্ধির সাক্ষ্য ছাড়াই, মাত্র উপনিষদে আছে ব'লেই রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বটি হাত পেতে উপনিষদের কাছ থেকে ঋণ রূপে গ্রহণ করেছেন? উপনিষদে এ-তত্ত্ব না-থাকলে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে আমরা এর সাক্ষাৎ পেতাম না?

এ-রকম মনে করবার কোনো সঙ্গত কারণ দেখি না। ঠিক এইধরনের কথা হোয়াইটহেডও তো বলেছেন। হোয়াইটহেডের দর্শন ঔপনিষদিক দর্শন নয়, তাঁর নিজেরই দর্শন। রবীন্দ্রচিন্তাও রবীন্দ্রনাথের নিজেরই চিন্তা। উপনিষদে জ্ঞানগর্ভ আরো অনেক বস্তুই ছিলো, তার সব-কিছুই তো রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেননি! নিজের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গত হবে না, এমন কোনো-কিছু রবীন্দ্রনাথ অপরের কাছ থেকে নেননি, উপনিষদের কাছ থেকেও না, পাশ্চাত্য রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্ব থেকেও না।

সত্তা রস স্বরূপ, এ-প্রত্যয় তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির কাছ থেকে পাওয়া, তাঁর আপন কবিদৃষ্টির দান। উপনিষদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিদৃষ্টির সমর্থন পেয়েছেন ব'লেই তিনি সানন্দে উপনিষদ বাক্যকে ব্যবহার করেছেন, এই মাত্র। কিন্তু লক্ষ করতে হবে, ব্যবহারটা সম্পূর্ণ নিজের মতো ক'রে, নিজের কবিদৃষ্টির অনুশাসনে মাটির কাছাকাছি থেকে। দর্শনের টানে রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্ব ঊর্ধ্বাকাশচারী হয়েছে ব'লে ইতিপূর্বে আমরা কিছু আক্ষেপ করেছিলাম। সে-আক্ষেপ অকারণে নয়। কিন্তু উল্টোদিকের সত্যটাও যেন আমরা বিস্মৃত না-হই : কবিদৃষ্টির টানে রবীন্দ্র-দর্শনও যে আবার ঊর্ধ্বাকাশ ছেড়ে

লোকালয়ের অনেক কাছে নেমে এসেছে, এই আনন্দ-সংবাদটিকেও যেন আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখি।

যে-যুক্তিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজগৎকে মানববিশ্ব বলেছেন, তা কবির যুক্তি, শিল্পীর যুক্তি। অথবা যুক্তিও নয়, তার নাম বোধ, সর্বানুভূতিশীল কবির বোধ। যে-অনুভবের জোরে রবীন্দ্রনাথ সম্মিলিত মানবমনকে মানবব্রহ্ম বলেছেন, তার নাম প্রীতি। এই বোধ এই প্রীতি, এ তাঁর ধার-করা বস্তু নয়, সম্পূর্ণ নিজের। যুক্তি ধার করা যায়, প্রেম ধার করা যায় না।

আমি এবং না-আমি, আমার থাকা এবং অপর সব-কিছুর থাকা রবীন্দ্র-চিন্তায় যে-ডায়লেক্‌টিক সম্পর্কে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত সে-ডায়লেক্‌টিক্‌সের সন্ধান উপনিষদে মিলবে না। ডায়লেক্‌টিক্‌সের সন্ধান যদি-বা কোথাও মেলে, এই প্রেম এই প্রীতি-প্রসন্নতার সহজ অনুভব কোনো তত্ত্বগ্রন্থে মিলবে না। এ-অনুভব কবির অনুভব।

সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, মানবসংসারের সমস্ত হাসি-কান্না আনন্দ-বেদনা, গিরিনদবর্তী, গ্রাম থেকে নদীতলবর্তী গ্রাম পর্যন্ত প্রতিদিনের লোকযাত্রা — এই প্রত্যক্ষ জীবনলীলা রবীন্দ্র-চিন্তায় যে-রকম নিঃসংশয় স্বীকৃতি পেয়েছে, পূর্বসূরির কোনো উপনিষদ্‌ ভাষ্যে রূপময় বাস্তবকে এইরকম পরমমূল্যে গ্রহণ করবার তুলনা পাওয়া যাবে না। যে-অনুভবের জোরে রবীন্দ্রনাথ সত্তামাত্রকে রস-স্বরূপ ব'লে চিনেছেন, তা রূপদ্রষ্টা, রূপস্রষ্টা, রূপমুগ্ধের অব্যবহিত অনুভব। রূপমুগ্ধ কবি অত্যন্ত সহজ সুরে যখন গেয়ে ওঠেন :

"এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া,
এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির
গঙ্গা-যমুনায়।
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি,
নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ
সকল অঙ্গে মনে।
পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল
তৃণ তরুর সনে।"[৭]

— তখন তাকে জ্ঞান, চিন্তা বা তর্ক বলতে আমাদের স্বভাবতই দ্বিধা হয়। অথচ রবীন্দ্রনাথের চিন্তা এইরকমই রূপ-লগ্ন, এইরকমই অনুভব সংসক্ত। রূপজগৎকে

নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন-ক'রে-থাকা এই যে সহজ জীবনপ্রেম, একে কি দার্শনিকতা ব'লে অভিহিত করা যায়? অথচ এ সহজ অনুভবই রবীন্দ্র-দর্শনের উৎসস্থল। শুধু দর্শনের নয়, সাহিত্যতত্ত্বেরও।

রবীন্দ্রনাথ যে-সত্তাকে রস-স্বরূপ বলেছেন, তা এই সহজ জীবনপ্রেম থেকেই। সহজ, কিন্তু শিথিল নয়। সহজ, কিন্তু ঝিমন্ত নয়।

"রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ...।"[৮]

'রূপনারানের কূলে জেগে উঠিলাম', আর 'চিনিলাম আপনারে', রবীন্দ্রনাথের অনুভবে এই দুই সত্য এক হ'য়ে গিয়েছে। যে-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এই জেগে-ওঠা এবং এই চেনা সার্থক হয়, তাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সৃজনশীলতা।

এই সৃজনশীলতার প্রত্যয়টিকে রবীন্দ্র-রচনায় আমরা ঠিক যেভাবে পাই, তাকে আর যাই-ই বলি, তত্ত্ব বলবো না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকে তত্ত্ব বলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

"একে বোলো না তত্ত্ব;
আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব-আমির রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ।"[৯]

না, তত্ত্ব নয় — না দর্শনের, না সাহিত্যের। অথচ রবীন্দ্র-দর্শন এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্ব দুই-ই একে অন্তরঙ্গভাবে স্পর্শ ক'রে আছে। রূপনারানের কূলে দাঁড়িয়ে নিজেকে চিনে নেওয়ার জীবন্ত সত্য থেকে যেখানেই রবীন্দ্র-চিন্তা দূরে স'রে গিয়েছে, সেইখানেই সে নীরক্ত এবং পাণ্ডুর হ'য়ে গিয়েছে, নিরুত্তাপ, নির্বস্তুক এবং বায়বীয় হ'য়ে গিয়েছে।

গোড়ার দিকে এক সময় আমরা বলেছিলাম, রবীন্দ্র-দর্শন এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্ব

অভিন্ন বস্তু। সেই কথা দিয়েই আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করবো। হয়তো ভিন্নতা কিছু আছে, কিন্তু সে অকিঞ্চিৎকর। দুয়েরই উৎস এক, দুয়েরই পরিণাম এক। সব থেকে বড়ো কথা, দুয়েরই আস্বাদ এক — দুই-ই আস্বাদন-ধর্মী।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব খাঁটি সাহিত্যতত্ত্ব নয়, রবীন্দ্রনাথের দর্শনও খাঁটি দর্শনতত্ত্ব নয়। দুয়েরই অবস্থান সাহিত্যতত্ত্ব এবং দর্শনের মধ্যবর্তী লোকে। এইখানেই তাদের মর্মগত ঐক্য। উপরন্তু, দুই-ই শিল্পধর্মী। এ-দিক থেকেও তারা অভিন্ন।

---

১. "সাহিত্যতত্ত্ব", 'সাহিত্যের পথে', ব।১৪।৩৫৪-৫ ✓

২-৩. তদেব, র। ১৪।৩৫৫

৪-৬. "সাহিত্যধর্ম", 'সাহিত্যের পথে', ব।১৪।৩২৭ ✓

৭. "পূরবী", 'পূরবী', র।২।৬১৫

৮. ১১, 'শেষ লেখা', র।৩।৯০২

৯. "আমি", 'শ্যামলী', র।৩।৩৯২

সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় ভাগ : সমালোচনাতত্ত্ব

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাতত্ত্ব

সমালোচনাতত্ত্ব — ইংরেজীতে যাকে বলে Theory of Criticism বা Principles of Criticism — তত্ত্ব হ'লেও তা সমালোচকের ব্যবহারিক প্রয়োজনের সঙ্গে সংপৃক্ত তত্ত্ব। যদিও তার স্থান শিল্পদর্শনের (Philosophy of Art-এর অথবা ইস্থেটিক্‌সের — বাংলা পরিভাষায় যাকে বলা হয় নন্দনতত্ত্ব অথবা কান্তিবিদ্যা) প্রান্তসীমায়, তাহ'লেও সমালোচকের ব্যবহারিক প্রয়োজনের সঙ্গে আবদ্ধ বলে'ই তা শিল্পদর্শন থেকে অনেকাংশে পৃথক্‌। শিল্পদর্শনে আর্টকে দেখা হয় নানাভাবে নানান্‌ দিক থেকে — স্রষ্টা ভোক্তা লৌকিক লোকোত্তর সমস্ত রকম ভাব-ভূমি থেকেই। সমালোচনাতত্ত্বে তার কোনো প্রয়োজন নেই। এখানে আর্টকে দেখার চেষ্টা কেবলমাত্র সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে, সমালোচকের বিশিষ্ট সমস্যার দিক থেকে।

সমালোচনা প্রসঙ্গে যে-কথা সর্বাগ্রে স্মরণীয় তা হ'লো এই দৃষ্টিকোণের বিশিষ্টতার কথা। সমালোচক আর স্রষ্টা দু-জনে ঠিক একই ভূমিতে দাঁড়িয়ে আর্টকে দেখেন না। সমালোচকের দৃষ্টিকোণ মূলত ভোক্তার দৃষ্টিকোণ। সম্ভোগের একটা স্তরে যেমন স্রষ্টা ও ভোক্তার একাত্মতাবোধ অপরিহার্য, সেই সম্ভোগেরই আর-একটা স্তরে তেমনি উভয়ের ভিন্নতাবোধ — স্রষ্টার পক্ষে স্রষ্টৃত্ববোধ এবং ভোক্তার পক্ষে ভোক্তৃত্ব-বোধ — সমান অপরিহার্য। এই ভোক্তৃত্ববোধের মধ্যেই সমালোচনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিহিত। সাহিত্য হিসাবে সমালোচনার যে-পরিচয়, সেই সাধারণ পরিচয় অবশ্যই তার সত্য পরিচয়। কিন্তু তা ছাড়াও, সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা হিসাবে তার একটি স্বকীয় পরিচয় আছে। সেইখানেই তার নিজস্বতা, তার সমালোচনাত্ব।

সেই পরিচয়টি কী? সোজা কথায়, সমালোচনার সেই বিশেষ কাজটি কী যাকে একেবারে তার নিজস্ব কাজ বলা যায়? সমালোচনাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ বলেন, সমালোচনার নিজস্ব কাজ হ'লো — ব্যাখ্যা পরিচয় ও বিচার।

রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বলেছেন, সাহিত্যের প্রেরণা স্রষ্টার আত্মপ্রকাশের প্রেরণা; সাহিত্যের আনন্দ স্রষ্টার আত্মপ্রকাশের আনন্দ। বুঝতে কষ্ট হয় না, রবীন্দ্রনাথ এখানে স্রষ্টার দৃষ্টিভূমি থেকেই কথা বলছেন — এ-কথা সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার দিককার কথা। এ-কথা সমালোচকের নিজস্ব কথা নয়। সমালোচকও অবশ্য স্রষ্টার ভূমিকায় দাঁড়িয়ে

কথা বলতে পারেন, অনেক সময় ব'লেও থাকেন। কিন্তু তখন তাঁর কথার, সমালোচকের কথা হিসাবে কোনো বাড়তি মূল্য নেই। কেননা তখন তাঁর ভূমিকা ভোক্তার নিজস্ব ভূমিকা নয়। সমালোচকের বিশিষ্ট ভূমিকা হ'লো সচেতন ও সক্রিয় ভোক্তার ভূমিকা। 'ক্রিটিক qua ক্রিটিক' এই ভূমিকা থেকেই সাহিত্যকে দেখবেন এবং সমালোচনাতাত্ত্বিক এই ভূমিকার কথা স্মরণ রেখেই সমালোচনার স্বরূপ নির্ণয় করবেন।

স্রষ্টার প্রেরণা আত্মপ্রকাশের প্রেরণা, কিন্তু ক্রিটিক যেখানে বিশুদ্ধ ক্রিটিক সেখানে তাঁর প্রেরণাটি কিসের প্রেরণা? সমালোচনার প্রেরণাকে রবীন্দ্রনাথ সমালোচকের আত্মপ্রকাশের প্রেরণা ব'লে দাবি করেননি। বোঝা যাচ্ছে, সমালোচকের দৃষ্টিকোণের বিশিষ্টতাকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তাঁর মতে সমালোচকের নিজস্ব ভূমিটি হ'লো রসাস্বাদন ও রস-পরীক্ষার ভূমি — ব্যাখ্যা পরিচয় ও বিচারের ভূমি। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাতত্ত্ব [1]প্রধানত এই 'বিচার কথাটিকে কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে উঠেছে।

১

বিচার কথাটাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করা অবশ্য সহজ নয়। সাহিত্যের বিচার, — কথাটা শুনলেই সেই বাউল গানটি মনে পড়ে—

> ফুলের বনে ঢুকেছে কোন্ সোনার জহুরী
> সে যে নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি মরি।—

এক কালে বিচার নিয়ে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হয়েছিলো ব'লেই বোধকরি বিচারমূলক বা জুডিসিয়াল সমালোচনায় আজকাল একটা বড়োরকমের ভাঁটার কাল চলছে। যে-যুগটাকে সচরাচর ক্লাসিক শিল্প-আদর্শের যুগ বলা হয়, সেই পুরানোকালে সমালোচনা মানেই ছিলো বিচার আর বিচার মানেই ছিলো সরাসরি জজিয়তি করা। ব্যাখ্যা পরিচয় রসাস্বাদন — এ-সব প্রশ্ন গৌণ। দেখতে হবে রচনাটি কতোখানি ফরমূলা-মাফিক হয়েছে। ফরমূলাটা গ্রীক সাহিত্য (প্রধানত গ্রীক, অংশত লাতীন) থেকে পাওয়া। সমালোচকের কাজ হ'লো শ্রদ্ধেয় পূর্বাচার্যদের সাহিত্যশাস্ত্র থেকে অবরোহ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত টেনে মিলিয়ে দেখা। দেখা যে, রূপের দিক থেকে রচনাটিতে আদি মধ্য অন্ত কতোটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তার মধ্যে স্থানিক ও কালিক ঐক্য কতোটা রক্ষিত হয়েছে, বস্তুর দিক থেকে তার মধ্যে 'প্রকৃতির অনুকরণ' কতোটা যথার্থ হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। রচনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নয়, তার শ্রেণীগত পরিচয়টাই

একমাত্র কথা। সুতরাং তার বিচারও হবে স্বভাবতই শ্রেণীগত বিচার। অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত শ্রেণীলক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার।

শেষ পর্যন্ত চিরাচরিত প্রথার অনুসরণ এবং অন্ধ নিয়মানুগত্য, এই হ'লো ক্লাসিক-পন্থী সাহিত্যবিচারের আদর্শ। গ্রীক সাহিত্যের অবক্ষয়ের কালে আলেক্জান্‌দ্রিয়ার গ্রীক সাহিত্যিকদের থেকে এই নিয়মানুগত্যের শুরু, তারপর সুদীর্ঘকাল ধ'রে এই ধারা প্রবহমান। রেনেসাঁসের সময়ও এ-মনোভাব মোটামুটি অব্যাহত ছিলো। ক্রমে ক্রমে সমালোচক হ'য়ে উঠলেন সাহিত্যের নিয়মতন্ত্রবিদ্ ও বিধানদাতা, সাহিত্যিকের পথপ্রদর্শক ও ভাগ্যবিধাতা। (Scaliger-এর সেই দম্ভোক্তি স্মরণীয়: "We undertake, therefore, to create a poet.")

মধ্যে একটা স্বল্পায়তন ভাঁটার পর্ব কাটিয়ে এই মনোভাব ইউরোপীয় সাহিত্যে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো বিশেষ ক'রে অষ্টাদশ শতকে — তথাকথিত নব্য-ক্লাসিক যুগে।[১] তার পরেই এলো প্রবল প্রতিক্রিয়ার আন্দোলন, যাকে বলা হয় 'রোমান্টিক রিভাইভ্যাল'। প্রতিক্রিয়ার শুরু বহু পূর্ব থেকেই, এটা অনেকটা তার দ্বিতীয় তরঙ্গ। তবে আন্দোলন বলতে হ'লে এইটেকেই বলতে হয়। প্রকৃত রোমান্টিক সাহিত্য — অর্থাৎ বিশিষ্ট অর্থে রোমান্টিক সাহিত্য — এই সময়েই সৃষ্টির প্রাচুর্যের দ্বারা যথার্থ প্রসার ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছে। রোমান্টিসিস্ট শিল্পতত্ত্ব সমালোচনাতত্ত্বও এই সময়েই সুসংহত ও সুগঠিত হ'য়ে উঠেছে।[২]

সাহিত্যের ইতিহাসে এটা হ'লো প্রথা-ভাঙার যুগ। এ-যুগের বিদ্রোহী সাহিত্য-শাস্ত্রীরা পেণ্ডুলামকে ঠেলে দিলেন একেবারে উল্টোদিকে। প্রচলিত প্রথা, আপ্তবাক্য, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া মাপকাঠি — সব বাতিল হ'য়ে গেলো। বিচারের পুরানো ফরমুলাটাই শুধু বাতিল হ'লো না, কালক্রমে বিচার জিনিসটাই বাতিল হ'য়ে গেলো।

এই রোমান্টিক সাহিত্য-আন্দোলনের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবেই আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার আবির্ভাব। চিরাচরিত প্রথার অন্ধ আনুগত্য রবীন্দ্রনাথ কখনোই সহ্য করেননি। সমালোচনার ক্ষেত্রে সমস্ত গতানুগতিক ফরমূলাকে তিনিও বাতিল ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু বিচার জিনিসটাকে তিনি বাতিল ক'রে দেননি। বাতিল করা দূরে থাকুক, বরং বিচার বা মূল্যায়নের উপরেই তাঁর আসল জোর। ব্যাখ্যা এবং পরিচয় তো বটেই, কিন্তু সেইখানেই শেষ নয়। মাঝে মাঝে অন্যরকম কথা বললেও, রচনা-বিশেষের সাহিত্যমূল্য নিরূপণই রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যসমালোচকের আসল দায়িত্ব। একদিকে ক্লাসিকপন্থী সাহিত্যশাস্ত্রীদের

সনাতন ফরমুলায় অনাস্থা, অন্যদিকে মূল্যায়নে গভীর বিশ্বাস — একদিকে বাঁধ-ভাঙা বিদ্রোহ, অন্যদিকে সুকঠিন সংযম, এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাতত্ত্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

২

বিচার মানেই অবশ্য জজিয়তি করা নয়। সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে বিচার কথাটার এ-রকম সঙ্কীর্ণ প্রয়োগকে সকলের আগে ভুলে যেতে হবে। সমালোচক উচ্চ আসন থেকে রায় বর্ষণ করবেন আর স্রষ্টা আভূমি নত হ'য়ে তা মাথা পেতে নেবেন, এইধরনের স্পর্ধিত দাবিকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই সহ্য করেননি। কিন্তু তবু, বিচার যদি হয়, তাহ'লে রায় একটা থাকবেই। সে-বিচার যদি নতজানু হ'য়েও করা হয়, তাহ'লেও বিচার বিচারই। আসল কথা, এ-বিচার লেখকের নয়, রচনার। প্রকাশিত রচনা লেখকের নিজস্ব সম্পত্তি নয়, তার উপর অধিকার সমগ্র সমাজের। সেই সমালোচনাই সার্থক সমালোচনা যা কারো ব্যক্তিগত উক্তি নয়, যা পাঠক-সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় উক্তি। এ-বিচার ভালোবাসার বিচার — উচ্চভূমি থেকেও নয়, স্পর্ধিতও নয়। রসজ্ঞ পাঠক ভালোবাসার দাম দিয়ে এই অধিকার অর্জন করেন। এ শুধু অধিকারই নয়, এ তাঁর দায়িত্বও বটে। কেননা সাহিত্যও তো রসিকের রসজ্ঞতার কষ্টি-পাথরে নিজের দামটা যাচাই ক'রে নিতে চায়। সেইখানেই তো তার প্রকৃত আত্মপরিচয়।

সমালোচনা কথাটার অর্থের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ভাব আছে। সমালোচনার নামে যা-কিছু সাহিত্যের বাজারে চ'লে আসছে, তার সব-কিছুই যে প্রকৃত সমালোচনা নয়, এ-বিষয়ে একটুও দ্বিমত দেখা যায় না। কিন্তু এর কোন্‌গুলি যে 'প্রকৃত' সমালোচনা তা নিয়ে মতান্তরের অবধি নেই।

বিচার কথাটার অর্থ মোটামুটি স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ এই কারণেই বোধকরি সাহিত্য সমালোচনা কথাটির বদলে সাহিত্য-বিচার কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। তাঁর সমালোচনাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় একাধিক প্রবন্ধের নাম "সাহিত্য-বিচার"। এই জাতীয় একটি প্রবন্ধের ("সাহিত্য-বিচার", 'প্রবাসী', ১৩৩৬ কার্তিক, 'সাহিত্যের পথে'র গ্রন্থ পরিচয় দ্রষ্টব্য) আরম্ভেই তিনি বলেছেন :

"প্রথমেই বলে রাখি, যাকে সাধারণত আমরা সাহিত্য-সমালোচনা বলি সাহিত্য-বিচার শব্দটাকে আমি সেই অর্থে ব্যবহার করেছি। আলোচনা বলতে বুঝি পরিক্রমা, বিষয়টির উপর পায়চারি করে বেড়ানো; আর বিচার হল

পরিচয় — তাকে যাচাই করা। বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়াই সাহিত্য-বিচারের লক্ষ্য।"

এ-কথার অর্থ পরিষ্কার। সমালোচনা মানে বিষয়-পরিক্রমা, তার ব্যাখ্যা ও পরিচয়, তার যাচাই করা অর্থাৎ তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা মূল্য নিরূপণ করা। কিন্তু এই পরিষ্কার অর্থে পৌছুবার আগে কয়েকটি বাধাকে অতিক্রম ক'রে আসতে হয়। তার কারণ উদ্‌ধৃতিটির সমস্ত অংশ সমান স্পষ্ট নয়। তা হ'লেও উদ্‌ধৃতিটি নানা দিক থেকে খুব মূল্যবান। সেই কারণে, অর্থ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে একে একটু বিশদভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখা দরকার।

উদ্‌ধৃতিটির প্রথম বাক্যে বক্তব্য খুব সুনির্দিষ্ট নয়। 'যাকে সাধারণত আমরা সাহিত্য-সমালোচনা বলি' — এ-কথা থেকে নিশ্চিত ক'রে কিছু বোঝা গেলো না। আমাদের সাধারণ ব্যবহারে সমালোচনা কথাটার কোনো সর্বজন-স্বীকৃত অর্থ পাওয়া যায় না। কাকে যে প্রকৃত সমালোচনা বলা যায় সেইটেই আমাদের প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ কেন সমালোচনা কথাটার বদলে বিচার কথাটা ব্যবহার করতে চান তার কোনো ইঙ্গিত এর মধ্যে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রখর শব্দার্থ-সচেতন লেখক অবশ্যই বিনা হেতুতে শব্দের পরিবর্তন করার প্রস্তাব করেননি।

তারপর বলেছেন : আলোচনা হ'লো পরিক্রমা, 'বিষয়টির উপর পায়চারি করে বেড়ানো'। জিজ্ঞাস্য এই যে, আলোচনামাত্রেই পরিক্রমা হ'তে পারে, আলোচনা-মাত্রেই কি সমালোচনা? আলোচনামাত্রেই কি বিচার?

অতঃপর বলেছেন, 'বিচার হল পরিচয়'। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, বিচারে পরিচয় অনুস্যূত থাকতে পারে, কিন্তু পরিচয়মাত্রেই কি বিচার? পরিচয় অসংখ্য-রকমের হ'তে পারে (অবশ্য সমস্ত পরিচয়ের মধ্যেই অলক্ষ্য বিচার নিহিত থাকতে পারে, কিন্তু সে হ'লো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস)। কীটও তো মহাভারতের একটা মৌখিক পরিচয় জানে। কোন্ বিশেষ ধরনের পরিচয়কে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা বলছেন, বিচার বলছেন?

শ্রেণীগত পরিচয়? সাহিত্যের শ্রেণীগত পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথের একটুও আস্থা নেই। তাহ'লে ঐতিহাসিক পরিচয়? কিন্তু সে-পরিচয়ও তাঁর কাছে সাহিত্যের আসল পরিচয় নয়। তাহ'লে এ-পরিচয় অবশ্যই শিল্পগত পরিচয়। আলোচ্যমান প্রবন্ধে একটু পরে তিনি নিজেই ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন, "সাহিত্য-বিচারে পরিচয়টি সাহিত্যিক হওয়া চাই।"

কিন্তু শ্রেণীগত পরিচয় যাঁর কাছে গণনীয় নয়, তাঁর কাছে প্রত্যেক শিল্পবস্তুই

অদ্বিতীয়। তার একমাত্র পরিচয় সে নিজেই। কোনোরকম বিকল্প দিয়েই তার অদ্বিতীয় সত্তার পরিচয় দেওয়া যায় না। নিছক তথ্যগত ব্যাখ্যা বা বর্ণনার সেই অনন্ত সত্তার সাক্ষাৎ মিলবে না।

অনেক সময় বলা হয়, রসের পরিচয়। হয়তো তা বলা যায়। তবে পরিচয় কথাটা এখানে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। সমালোচনা কি মূল বিষয়ের বিশেষ রসটির সাক্ষাৎ পরিচয় দেয়? আদৌ তা দিতে পারে কি? তাছাড়া শিল্পবস্তুতে রস কি স্বপ্রকাশ নয়? একটা আলো দেখাবার জন্যে কি আর-একটা আলো জ্বালাবার দরকার হয়? প্রশ্ন হ'তে পারে, রসটা যদি অপ্রকাশিত থাকে? কিন্তু রস তো তার প্রকাশেই সত্য, অপ্রকাশে নয়। সমালোচক হয়তো পাঠকের বন্ধ চোখ খুলে দিতে পারেন, কিন্তু রসের সাক্ষাৎ পরিচয় পাঠকের নিজের দায়িত্ব। তার কারণ বাইরের থেকে রসের পরিচয় দেওয়া যায় না। রসের কোনো সেকেণ্ডহ্যাণ্ড পরিচয় হয় না। তার পরিচয় তার প্রত্যক্ষতায়, তার আস্বাদনে।

পাঠককে রস-সচেতন ক'রে তোলা, তার নিমীলিত বা অর্ধ-নিমীলিত চক্ষুকে ভালো ক'রে খুলে দেওয়া, এ-দায়িত্ব সমালোচকেরা অনেক সময়েই গ্রহণ তাতে সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হ'লো এ-দায়িত্ব সমালোচকের আনুষঙ্গিক দায়িত্ব, না এইটেই তার মূল করণীয়? এই লোকশিক্ষকের ভূমিকাই কি সমালোচকের নিজস্ব ভূমিকা? সমালোচকের বাণী কি অজ্ঞানীর প্রতি জ্ঞানীর অথবা অরসিকের প্রতি রসিকের বাণী?"[৩] রবীন্দ্রনাথ, আলোচ্যমান উদ্ধৃতিটিতে অন্তত, এরকম কোনো ইঙ্গিত করেননি। এখানে তিনি তদ্‌গতভাবে বিষয়-পরিক্রমার কথাই বলছেন, সাহিত্যবোধের ব্যাপারে পাঠককে ট্রেনিং দেবার কথা বলেননি।

সমালোচকেরা অবশ্য কখনো কখনো পরোক্ষ উপায়ে রসের প্রত্যক্ষ পরিচয় দেবার চেষ্টা ক'রে থাকেন। সে হ'লো — সমালোচ্য বিষয়ের অনুরূপ বা সমান্তরাল অপর-একটি রস-সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। এ-কাজ রবীন্দ্রনাথ নিজেও অনেক করেছেন। বলা বাহুল্য, এ-কাজ অতি অল্পের পক্ষেই সাধ্যায়ত্ত। কারণ তাহ'লে, রামায়ণের সমালোচককে বাল্মীকির সমকক্ষ — সমকক্ষ না হোক্ অন্তত কাছাকাছি দরের শিল্পী হ'তে হয়। তা যদি তিনি হনও, তাহ'লেও সেই বিকল্প বা সমান্তরাল রস যে কতোদূর মূলের অনুরূপ হবে তা বলা কঠিন। শিল্পী হিসাবে সমালোচক যতো উঁচুদরের হবেন, তাঁর সৃষ্ট বিকল্প রসটি ততো স্বতন্ত্র হবে ব'লে মনে হয়। শুধু মনে হওয়া কেন, তা-ই যে ঘ'টে থাকে সমালোচনার ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই কখনো কখনো এর প্রমাণরূপে গণ্য হ'তে পারেন।

তাহ'লে কোন্ পরিচয়টা আর বাকি রইলো? কোন্ পরিচয় যা স্রষ্টা নিজে দেন না, নিজে দিতে পারেন না? এই হ'লো সেই পরিচয়, যার মধ্যে আদর্শ ভোক্তার ভোক্তৃত্ব-ভূমিকার সচেতনতা ও সক্রিয়তার স্বাক্ষর মুদ্রিত।

সমালোচনাতত্ত্ব সম্পর্কিত নানা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'রস-পরীক্ষা', 'রস-বিচার', 'সাহিত্যমূল্য-নিরূপণ' ইত্যাদি কথা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। কথাগুলির তাৎপর্য নিশ্চয়ই তাঁর অজানা নয়। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, আলোচ্যমান উদ্ধৃতির 'পরিচয়' কথাটির আসল অর্থ হ'লো মূল্যের পরিচয়। উদ্ধৃতিটির শেষের দিকে এই অর্থই স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে যেখানে তিনি বলেছেন, বিচার হ'লো বিষয়টিকে যাচাই করা। এই 'যাচাই করা' কথাটিতে তুলনামূলক বিচারের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এই দিকে দৃষ্টি রেখেই রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা নামক অনির্দিষ্ট শব্দের বদলে বিচার নামক অনেকখানি সুনির্দিষ্ট শব্দটি ব্যবহারের প্রস্তাব করেছেন।

মূল্যের পরিচয়কে স্বীকার ক'রে নেবার পর পরিচয় কথাটিকে তার চলতি অর্থে গ্রহণ করতেও আপত্তি নেই। সবরকম ব্যাখ্যা সবরকম পরিচয় সমালোচনায় স্থান পেতে পারে। প্রয়োজন হ'লে রস-সৃষ্টির মাধ্যমে পরিচয়, প্রয়োজন হ'লে তথ্যানুসন্ধানের পথে ঐতিহাসিক সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক পরিচয়: প্রয়োজন মতো দুরূহ টেক্স্‌টের গ্রন্থিমোচন ক'রে — উল্লেখ উদ্ধৃতি শব্দার্থ সমস্ত-কিছুর ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে পরিচয় (পরোক্ষভাবে পাঠক বিশেষের চক্ষুরুন্মীলন) — সমালোচনায় উপযুক্ত ক্ষেত্রে সকলেরই স্থান আছে। আছে বটে, কিন্তু নিজগুণে নয় — মূল্য-নিরূপণের ভূমিকা হিসাবে।

এ-কথা যেমন সত্য, তেমনি এর বিপরীত দিকের সত্যটাও স্মরণ রাখা দরকার। বিচার শূন্যে ভেসে থাকতে পারে না। বিষয়-পরিচিতি তার অপরিহার্য অবলম্বন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ শুধু বিচার ব'লেই থেমে যাননি। 'বিষয়টির উপর পায়চারি' করার কথাও বলেছেন, ব্যাখ্যা ও পরিচয়ের উপরেও জোর দিয়েছেন। এরা অবান্তর বা বাহুল্য নয়। ব্যাখ্যা পরিচয় ও বিচার, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাতত্ত্বে তিনটিই একসূত্রে গাঁথা।

আলোচ্যমান উদ্ধৃতিটি আমাদের কাজের দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তার কারণ অল্প কয়েকটি কথায় রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সমালোচনাতত্ত্বের আভাস এর মধ্যে চমৎকার ফুটে উঠেছে। এ-সমালোচনাতত্ত্ব ক্লাসিকপন্থী না-'হয়েও বিচারমূলক। রোমাণ্টিক না-হ'য়েও সৃজনধর্মী এবং পরিচয়মূলক। পণ্ডিতী না-হ'য়েও ব্যাখ্যামূলক।

সমালোচনাকে বিচার ব'লে মেনে নিলে সেই সঙ্গে এ-ও মানতে হয় যে সমালোচনা একটা বিষয়নিষ্ঠ তদ্‌গত ব্যাপার। মানতে হয় যে, সমালোচনায় বুদ্ধি ও মননশীলতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বেশ দ্বিধাহীন কণ্ঠেই ঘোষণা করেছেন.। এ-দিক থেকে রোমান্টিসিস্ট সমালোচনাতত্ত্বের সঙ্গে রাবীন্দ্রিক সমালোচনাতত্ত্বের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক ব'লেই পরিচিত। তিনি নিজেও তাঁর এ-পরিচয়কে কখনো অস্বীকার করেননি। আমরাও তা করছি না। প্রশ্ন হ'লো রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাতত্ত্বকে নিয়ে। এবং এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বকে নিয়ে, রবীন্দ্রনাথের philosophy of art বা শিল্প-দর্শনকে নিয়ে।

রোমান্টিসিস্ট শিল্পদর্শনে বিচার-বুদ্ধির ভূমিকা গৌণ, অনেক সময় তা সম্পূর্ণ অস্বীকৃত। অন্য ক্ষেত্রে দূরে থাক, এমন-কি প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও। সমালোচনার ক্ষেত্রেও।[8] রোমান্টিসিস্ট সাহিত্যশাস্ত্রীরা বিচার-বুদ্ধি বা জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়াকে স্বল্পতম স্থান দিতেও প্রস্তুত নন। রোমান্টিসিস্ট শিল্পদর্শন মূলত আবেগ-ভিত্তিক এবং কার্যত বুদ্ধিবিরোধী।[৫] এ-শিল্পদর্শনে যার বেশি মর্যাদা, সে এক বুদ্ধি-অতীত রহস্যময় শক্তি। তার নাম প্রতিভা। তার বাহন দৈব প্রেরণা। তার আশ্রয় অঘটন-ঘটন-পটিয়সী কল্পনাশক্তি। সৃষ্টি হ'লো কল্পনার মধ্যে দিয়ে সেই দিব্য প্রতিভার রহস্যময় আত্মপ্রকাশ। স্রষ্টার মনোজগতের রহস্যই পরমতম রহস্য, চরমতম সত্য। সেইখানেই আর্টের সত্যতম পরিচয়। সেইজন্য রোমান্টিসিস্ট শিল্পদর্শনের কেন্দ্রস্থ তত্ত্বই হ'লো আত্মপ্রকাশের তত্ত্ব। আর্টের যে-কোনো শাখার যে-কোনো তত্ত্ব এই মৌল তত্ত্ব থেকে অনুসৃত। বলা বাহুল্য, সমালোচনা-তত্ত্বও তাই।

রোমান্টিক সমালোচনার যাত্রা শুরু হয়েছে শিল্পীর আত্মপ্রকাশের রহস্য-উদ্‌ঘাটনের চেষ্টার মধ্যে দিয়ে। আত্মপ্রকাশের সাফল্যের উপরেই যখন শিল্পের শিল্পত্ব, তখন সমালোচকের একমাত্র কাজই হ'লো শিল্পীর আত্মপ্রকাশের পুঙ্খানুপুঙ্খ জরীপ করা। অর্থাৎ সৃষ্টিকে স্রষ্টার অহং-এর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া। কবির অন্তর্জীবনের রেকর্ড হিসাবেই কাব্যের সার্থকতা। সুতরাং কাব্য নয়, কবিই সমালোচকের মূল লক্ষ্য-বস্তু। সমালোচকের আসল কাজই হ'লো শিল্পীর মনকে — তাঁর গভীর মনোবাসনাকে আবিষ্কার করা। দেখতে হবে, শিল্পীর মন ঠিক কী জিনিসটি চেয়েছিলো, শিল্পীর

মনোগত অভিপ্রায় কী ছিলো। শিল্পীর উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়, যাকে বলা হয়েছে 'intention', সেটাই সমালোচনার প্রধান কথা। শিল্পীর অভিপ্রায় দিয়েই শিল্প-বস্তুকে বুঝতে হবে, তার সার্থকতা-অসার্থকতার হদিস পেতে হবে।

'অভিপ্রায়ে'র উপর এমন একান্তভাবে নির্ভর করা কি সমালোচকের পক্ষে খুব নিরাপদ? নিরাপদ হোক্ আর না হোক্, আত্মপ্রকাশতত্ত্বের লজিক এই দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। লেখকের অভিপ্রায়ের সন্ধান কোথায় মিলবে? রচনার মধ্যে, না রচনার বাইরে? অনেকে বাইরে যেতে প্রস্তুত নন। কিন্তু মুশকিল হ'লো এই যে, লেখকের অভিপ্রায় দিয়ে রচনাকে বুঝবো আবার রচনার মধ্যে থেকেই লেখকের অভিপ্রায়ের খোঁজ পাবো, এ হ'লো একটা ভ্রান্তিচক্র।

খানিকটা যেন এই বাধার মুখোমুখি হ'য়েই (খুব সচেতনভাবে না-ও হ'তে পারে) রোমান্টিক সমালোচনায় কয়েকটি অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হ'লো। একটি ধারা প্রকাশতত্ত্বের লজিক-কেই এড়িয়ে গেলো। অর্থাৎ অভিপ্রায়ের প্রশ্ন পর্যন্ত অগ্রসরই হ'লো না। অপর একটি ধারা লেখকের রচনার মধ্যে লেখকের অভিপ্রায়-সন্ধানে বিরত হ'য়ে, রচনার বাইরে অনুসন্ধানের অভিযানে ব্রতী হ'লো। রচনার শিল্প-সার্থকতার প্রশ্নটা ক্রমেই চাপা প'ড়ে গেলো।

প্রথম ধারায় শিল্পসার্থকতার প্রশ্ন পুরোই বজায় রইলো, শিল্পীর অভিপ্রায়ের কথাটাই চাপা পড়লো (যদিও সম্পূর্ণভাবে নয়)। তাহ'লে সার্থকতা নিরূপণের মাপকাঠিটা কোথায়? অনুভূতির তীব্রতা, গভীরতা ও ব্যাপকতায়। আবেগের স্বতঃস্ফূর্ততা ও আন্তরিকতায়। কল্পনার স্বকীয়তায়, ভাবাবহের বিশিষ্টতায়। শুধু এইটুকুই যদি হ'তো তাহ'লে হয়তো রোমান্টিক বিশুদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারতো। কিন্তু ঠিক এইখানেই থামা যায় না। সার্থকতা-নিরূপণের রন্ধ্রপথ দিয়ে বিচার, এবং বিচারের হাত ধ'রে যুক্তি-বুদ্ধি ও নিয়ম-কানুন এসে উপস্থিত হয়। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি পাঁচ-মিশালী বা একলেকটিক জাতের সমালোচনা। অতঃপর একে রোমান্টিক ব'লে অভিহিত করার যুক্তি রইলো শুধু এইটুকু মাত্র যে, এ-সমালোচনা ক্লাসিকপন্থী নয় এবং এর নানান্ উপাদানের মধ্যে রোমান্টিক উপাদানই ওজনে অপেক্ষাকৃত ভারী।

দ্বিতীয় ধারাতে অভিপ্রায়ের প্রশ্নটিকেই চূড়ান্ত মূল্য দেওয়া হয়েছে, সার্থকতা-অসার্থকতার প্রশ্নকে নয়। অভিপ্রায় ব্যাপারটিকে এখানে একটি সুবৃহৎ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে নেওয়া হয়েছে। শিল্পী শুধু স্রষ্টাই নন, তিনি নিজেও জটিল ঘটনাচক্রের সৃষ্টি। অভিপ্রায়ের আদি উৎস সেইখানে। কিংবা আরো পিছনে।

অতএব শুধু শিল্পীর অভিপ্রায় নয়, সমাজের অভিপ্রায়, যুগের অভিপ্রায়, ইতিহাসের অভিপ্রায়। নিছক রচনার মধ্যে লেখকের অনুসন্ধান নয়, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমস্ত দিকে তথ্যানুসন্ধানের সর্বাত্মক অভিযান। রচনার তথ্যগত কার্য-কারণের অনুসন্ধান। এরই নাম হয়েছে 'বৈজ্ঞানিক সমালোচনা'। একেও এখন রোমান্টিক বলা অর্থহীন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয় একটি ধারা প্রথম থেকেই একটু স্বতন্ত্র। সার্থকতা-নিরূপণ স্পষ্টতই বুদ্ধি-আশ্রিত প্রক্রিয়া। অভিপ্রায়-অনুসন্ধান, অনুসন্ধান ব'লেই সে-ও শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিরই ব্যাপার। তৃতীয় ধারা এই পথকেই পরিহার করেছে: শিল্পসার্থকতার প্রশ্নও তোলেনি, মূল লেখকের আত্মপ্রকাশ নিয়েও মাথা ঘামায়নি। যিনি বিশুদ্ধ রোমান্টিসিস্ট তিনি কেনই-বা জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়ার প্রশ্রয় দিতে যাবেন? এই দিক থেকে বলা যায় যে, এই তৃতীয় ধারাটিতেই রোমান্টিক প্রবণতা তার বিশুদ্ধতম পরিণামে এসে দাঁড়িয়েছে।

আত্মপ্রকাশ অবশ্য এ-ধারারও প্রধানতম তত্ত্ব। কিন্তু কার আত্মপ্রকাশ? মূল লেখকের? লেখকের অহং-এর সন্ধান সমালোচকের কাজ নয়। তবে কার আত্ম-প্রকাশ? সমালোচনাও যেহেতু সৃষ্টি এবং সমালোচকও যেহেতু স্রষ্টা, সেইহেতু সমালোচনা আর কারো আত্মপ্রকাশ নয় — স্বয়ং সমালোচকেরই আত্মপ্রকাশ। আপাতদৃষ্টিতে নিজের আস্বাদন-আনন্দের রূপায়ণ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে — ওই উপলক্ষে বিশুদ্ধ আত্মপ্রকাশ। সমালোচকের একটিই মাত্র দায়িত্ব, নিজের রচনাকে শিল্প ক'রে তোলা, নিজেকে প্রকাশ করা। সমালোচ্য বিষয়টা একটা উপলক্ষ মাত্র, তার বেশি নয়। তার একমাত্র কাজ সমালোচককে ধাক্কা দিয়ে উদ্‌বোধিত ক'রে তোলা— আর-কিছু নয়। সমস্ত সমালোচনারই বিষয়বস্তু এক — সমালোচকের অহং। (আনাতোল ফ্রাঁস যেমন বলেছেন, সমালোচকের উচিত প্রথমেই ঘোষণা ক'রে দেওয়া — ভদ্রমহোদয়গণ, এখন আমি নিজের সম্পর্কে কিছু বলবো, তার উপলক্ষটা শেক্সপীয়ার, কি তার উপলক্ষটা রাসীন!)

সাধারণত যাকে ইম্‌প্রেশনিস্ট সমালোচনা বলা হয়, চলতি কথায় যাকে অনেক সময় সৃজনাত্মক (ক্রিয়েটিভ) সমালোচনাও বলা হ'য়ে থাকে, তার তত্ত্বগত সমর্থন এইখানেই। বলা বাহুল্য এ-ধরনের সমালোচনা আপেক্ষিক, ব্যক্তিগত এবং সাবজেক্‌টিভ হ'তে বাধ্য। এই মত অনুযায়ী, সমালোচনা কখনোই নিরপেক্ষ, সর্বজনীন এবং অবজেক্‌টিভ হ'তে পারে না। তার কারণ সমালোচনার কোনো ধ্রুব আদর্শ নেই, কোনো সর্বজনগ্রাহ্য মানদণ্ড নেই। দেশভেদে কালভেদে পাত্রভেদে

রুচির মৌলিক ভেদ ঘটে। সুতরাং সমস্তই ব্যক্তিগত ভালো-লাগা মন্দ-লাগার ব্যাপার। এর কোনো 'কেন' নেই। অতএব সে-প্রসঙ্গের উত্থাপনই বিড়ম্বনা। শিল্পীর যা কাজ, সমালোচকেরও সেই কাজ— রস-সৃষ্টি, আত্মগত আবেগের প্রকাশ। ব্যক্তিগত রুচির জবানবন্দী পেশ করার ছলে আত্ম-উদ্‌ঘাটন এবং 'স্ব-মাধুরী'র আস্বাদন।

অনেক সময় অভিযোগ করা হয়, ইম্‌প্রেশনিস্ট সমালোচনায় লেখক আর পাঠকের মধ্যে ঘটকালি করতে এসে সমালোচক নিজেই বর সেজে বসেন। এ-অভিযোগ বৃথা। তার কারণ সমালোচনা যে ঘটকালি করা এ-কথাই এ-সমালোচকেরা মানেন না। আরো অভিযোগ করা হয় যে, ইম্‌প্রেশনিস্ট সমালোচনা নিতান্তই সমালোচকের আত্মজীবনীর অংশ-বিশেষ। কিন্তু এটা এঁদের মতে অভিযোগই নয়। প্রকৃত সমালোচনা আত্মজীবনী হ'তেই বাধ্য। (অস্কার ওয়াইল্ড যেমন বলেছেন, শিল্পসম্মত সমালোচনাই হ'লো 'the only civilized form of autobiography'!) আনন্দের সঙ্গে এঁরা মেনে নিতে প্রস্তুত যে, প্রকৃত সমালোচনা হ'লো 'মাষ্টারপীসে'র রাজ্যে পাঠকের বিমুগ্ধ আত্মার এ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কথাটিতে দুটি শর্ত আছে। প্রথমত, বাক্যটির জোর 'মাষ্টারপীসে'র উপর নয়, জোর আত্মার বিমুগ্ধতার উপর, এ্যাডভেঞ্চারের উপর। দ্বিতীয় শর্ত হ'লো উক্ত আত্মার নিজস্ব সৃষ্টি-ক্ষমতা। এই দ্বিতীয় শর্তটাই গুরুতর। কেননা, এই মত অনুসারে, সমালোচনার সার্থকতা তার বক্তব্যে নয়, যুক্তি বা বিচারশীলতায় নয়। সমালোচনার একমাত্র সার্থকতা তার প্রকাশ-নৈপুণ্যে। অর্থাৎ তার নিজস্ব সাহিত্য-গুণে। এই নিজস্ব সাহিত্য-গুণটাই এখানে বড়ো কথা। বলা যেতে পারে— একমাত্র কথা। এই গুণটি যদি থাকে, তাহ'লে আর-কিছু না-থাকলেও চলে। তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, এই মত অনুযায়ী সমালোচনায় রসগ্রাহিতাও গৌণ। এমন-কি অবান্তর। রস-সঞ্চারের ক্ষমতাটাই সব।

রস-সঞ্চার যদি ঘ'টে থাকে, তাহ'লে সে-রচনা যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাকে সমালোচনা নামক একটি বাড়তি অভিধা দিয়ে চিহ্নিত করবার যুক্তি কোথায়? তথাকথিত ইম্‌প্রেশনিস্ট সমালোচনা সু-সাহিত্য হ'তে পারে, কিন্তু তা আদৌ সমালোচনা কিনা সেইটেই প্রশ্ন। ভোক্তৃত্বের ভাব-ভূমিতেই তার জন্ম ঘটে। কিন্তু ভোক্তৃত্ব-ভূমিকার আসল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত।

অনুভূতির তীব্রতা ও গভীরতার কথা, আবেগের স্বতঃস্ফূর্ততার কথা রবীন্দ্রনাথও

বলেছেন। অন্যদিকে, সৃজনাত্মক সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের পারদর্শিতার কথাও সর্বজনবিদিত। কিন্তু তাহ'লেও সমালোচনার ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও মননশীলতার উপর তিনি অসামান্য গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সমালোচকের আত্মপ্রকাশকে তত্ত্বগতভাবে কখনোই সমর্থন জানাননি।

শিল্পদর্শনের ক্ষেত্রে যিনি রোমাণ্টিসিস্ট, সমালোচনাতত্ত্বে তিনি যদি বিচারপন্থী হন, তাহ'লে তত্ত্বগত অসঙ্গতির প্রশ্ন উঠতে পারে। পাশ্চাত্য রোমাণ্টিসিস্টদের বিরুদ্ধে — বিশেষ ক'রে যাঁরা চরমপন্থী অর্থাৎ পূর্ব-কথিত তৃতীয় পন্থার পথিক, তাঁদের বিরুদ্ধে এ হেন অভিযোগের অবকাশ নেই। তার কারণ, তাঁদের সাহিত্য-তত্ত্বে ও সমালোচনাতত্ত্বে পরিপূর্ণ সঙ্গতি সুপরিস্ফুট। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁরা যে-রকম অনায়াসে বলতে পারেন, "To know a work of literature is to know the soul of the man who created it, and who created it in order that his soul should be known", সমালোচনা সম্পর্কেও তাঁরা তেমনি অনায়াসেই বলেন, "The function of criticism is...primarily the function of literature itself, to provide a means of self-expression for the critic...." (দুটি উক্তিই মিড্‌ল্টন মারীর। এতোখানি ধ্বনি-প্রতিধ্বনিবৎ মিল অবশ্য সচরাচর সুলভ নয়। কিন্তু সরাসরি বৈপরীত্য নিশ্চয়ই অযৌক্তিক।)

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই সঙ্গতি-অসঙ্গতির প্রশ্নটাই আপাতত সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাতত্ত্ব কি সত্যিই বিচারপন্থী সমালোচনাতত্ত্ব? দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন কি সত্যিই পুরোপুরি রোমাণ্টিক শিল্পদর্শন?

৪.

রবীন্দ্রনাথ নিজে যে-সব সমালোচনা লিখেছেন, সেগুলো কোন্ জাতের রচনা? আমাদের আলোচনার পক্ষে ঈষৎ অপ্রয়োজনীয় হ'লেও এ-প্রশ্ন মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক। সেগুলি কি সবই রোমাণ্টিক বা ইম্‌প্রেশনিস্ট জাতের রচনা? স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন কোনো-রকমের মূল্যায়নের চেষ্টাই কি সেখানে দেখতে পাওয়া যায় না? তাদের বিষয়বস্তু কি সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের অহং? প্রকাশের সৌন্দর্য ছাড়া আর কোনো মূল্যই কি তাদের নেই?

এমন সিদ্ধান্তের পক্ষে তথ্যগত সমর্থন নেই। কেউ হয়তো এখানে 'প্রাচীন সাহিত্যে'র "মেঘদূত" প্রবন্ধটির কথা তুলতে পারেন, অথবা প্রথম যৌবনের কোনো 'অচলিত' প্রবন্ধের উল্লেখ করতে পারেন। এ-সব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের আত্মগত

আবেগ প্রবল হ'য়ে উঠে বিষয়বস্তুকে অনেকটা আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যকে সমগ্রভাবে দেখলে সহজেই বোঝা যাবে যে ও-রকম এক-আধটা প্রবন্ধের সাক্ষ্য সিদ্ধান্তে পৌছুবার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। উল্টো দিকেই প্রমাণ অনেক বেশি ভারী।

অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার স্বকীয়তা ও সৌন্দর্য আমাদের এমন মুগ্ধ ক'রে ফেলে যে তারই কারণে মূল বিষয়ের ক্ষণিক বিস্মরণ ঘ'টে যায়। কিন্তু সমালোচকের অহং কখনো আমাদের সামনে এসে দৃষ্টিরোধ ক'রে দাঁড়ায় না। কোনোখানেই এ-কথা মনে হয় না যে রস-সৃষ্টির ব্যাকুলতায় সমালোচকের রসগ্রাহিতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। রচনার কাব্যধর্মী বাতাবরণ ভেদ ক'রে ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রায় সব সময়ই একটি প্রখর যুক্তিনিষ্ঠ মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দেখা যায় সর্বত্রই বিচার-বুদ্ধি ও মননশীলতা ক্রিয়াশীল, সর্বত্রই সুনির্দিষ্ট ও সুস্থির মূল্যবোধ বর্তমান।

রবীন্দ্রনাথের নিজের সমালোচনা থেকে অবশ্য আমাদের প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হবে না। তার কারণ আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্য নয়, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাতত্ত্ব। কার্যক্ষেত্রে তিনি কী করেছেন তার থেকে তত্ত্বক্ষেত্রে তিনি কী বলেছেন সেটাই এখানে বড়ো কথা।

সমালোচনা যে সমালোচকের আত্মপ্রকাশেরই সুযোগমাত্র, ঠিক এমন কথা রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত কোথাও বলেননি। কিন্তু, তা না-বললেও, এমন একাধিক উক্তি তিনি করেছেন, যার নিহিতার্থ এই ধরনের মতকে সমর্থন করে ব'লে সন্দেহ করা যেতে পারে। সত্যিই করে কি না, আপাতত সেইটেই আমাদের প্রধান বিবেচ্য।

'প্রাচীন সাহিত্য'-এর "রামায়ণ" প্রবন্ধে (র।১৩।৬৬২।৬) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সমালোচনা হ'লো "পূজার আবেগ মিশ্রিত ব্যাখ্যা"। আরো বলেছেন, "যথার্থ সমালোচনা পূজা — সমালোচক পূজারি পুরোহিত"। এ-প্রবন্ধে বিষয়-ব্যাখ্যার কথাও আছে বটে, কিন্তু আসল জোর ব্যক্তিগত আবেগ-প্রকাশের উপর। বিচার বা যাচাই করা সম্পর্কে এখানে তিনি রীতিমতো অসহিষ্ণুতাই প্রকাশ করেছেন।

'পূজার আবেগ' জন্মাবার পূর্বে বা সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন কোনো-না-কোনো-রকম মূল্যায়ন অপরিহার্য কিনা সে-প্রশ্নও অবশ্য তোলা যায়। কিন্তু আরো গোড়ার একটা কথা এখানে লক্ষ করবার আছে। এ-প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ ব'লে নিয়েছেন যে রামায়ণ-মহাভারতকে তিনি কেবল সাহিত্য হিসাবেই দেখছেন না।

দেখছেন ইতিহাস হিসাবে, প্রাচীন ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে, ভারত-সংস্কৃতির প্রতীক হিসাবে — সুচিরকালের আশ্রয় ও দিগ্‌দর্শনী হিসাবে। এইভাবে দেখছেন ব'লেই এখানে তিনি সাহিত্যিক উৎকর্ষ-অপকর্ষের মানদণ্ড প্রয়োগে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এ-অবস্থায় "রামায়ণ" প্রবন্ধটিকে বিশুদ্ধ সাহিত্যসমালোচনা হিসাবে গ্রহণ করা সঙ্গত কি না তা বিবেচনা ক'রে দেখা দরকার। এ-কথা শুধু এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধেই নয়, 'প্রাচীন সাহিত্য' বইটির অনেক প্রবন্ধ সম্বন্ধেই এ-কথা অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। 'প্রাচীন সাহিত্য'-এর প্রায় সর্বত্রই 'পূজার আবেগ' বর্তমান। প্রবন্ধগুলির রচনাকাল এবং তৎকালীন অন্যান্য রচনার কথা স্মরণ করলেই এর তাৎপর্য স্পষ্ট বোঝা যাবে।[৬]

রবীন্দ্রনাথ যেখানে কোনো শিল্প বা সাহিত্য-কীর্তির উপলক্ষে বিশুদ্ধ আত্মগত আবেগপ্রকাশের তাগিদ অনুভব করেছেন, সাধারণত সেখানে তিনি সরাসরি কবিতাই রচনা করেছেন। 'মানসী'র "মেঘদূত", 'চৈতালি'র "ঋতুসংহার", "কুমারসম্ভবগান" কি 'কল্পনা'র "চৌর-পঞ্চাশিকা" — এ-সব কি সাহিত্যসমালোচনা? বাইরের চেহারাটা গদ্য প্রবন্ধের হ'লেও 'প্রাচীন সাহিত্য'-এর "মেঘদূত" খানিকটা এই একই জাতের রচনা। অনেকটা 'লিপিকা'র "মেঘদূত" যেমন।

জগৎ ও জীবন যেমন সাহিত্যের বিষয়বস্তু হ'তে পারে, শিল্পকীর্তি বা সাহিত্য-কীর্তিও তেমনি সাহিত্যের বিষয় বা 'বিভাব' হ'তে পারে। সেইরকম কোনো রচনাকে সমালোচনা বলার অর্থ হয় না। তাহ'লে তো চ্যাপম্যানের হোমার-অনুবাদের উপর কীট্‌সের কবিতাটিকেও সাহিত্যসমালোচনা বলতে হয়, 'বলাকা'র "শা-জাহান" ('এ কথা জানিতে তুমি') কবিতাটিকেও স্থাপত্যশিল্পের সমালোচনা বলা চলে। কেউ যদি সে-রকম বলতে চান, বলতে পারেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনও সে-রকম বলেননি। এবং আবেগাত্মক রচনায় কখনো কখনো সমালোচনা কথাটিকে ঈষৎ বিস্তৃত ও অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করলেও সমালোচনাতত্ত্ব সম্পর্কিত কোনো আলোচনায় কখনো তা করেননি।

সমালোচকের আত্মপ্রকাশ বা ব্যক্তিগত আবেগ-প্রমাণের কথা বাদ দিলেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, সমালোচকের আত্মপ্রকাশের কথা না-হয় না-ই বললেন, কিন্তু সমালোচনা জিনিসটার যে কোনো ধ্রুব আদর্শ বা স্থির মাপকাঠি নেই, দেশকালপাত্র-ভেদে ওর আদর্শের যে বদল হয়, জিনিসটা যে নিতান্তই আপেক্ষিক, এমন কথা তো তিনি বলেছেন। সমালোচনায় ব্যক্তিগত ভালো-লাগা মন্দ-লাগাই যে চরম কথা, সমালোচনার একমাত্র সার্থকতাই যে তার নিজস্ব

প্রকাশনৈপুণ্যে, এমন উক্তিও তো তাঁর খুব বিরল নয়। এ-সব কথার ব্যাখ্যা কী? সমালোচনাকে যিনি বিচার ব'লে মনে করেন, তিনি এ-রকম কথা বলবেন?

এ-প্রশ্ন অসঙ্গত নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন ("সাহিত্য-বিচার", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৩৩৭):

"সাহিত্যে ভালো লাগা মন্দ লাগা হল শেষ কথা। বিজ্ঞানে সত্যমিথ্যার বিচারই শেষ বিচার। এই কারণে বিচারকের ব্যক্তিগত সংস্কারের উপরে বৈজ্ঞানিকের চরম আপীল আছে প্রমাণে। কিন্তু ভালো মন্দ লাগাটা রুচি নিয়ে, এর উপরে আর কোনো আপীল অযোগ্যতম লোকও অস্বীকার করতে পারে।"

অন্যত্র ("সাহিত্য-বিচার", 'সাহিত্যের স্বরূপ', র।১৪।৫২৯) বলছেন:

"সূক্ষ্মদৃষ্টি জিনিসটা যে রস আহরণ করে সেটা সকল সময় সার্বজনিক হয় না। সাহিত্যের এটাই হল অপরিহার্য দৈন্য। তাকে পুরস্কারের জন্য নির্ভর করতে হয় ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপরে।...এস্থলে আমাদের প্রধান নির্ভরের বিষয় বহুসংখ্যক শিক্ষিত রুচির অনুমোদনে। কিন্তু কে না জানে যে, শিক্ষিত লোকের রুচির পরিধি তৎকালীন বেষ্টনীর দ্বারা সীমাবদ্ধ, সময়ান্তরে তার দশান্তর ঘটে।"

এই প্রবন্ধেই তিনি আরো বলেছেন:

"সাহিত্যবিচারমূলক গ্রন্থ পড়বার সময় প্রায়ই কমবেশি পরিমাণে যে জিনিসটি চোখে পড়ে সে হচ্ছে বিচারকের বিশেষ সংস্কার; এই সংস্কারের প্রবর্তনা ঘটে তাঁর দলের সংস্রবে, তাঁর শ্রেণীর টানে, তাঁর শিক্ষার বিশেষত্ব নিয়ে।...বলা বাহুল্য, এ সংস্কার জিনিসটা সর্বকালের আদর্শের নির্বিশেষ অনুবর্তী নয়।... বর্তমানকালে বিত্তাল্পতার মমত্ব বা অহংকার সর্বজনীন আদর্শের ভান ক'রে দণ্ডনীতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করছে।...মোটের উপর নিরাপদ হচ্ছে ভান না করা, সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা। সেরকম সাহিত্য মনের একান্ত সত্যতা নিয়ে চরম মূল্য পায় না। তার মূল্য তার সাহিত্যরসেই।" (র।১৪।৫২৯-৩০)

এইসব উক্তি থেকে এমন মনে হওয়া আশ্চর্য নয় যে, রবীন্দ্রনাথ সত্যিই প্রকৃত মূল্যায়নে বিশ্বাসী নন, সত্যিই তিনি চরম আপেক্ষিকতাবাদী। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের সাবধানী পাঠকের পক্ষে এ-রকম মনে করায় বাধা আছে। উক্তিগুলিকে প্রসঙ্গ-বিচ্যুত অবস্থায় দেখলেই মাত্র এমন মনে হ'তে পারে। উক্তিগুলির প্রসঙ্গ এবং যেখান থেকে এগুলি আহরিত হয়েছে সেইসব প্রবন্ধের রচনার উপলক্ষ এ-ক্ষেত্রে স্মরণ করা দরকার। নতুবা ভুল বুঝবার বিশেষ আশঙ্কা আছে।

স্মরণ রাখা দরকার যে, সারা জীবন ধ'রে রবীন্দ্রনাথকে বারবার অরসিকের সামনে

রস নিবেদন করতে হয়েছে এবং বারবার ব্যক্তিগত বা দলগত সংস্কারের আঘাত, সাময়িক ফ্যাশানগত বা রাজনৈতিক মতবাদগত সংস্কারের আঘাত সহ্য করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচার সংক্রান্ত অনেক প্রবন্ধই আত্মম্ভরী সমালোচকের 'জজিয়তি'র প্রতিবাদ হিসাবে, অরসিক সমালোচকের অন্ধ আক্রমণের প্রত্যুত্তর হিসাবে রচিত। এই সত্যটি ভুলে গেলে কিছুতেই বুঝতে পারা যাবে না, কেন স্থানবিশেষে তাঁর এক-আধটা কথার উপর হঠাৎ এমন অতিরিক্ত ঝোঁক পড়েছে, কেন তাঁর এক-একটা উক্তি তাঁরই অন্য সময়ের উক্তির বিপরীতের মতন শোনাচ্ছে। বোঝা যাবে না, তার কোন্ কথার কোন্ অংশটা সত্য আর কোন্ অংশটা নিতান্তই তৎকালিক প্রতিক্রিয়া।

এখানে আর-একটা কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন ব'লে মনে করি। আপন সৃষ্টি সম্পর্কে তত্ত্বগতভাবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে-রকম আশ্চর্য এক ঋষিসুলভ অনাসক্তি দেখতে পাওয়া যায়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে ঠিক সেইরকমই একটা শিল্পীসুলভ আশ্চর্য স্পর্শকাতরতাও অনেক সময় নজরে পড়ে। সমালোচনা সম্পর্কে তাঁর অনেক উক্তিই যে অযোগ্য সমালোচকের প্রতিকূল সমালোচনায় ব্যথিত এক স্পর্শকাতর কবির উক্তি এ-কথা ভুলে গেলে তাঁর অনেক কথারই সঠিক তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারবো না।

রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ ক'রে বলেছেন ("সাহিত্য-বিচার", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৩৩৭-৮):

"জগতে সকলের চেয়ে অরক্ষিত অসহায় জীব হল সাহিত্য-রচয়িতা।...রুচির মার যখন খাই তখন চুপ করে সহ্য করাই ভালো, কেননা সাহিত্য-রচয়িতার ভাগ্য-চক্রের মধ্যেই রুচির কুগ্রহ-সুগ্রহের চিরনির্দিষ্ট স্থান।"

কথার সুর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, এইধরনের অস্থির-মতি সুগ্রহ-কুগ্রহকে তিনি 'রুচির মার' ব'লেই মনে করেন, প্রকৃত সমালোচনা ব'লে মনে করেন না। সমালোচক যেখানে নিজের ব্যক্তিগত রুচিকেই সর্বজনীন মানদণ্ড ব'লে দাবি করেন এবং ব্যক্তিগত রুচির অহঙ্কারে দণ্ডদাতার ভূমিকা গ্রহণ ক'রে বসেন, রবীন্দ্রনাথের আপত্তিটা সেইখানে। রবীন্দ্রনাথের আসল আপত্তি বিচারকের বিত্তাল্পতায়, বিশেষ সংস্কারের প্রতি অন্ধ মমত্বে, অহঙ্কারে।

"বাস্তব" প্রবন্ধটির ('সাহিত্যের পথে', র।১৪।২৯৬) এক জায়গায় তিনি বলেছেন:

"রস জিনিসটা রসিকের অপেক্ষা রাখে।...সমালোচক বুক ফুলিয়ে তাল ঠুকে

বলেন, আমিই সেই রসিক। প্রতিবাদ করতে সাহস হয় না, কিন্তু অরসিক আপনাকে অরসিক বলে জেনেছে সংসারে এই অভিজ্ঞতাটা দেখা যায় না। আমার কোন্‌টা ভালো লাগল এবং কোন্‌টা ভালো লাগল না সেইটেই যে রসপরীক্ষার চূড়ান্ত মীমাংসা, পনেরো আনা লোক সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়।...মূলধন না থাকলেও দালালীর কাজে নামতে কারো বাধে না, তেমনি সাহিত্যসমালোচনায় কোনো প্রকার পুঁজির জন্য কেউ সবুর করে না।"

এই উদ্ধৃতি থেকে কতকগুলি কথা বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। প্রথমত প্রচলিত সাহিত্যসমালোচনাকে রবীন্দ্রনাথ বিত্ত-বিহীনদের ফোপরদালালী জাতীয় ব্যাপার ব'লে মনে করেন। দ্বিতীয়ত, প্রকৃত সমালোচনায় মূলধন প্রয়োজন। এবং মূলধন যখন, তখন তা অবশ্যই চূড়ান্তরকমের আপেক্ষিক বা একান্তভাবে ব্যক্তিগত নয়। তৃতীয়ত, সমালোচনা হ'লো রসপরীক্ষা। এবং পরীক্ষা যখন, তখন তার মধ্যে বিচারবুদ্ধির স্থান মোটেই নগণ্য নয়। আরো দেখা যাচ্ছে যে "আমার কোন্‌টা ভালো লাগল এবং কোন্‌টা ভালো লাগল না সেইটেই যে রসপরীক্ষার চূড়ান্ত মীমাংসা, পনেরো আনা লোক সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়" হ'লেও, রবীন্দ্রনাথ নিজেও সে-সম্বন্ধে নিঃসংশয় নন। বরং বলা যায়, এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত পনেরো আনা লোকের মতের বিপরীত। ব্যক্তিগত ভালো-লাগা মন্দ-লাগাতেই রসপরীক্ষার চূড়ান্ত মীমাংসা এ-কথা তিনি মনে করেন না। ব্যক্তিগত বা দলগত রুচির উর্ধ্বে আরো একটা নিশ্চিততর বিচার যে সম্ভব, এ-কথা তিনি অস্বীকার করেন না।

"সাহিত্যের বিচারক" ('সাহিত্য', র।১৩।৭৪৮) প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, প্রকৃত বিচারক তাঁরাই যাঁরা নিত্যকালের প্রতিনিধিত্ব করবার যোগ্যতা রাখেন। বলেছেন, "যাহা ক্ষণিক, যাহা সংকীর্ণ তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না ; যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন।"

রবীন্দ্রনাথ যে-মূলধনের কথা উল্লেখ করেছেন, সেই মূলধন কী বস্তু ? রসগ্রাহিতা ? তা হয়তো বলা যায়। কিন্তু শুধু রসগ্রাহিতাই নয়, সেই সঙ্গে আরো-কিছু। তাছাড়া, কোন্ অরসিক নিজেকে রসগ্রাহী ব'লে না-জানে ? তা হ'লে রসিক কে ? যিনি রস চেনেন ? এতে একটা মুশকিল আছে। রস-কে চিনে নেবার ক্ষমতা দিয়ে কে রসিক তার হদিস পাবো, আবার কোন্‌টা রস তার সন্ধান নিতে রসিকেরই দ্বারস্থ হবো, এ হেন হেত্বাভাসের চক্রান্তে পড়া সুবুদ্ধির কাজ নয়।

রবীন্দ্রনাথ রসগ্রাহিতাব কথাও বলেছেন, কিন্তু বেশি জোর দিয়েছেন সাহিত্যজ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধির উপর। তাঁর মতো রস-সিদ্ধ কবির পক্ষে এটা একটু আশ্চর্য ব'লে

মনে হ'তে পারে। আসলে কিন্তু এর মধ্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ জানেন যে রসগ্রাহিতা জিনিসটা মোটেই প্রমাণগম্য নয়। ওটা একটা গূহ্য ব্যাপার। সাহিত্যজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি ঠিক তা নয়। সেইজন্য, বিচারকের যোগ্যতার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ বেশ স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন ("সাহিত্যের বিচারক", 'সাহিত্য') যে, এখানে স্বভাব ও শিক্ষা দুই-ই চাই। 'পরখ করিবার শক্তি'ও চাই, আবার 'সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয় লাভ' করাও চাই।

অন্যত্রও তিনি বিচারকের যোগ্যতার প্রসঙ্গ তুলেছেন। যোগ্য বিচারক যে নেই তা তিনি মনে করেন না। তবে, কে যে যোগ্য তা নির্ণয় করা সহজ নয়। তিনি বলেছেন ("সাহিত্যবিচার", 'সাহিত্যের স্বরূপ', র৷১৪৷৫৩০) "যাঁরা শ্রেণীগত বা দলগত বা বিশেষকালগত মমত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত নয়, তাঁদের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত।" বিচারক হবার যোগ্য তাঁরাই (যদি তাঁদের 'পরখ করিবার শক্তি' এবং 'সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয়' থাকে)।

এই প্রবন্ধে সমালোচকের যে-গুণটির উপর তিনি সব থেকে বেশি জোর দিয়েছেন তা হ'লো, 'বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতা'। পরিষ্কার ক'রে বলেছেন, 'ভাবালুতার বাষ্প-স্পর্শহীন' মনন।

৫.

'আপেক্ষিক' কথাটার মীমাংসা সহজ নয়। আদর্শ ও রুচির আপেক্ষিকতার কথা রবীন্দ্রনাথ একবার দু-বার বলেননি, বহুবার বলেছেন। ধ্রুবত্বের কথা যেমন জোর দিয়ে বলেছেন, আপেক্ষিকতার কথাও তেমনি সমান জোর দিয়েই বলেছেন। সেইজন্যেই খট্‌কা।

গোলমালটা আসলে ধ্রুবত্ব শব্দটাকে নিয়ে। অথবা বলা যায়, শব্দটার রাবীন্দ্রিক ব্যবহার নিয়ে। ধ্রুবত্ব মানে কি?

নিত্য, ধ্রুব, চিরন্তন, সর্বকালিক প্রভৃতি শব্দগুলিকে রবীন্দ্রনাথ সাধারণত একটু বিশিষ্ট অর্থেই ব্যবহার করেছেন। অধিকাংশ সময়ই কথাগুলিকে তিনি পরম বা absolute অর্থে ব্যবহার করেননি; ব্যবহার করেছেন মানবজীবন বা মানবসভ্যতার বিশিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে রেখে। শিল্প সাহিত্য সভ্যতা প্রভৃতি মানবিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলিকে (এমন-কি সত্য শিব সুন্দর সম্পর্কিত মন্তব্যগুলিকেও) সাধারণত তাই মানব-সাপেক্ষ ভাবেই দেখতে হবে। আর্টের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত নিত্যতা ধ্রুবত্ব প্রভৃতিও তাই। এদের ধ্রুবত্ব কালের পরিমাপে নয়, 'মূল্যে'র মহার্ঘতায়।

মনে রাখতে হবে, সমালোচনা বিজ্ঞান নয়, সাহিত্য। সমালোচনা হ'লো অনেকটা সেই জিনিস। মননের ক্ষেত্রে যতোটা অবিচলতা সম্ভব বা প্রত্যাশিত, এর অবিচলতা ততোটুকুই। তার বেশি নয়, তার কমও নয়। বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকতা এখানে সম্ভব নয়, প্রত্যাশিতও নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এর স্থান ব্যক্তিগত বা দলগত সংস্কারের উর্ধ্বে। অন্তত তাই হওয়া উচিত। এবং তা হওয়ার কোনো তত্ত্বগত বাধাও নেই।

নির্ভুল এবং অনড়, এ-অর্থে অবিচল নয়। সংস্কারের স্রোতে গা ভাসায় না, এই অর্থে অবিচল। ভুলের অবকাশ বিজ্ঞানেও আছে। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের আদর্শ অবিচল সত্যের আদর্শ। স্তূপীকৃত ভুলের মৃতদেহের মধ্যে দিয়েই মানুষের সত্য-সন্ধান এগিয়ে চলে। আদর্শকে অবিচল জানি ব'লেই তো ভুলকে ভুল ব'লে পরিত্যাগ করার সাহস করতে পারি। চূড়ান্ত আপেক্ষিকতার মতবাদ চূড়ান্ত সন্দেহবাদের জনক, সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার হন্তারক, শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী। এবং মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

পরম বা চূড়ান্ত ধ্রুবত্বও মানুষের জ্ঞানের অতীত, বোধের অতীত, আয়ত্তের অতীত। মানুষের বোধের মধ্যে কোনো সত্য বা কোনো ভ্যালুই ষোলো আনা আপেক্ষিক নয়, ষোলো আনা ধ্রুব নয়।[৭]

রবীন্দ্রনাথ যে-আদর্শের কথা বলেছেন তা কালাতীত নয়, আবার কালের ক্রীতদাসও নয়। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ দম্ভ পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন, কিন্তু বিচার বাতিল করার কথা বলেননি। (কালাতীত যদি না-হয়, তাহ'লে, ইতিহাসের অতীত — এমন মনে করবারই বা আবশ্যকতা কোথায়? ইতিহাস-নির্ভর ব'লে মেনে নিলেই যে চূড়ান্ত আপেক্ষিকতাকে বরণ ক'রে নেওয়া হয় তা তো নয়। ইতিহাসের মধ্যেই তো আমরা আপেক্ষিকতা ও ধ্রুবত্বের টানা-পোড়নের লীলা দেখতে পাই।)

মানদণ্ডের কথায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ("বাস্তব", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।২৯৬) "রস-বিচারে ব্যক্তিগত এবং কালগত ভুল সংশোধন করে' নেবার জন্য বহু ব্যক্তি ও দীর্ঘ সময়ের ভিতর দিয়ে বিচার্য পদার্থটিকে বয়ে নিয়ে গেলে তবে সন্দেহ মেটে।"[৮]

'তবে সন্দেহ মেটে' — কথাটা লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ সন্দেহ থেকেই শুরু করেছেন। কিন্তু মনোভাবটা তাঁর নেতিধর্মী নয়। এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, সন্দেহ জিনিসটা যেমন মাত্রার ব্যাপার, তার যেমন কম বেশি আছে, সন্দেহ নিরসনটাও তেমনি মাত্রার ব্যাপার, তারও কম বেশি আছে। সন্দেহ এবং নিশ্চিতি কোনোটাই অনড় অবস্থা নয়। ক্রম-বর্ধমান নিশ্চিতিই একটা ধাপে পৌঁছে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে

ধ্রুবত্ব ব'লে গণ্য হয়। অন্তত আর্ট প্রসঙ্গে ধ্রুবত্বের সেইরকম অর্থই রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত অর্থ ব'লে মনে হয়।

"বিশ্বসাহিত্য" ('সাহিত্য', র৲১৩।৭৭০-১) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"মহকাল বসিয়া আছেন। তিনি তো সমস্তই ছাঁকিয়া লইবেন। তাঁহার চালুনির মধ্য দিয়া যাহা ছোটো যাহা জীর্ণ, তাহা গলিয়া ধুলায় পড়িয়া ধুলা হইয়া যায়। ...এমনি করিয়া বাছাই হইয়া যাহা থাকিয়া যায় তাহা মানুষের সর্বদেশের সর্বকালের ধন। এমনি করিয়া ভাঙিয়া গড়িয়া সাহিত্যের মধ্যে মানুষের প্রকৃতির, মানুষের প্রকাশের একটি নিত্যকালীন আদর্শ আপনি সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। সেই আদর্শই নূতন যুগের সাহিত্যেরও হাল ধরিয়া থাকে। সেই আদর্শমতই যদি আমরা সাহিত্যের বিচার করি তবে সমগ্র মানবের বিচারবুদ্ধির সাহায্য লওয়া হয়।"

রবীন্দ্রনাথ এখানে সাহিত্যিককে শুধু নিরবধি কাল আর বিপুলা পৃথ্বীর আশ্বাসই দিচ্ছেন না, সমালোচককে তিনি মহাকালের বিচারের অভিজ্ঞতা থেকে আদর্শ সংগ্রহ করতেও বলছেন — 'সমগ্র মানবের বিচারবুদ্ধির সাহায্য' নেওয়ার কথাও বলছেন।[৯]

একটা কথা এখানে লক্ষ করা দরকার। অতীতের সাহিত্য দিয়ে বর্তমানের সাহিত্যকে বিচার করা সব সময় খুব নিরাপদ নয়। অতীত যাদের মূল্য দিয়েছে কেবল তাদেরই মূল্যবান্ ব'লে গ্রহণ করলে প্রকারান্তরে অতীতের মূল্যমানকেই স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়। ক্লাসিকপন্থীদের বিচার এই একই বস্তু। রবীন্দ্রনাথ কি তাই করতে বলছেন?

অতীতের থেকে শিক্ষা আর অতীতের উপর আস্থা এক জিনিস নয়। অতীতের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভর মানুষকে সহজেই গোঁড়া রক্ষণশীল ক'রে তুলতে পারে। মানব-ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতিতে বিশ্বাস করলে, মানুষের সৃজনী-প্রতিভার অফুরন্ত সম্ভাবনায় আস্থা রাখলে, সাহিত্যের ইতিহাসকে অন্তহীন অভিনবত্ব-পরম্পরার ইতিহাস ব'লে গণ্য করলে, অতীতের সাহিত্য থেকে সংগৃহীত কোনো অনড় সাহিত্য-আদর্শের উপরেই চূড়ান্ত আস্থা রাখা যায় না। ক্লাসিসিস্ট আচার্যদের হাতে এইরকম 'চিরন্তন' আদর্শের যে কী পরিমাণ অপপ্রয়োগ ঘটেছে তা নিশ্চয়ই কারো অজানা নেই। অন্তত রবীন্দ্রনাথের তা কিছুমাত্র অজানা ছিলো না।

রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের কোনো অনড় সাহিত্য-আদর্শে বিশ্বাসী নন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন ("সাহিত্যবিচার", 'সাহিত্যের স্বরূপ', র।১৪।৫২৯) যে, "সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি একটা সজীব পদার্থ।"

যে-কারণেই হোক, অতীত থেকে সংগৃহীত সাহিত্য-আদর্শের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সম্পূর্ণ নীরব। ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রশ্নে তিনি অন্যতর আদর্শ ও অন্যতর মানদণ্ডের কথাই বেশি ক'রে বলেছেন। সেই মানদণ্ড হ'লো জীবনের মানদণ্ড। তিনি সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীন ভাষাতেই বলেছেন যে, সব সময় দেখতে হবে সাহিত্য 'জীবনের স্বাক্ষর' পেলো কি না। দেখতে হবে সাহিত্যে 'জীবনের পরিমাণ' ঠিক মতো রক্ষিত হ'লো কি না।

জীবন-সত্যের আদর্শ 'একটা সজীব পদার্থ'ই বটে। প্রাণের ধর্মই যেহেতু গতি ও পরিবর্তন, সেইহেতু শ্রদ্ধেয় স্থবিরত্ব নয়, বরং সতত পরিবর্তনশীলতাই এ-আদর্শের স্বধর্ম। অন্যদিকে, সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে দিয়ে প্রাণের যে গূঢ় ঐক্য সতত রক্ষিত, সজীব সাহিত্য-আদর্শের মধ্যেও সেইরকম অন্তর্গূঢ় অভিন্নতার ঐক্যসূত্র থাকবে — এ-ও স্বাভাবিক। এবং এই অর্থে জীবন-সত্যের আদর্শও নিত্যকালেরই আদর্শ। এ-আদর্শের প্রয়োগেও বিচার-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও সংবেদনশীলতার শুভ-সংযোগ অত্যাবশ্যক।

স্মরণ রাখতে হবে যে, জীবনকে আমরা শুধু নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই চিনি না, অপরের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েও চিনি। সর্বমানবের অভিজ্ঞতার সারাৎসার দিয়েই আমার অভিজ্ঞতা নিয়ন্ত্রিত হয়। জীবনকে আমরা অতীতের ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে চিনি; অতীতের সাহিত্যের মধ্যে দিয়েও চিনি। এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, জীবনকে চেনার ব্যাপারে অতীতের সাহিত্য আমাদের মস্ত বড়ো সহায় (যদিও একমাত্র নয়)। সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে জীবনের মাপকাঠি প্রয়োগ করবার সময় অতীতের সাহিত্যকীর্তির সাহায্যকে ইচ্ছা করলেও আমরা সম্পূর্ণ পরিহার ক'রে চলতে পারি না। তাছাড়া সাহিত্যও যখন জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে, তখন অতীত সাহিত্যের সাহায্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা এক ধরনের অন্ধতারই নামান্তর। মনে রাখতে হবে যে, সাহিত্যের ইতিহাস শুধু অভিনবত্বেরই ইতিহাস নয়, ঐক্যেরও ইতিহাস। সুতরাং অতীত সাহিত্যের সহায়তাকে অস্বীকার করলে মানবসভ্যতার ধারাবাহিকতাকেই অস্বীকার করা হয়। পরিণতি-পর্বের রোমান্টিসিস্ট সাহিত্য-আদর্শে প্রকারান্তরে এই অস্বীকৃতিই প্রবলভাবে ঘোষিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-আদর্শে এ হেন অন্ধ অস্বীকৃতি কখনোই সমর্থিত হয়নি। বরং 'সাহিত্যের নিত্যবস্তুর' সঙ্গে পরিচয়কে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিচারের অন্যতম প্রধান শর্ত ব'লেই গণ্য করেন।

অতীতের সাহিত্য-অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া আদর্শ, আর প্রত্যক্ষ জীবন থেকে

পাওয়া আদর্শ, এই দুই আদর্শকে মিলিয়ে নেওয়া অসম্ভব নয়। বোধ করি রবীন্দ্রনাথ তা-ই চেয়েছিলেন। এখানে প্রশ্ন হ'লো আপেক্ষিক গুরুত্বের। ক্লাসিক-পন্থীদের হাতে প্রত্যক্ষ জীবনের আদর্শ উত্তরোত্তর গৌণ হ'তে হ'তে শেষকালে তা একেবারে শূন্যের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে; এবং অতীতের সাহিত্যরীতিই শেষ পর্যন্ত সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্যের মর্যাদা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-আদর্শ এই পরিণামকে স্বীকার করেনি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-আদর্শে যে-ক্রম-বিবর্তন দেখতে পাই, তা বরং অনেকটা এর বিপরীত। সেখানে ক্রমেই প্রত্যক্ষ জীবনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মূল্যই উত্তরোত্তর অধিকতর স্বীকৃতি পেয়েছে।

প্রত্যক্ষ জীবনের কথা, জগতের কথা বা 'Nature'-এর কথা মুখে মুখে স্বীকার করলেও, ক্লাসিকপন্থীরা কার্যক্ষেত্রে এই স্বীকৃতির মর্যাদা রক্ষা ক'রে চলেননি। 'Methodized Nature'-এর সূত্র ধ'রে চলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁরা 'মেথড'কেই বড়ো দেখেছেন, 'নেচার'কে নয়। রোমান্টিক বিদ্রোহের অন্যতম কারণ এর মধ্যেই নিহিত। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মাহাত্ম্যকে চরম মূল্যে অঙ্গীকৃত ক'রে নেওয়া—রোমান্টিক বিদ্রোহের এটা ছিলো প্রধান একটা দাবি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোমান্টিকরাও জীবনের প্রতি এই বিশ্বস্ততাকে রক্ষা ক'রে চলতে পারেননি। কালক্রমে এক বিশেষ ধরনের আবেগ-রঞ্জিত অভিজ্ঞতার প্রতি পক্ষপাতের ফলে জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর সঙ্কোচন ঘটেছে। তাঁদের 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা' ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যে রুদ্ধদ্বার আত্মময়তার আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে।

বিদ্রোহের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিকদের সহযাত্রী। কিন্তু বিদ্রোহের এই পরিণামকে তিনি মেনে নেননি। তাঁর শিল্পতত্ত্বে আত্ম-সত্য কখনোই জগৎ-সত্যকে ঢেকে দাঁড়াতে পারেনি। বিশিষ্টতার মূল্য তিনি অস্বীকার করেননি, কিন্তু আত্মময়তার বিবরে ব'সে অহং-এর বিশ্বরূপ দর্শন তাঁকে তৃপ্তি দেয়নি। তিনি বিশেষকে রক্ষা করেছেন, কিন্তু সাধারণকে পরিত্যাগ করেননি। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা ও শিল্পচিন্তার ভারতীয়ত্ব। অথবা, বোধ করি এ-ও বলা যায় যে, এইখানেই এর আধুনিকত্ব।

৬.

সমালোচনায় ব্যক্তিগত রুচির প্রতি অনাস্থা, বিচারবুদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ, ধ্রুব আদর্শে বিশ্বাস (এবং এই বিশ্বাসের পশ্চাৎপটে অনতিপ্রচ্ছন্ন ঐতিহ্যনিষ্ঠা), এর

প্রত্যেকটিই অল্পবিস্তর রোমান্টিকতার বিরোধী। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-তত্ত্বকে কিছুতেই রোমান্টিসিস্ট সমালোচনাতত্ত্ব ব'লে অভিহিত করা যায় না। অথচ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব সংক্রান্ত অনেক কথাই রোমান্টিসিস্ট সাহিত্যশাস্ত্রীদের বচনসমূহের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব কি পুরোপুরি রোমান্টিসিস্ট সাহিত্যতত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন কি পুরোপুরিই রোমান্টিসিস্ট শিল্পদর্শন? তা যদি হয়, তাহ'লে স্বভাবতই একটা স্ববিরোধিতার প্রশ্ন ওঠে।

শিল্প ও সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় এমন কতকগুলি বিশিষ্ট শব্দের উপর রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যে-শব্দগুলি সচরাচর রোমান্টিসিস্ট শিল্পদর্শনের নিজস্ব সম্পত্তি ব'লেই বিবেচিত হয়। সাধারণত এইসব শব্দের সূত্র ধ'রেই আমরা রবীন্দ্র-শিল্পদর্শনের চরিত্র নির্ণয় ক'রে থাকি। উপায়টা দেখতে যতো নির্দোষ, কার্যত মোটেই তা নয়। রবীন্দ্রনাথের শব্দপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্যকে যথোচিত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ না-করলে বিচার-বিভ্রাট ঘটা কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ একই বিষয়ে নানা উপলক্ষে নানাভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর কোনো-কোনো উক্তির প্রসঙ্গগত বা তৎকালিক তাৎপর্য অনেক সময় সাধারণ অর্থকে ছাপিয়ে উঠেছে। এ-কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন ("রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত", 'কালান্তর', র।১৩।৩৬৯-৭০ দ্রষ্টব্য)। অনেক সময় তাঁর সেইসব প্রাসঙ্গিক উক্তিকে আমরা একেবারে পাকা দলিল হিসাবে গণ্য ক'রে বসি। এই অবিবেচনা থেকে এক ধরনের ভুল বোঝা খুব সহজেই ঘটতে পারে।

ভুল বোঝার আরো গুরুতর কারণও আছে। সময়-বিশেষে কোনো কোনো শব্দকে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত অর্থে যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি কখনো কখনো সে-সব শব্দকে তিনি অপ্রচলিত ব্যুৎপত্তিগত অর্থেও ব্যবহার করেছেন। আবার ক্ষেত্র-বিশেষে সেইসব শব্দকেই তিনি ঈষৎ বিশিষ্ট অর্থে — বলা যেতে পারে খানিকটা রাবীন্দ্রিক অর্থে — ব্যবহার করেছেন। (এ আর্য প্রয়োগ অবশ্যই আমাদের মেনে নিতে হবে।) কখন কোন্ অর্থটা গ্রহণীয়, সজাগ থাকলে সেটা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়। কিন্তু অর্ধমনস্কভাবে পড়লে সহজেই বোঝার ভুল ঘটতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক নন, পেশাদার দার্শনিকও নন, তিনি কবি। বক্তব্য তাঁর যা-ই হোক্-না কেন, তাঁর ভাষা সব সময়ই কবির ভাষা। শব্দের নিক্তিমাপা নির্দিষ্টতা সব সময় তাঁর কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। তাঁর চিন্তা অগ্রসর হয় উপমা আর রূপকল্পের ('ইমেজ') পথ ধ'রে। তাঁর বাক্যার্থে অভিধা গৌণ, ব্যঞ্জনাই মুখ্য। গৌণ যা তাকে মুখ্যের মর্যাদা দিলে বিভ্রান্তি অনিবার্য।

স্রষ্টা, ব্যক্তিত্ব, আত্মপ্রকাশ, কল্পনা, ভাব, অনুভূতি, প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। মাত্র উদাহরণ হিসাবেই নয়, আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষেও শব্দগুলির প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য তাৎপর্যপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে শিল্পদর্শনে এই শব্দগুলির ব্যবহার সুপ্রচুর। রোমান্টিসিস্ট শিল্পদর্শনেও তাই। উভয় শিল্পদর্শনেই এ-শব্দগুলির উপর প্রচুর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অথচ উভয় ক্ষেত্রে এদের অর্থ হুবহু এক নয়, অন্তত এদের ভাবানুষঙ্গে প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন না-থাকলে রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনকে পুরোপুরি রোমান্টিসিস্ট শিল্পদর্শন ব'লে ভুল করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

রাবীন্দ্রিক প্রয়োগের বিশেষত্ব বুঝতে হ'লে ঐকসূত্রবদ্ধ রবীন্দ্র-শিল্পদর্শনের সঙ্গে এই কথাগুলির যোগ কোথায় তা তলিয়ে দেখতে হবে। অর্থাৎ বিচ্ছিন্নভাবে না-দেখে, রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনের পটভূমিতে রেখে সমগ্রের আলোয় এদের দেখা দরকার।

৭

মানুষের ব্যক্তিত্বের যে-দিকটা প্রয়োজনের ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেটা হ'লো তার অহং-এর দিক, অপূর্ণতার দিক। জীবনযুদ্ধের তাগিদে যেখানে মানুষ বিশ্বজগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখে, সেইখানেই মানুষ নিজেকে খণ্ডিত ও খর্ব ক'রে রাখে। সেখানে নয়, জীবনলীলার প্রেরণায় যেখানে বিশ্বজগতের সঙ্গে মানুষের আনন্দের যোগ সেইখানেই মানুষের আসল পরিচয়। মানুষের মধ্যেকার সেই সত্তাই নিত্যকালের মানবসত্তা — প্রত্যেক মানুষের মধ্যেকার বিশ্বমানবসত্তা। মানুষের এই সত্তাই সৃষ্টি করে। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা যে-মানুষ, সে ব্যক্তিবিশেষ নয়, সে হ'লো মানুষের মধ্যেকার চিরন্তন মানব। সেইজন্য আর্টে যে-জগৎটাকে পাই, তা কারো আপন মর্জির জগৎ নয়। কোনো ব্যক্তিবিশেষ শুধু নিজের আত্মগত কল্পনা দিয়েই সে-জগৎকে গ'ড়ে তোলে না। আর্টের জগৎ প্রাইভেট জগৎ নয়, সে-জগৎ 'সাধারণীকৃত' জগৎ।

আর্টের জগৎ মানব-উপলব্ধির জগৎ। সেখানে বহির্বিশ্ব ও মানব-হৃদয় সম্পূর্ণ একীভূত — হৃদয় যেমন জগতে সমর্পিত, জগৎও তেমনি হৃদয়ে গৃহীত। তাই আর্ট একই সঙ্গে জগৎ-সত্যের প্রকাশ এবং মানব-সত্যের প্রকাশ এবং এই প্রকাশেই সৃষ্টিকর্তা-মানুষের আত্মসত্যেরও প্রকাশ। স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ মানে তাঁর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ নয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ অর্থ বিশ্বমানব-

মনের আত্মপ্রকাশ। তারই নাম 'মানব-প্রকাশ'। এই প্রকাশের মধ্যেই স্রষ্টার প্রকৃত আত্ম-উপলব্ধি। বিশ্বের সঙ্গে নিবিড় যোগের মধ্য দিয়েই এই আত্ম-উপলব্ধি সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ("সাহিত্যতত্ত্ব", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৩৫), "আমি আছি এবং না-আমি আছে এই দুই নিরন্তর ধারা আমার মধ্যে ক্রমাগতই একীভূত হয়ে আমাকে সৃষ্টি করে চলেছে।" এই একীভূত হবার সংবেদনই আর্টের প্রেরণা, এই আনন্দই আর্টের আনন্দ। এ-আনন্দ যুগপৎ আত্মলাভ ও বিশ্বলাভের আনন্দ।

স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ বিশ্বসত্যের প্রকাশের মধ্যে দিয়েই সার্থক হয়। 'আত্মপ্রকাশ কথাটির এইটেই রবীন্দ্র-দর্শনসম্মত অর্থ। ক্ষেত্র-বিশেষে রবীন্দ্রনাথ এ-কথাটিকে অন্য অর্থেও ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু এই অর্থের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের শিল্প-ভাবনার যোগ নিবিড়তর।

পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বে যতোরকমের প্রকাশবাদ আছে, তার কোনোটির সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশতত্ত্বের মিল নেই।

রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ কথাটি ইংরেজী 'একস্‌প্রেশন' কথাটির অনুবাদ নয়। এর ভাবানুষঙ্গ বিশেষভাবে ভারতীয়।

পাশ্চাত্য প্রয়োগে আত্মপ্রকাশ মানে অনেকটা যেন আত্মপ্রদর্শন। টিউব টিপলে যেমন ক'রে পেস্ট বেরিয়ে আসে, এক্‌স্‌প্রেশন কথাটার মধ্যে সেইরকম একটা নির্গমনের ভাব আছে। ভারতীয় অর্থে আত্মপ্রকাশ হ'লো আত্মপরিচয় এবং আত্মসার্থকতা লাভ, নিজেকে অর্জন করা। ইংরেজিতে বললে বলতে হয়, self-realisation। সুতরাং আত্মপ্রকাশ কথাটির সূত্র ধ'রে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বকে শিল্পদর্শনকে রোমাণ্টিসিস্ট ব'লে আখ্যা দিতে চান, বুঝতে হবে কথাটির যথার্থ তাৎপর্য তাঁরা অনুধাবন ক'রে দেখেননি।[১০]

'কল্পনা' কথাটির সম্পর্কেও এই একই ধরনের মন্তব্য প্রযোজ্য। উত্তরকালের ক্লাসিকপন্থী শিল্পদর্শনে আর্টের ক্ষেত্রে কল্পনাশক্তির যে অমর্যাদা ছিলো, তারই প্রতিক্রিয়ায় রোমাণ্টিসিস্ট শিল্পদর্শনে কল্পনার পূর্ণ একাধিপত্য ঘোষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কল্পনাশক্তির গুরুত্ব একতিলও অস্বীকার করেননি, কিন্তু তিনি তাকে দৈবী প্রতিভা বা দিব্যোন্মাদ দশার সঙ্গে যুক্ত করেননি, কল্পনাকেই চরম ও পরম ব'লে দাবি করেননি। রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনে কল্পনা বাস্তবকে অতিক্রম ক'রে যাবার যাদু-শক্তি নয়, বাস্তবকে নিবিড় ক'রে — অর্থাৎ মানবিক ক'রে পাবারই একটা উপায়। এ-কল্পনা স্বেচ্ছাচারী অর্থে স্বাধীন নয়। কেননা বাস্তববোধের সঙ্গে এ-কল্পনাবৃত্তির

যোগ অবিচ্ছেদ্য। তিনি স্পষ্টই বলেছেন ("বঙ্কিমচন্দ্র", 'আধুনিক সাহিত্য'), "যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকার-বদ্ধ।" বলেছেন ("তথ্য ও সত্য", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৩১৫), "তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ।"

'ভাব' এবং 'অনুভূতি' এই কথাদুটির রাবীন্দ্রিক প্রয়োগও বিশেষভাবে বিবেচনা ক'রে দেখা দরকার। ভাব বা অনুভূতি এখানে মোটেই ইংরেজি ফীলিং বা ইমোশনের অনুবাদ নয়। 'সাহিত্যের পথে'র ভূমিকায় (র।১৪।২৯১) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আমরা জ্ঞানে জানি বিষয়কে আর ভাবে জানি আপনাকেই। আরো বলেছেন, "বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে...।" ভাব অর্থ এখানে উপলব্ধি, যা কিনা নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নয়। জ্ঞান কথাটা এখানে বিশেষ সঙ্কীর্ণ অর্থেই গৃহীত — জ্ঞান মানে নৈর্বক্তিক জ্ঞান, বলা যেতে পারে অবচ্ছিন্ন discursive জ্ঞান। নইলে, বিজ্ঞানের বাইরে কি জ্ঞান নেই? প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তেই কি আমাদের জ্ঞানলাভ হচ্ছে না? আমাদের সত্তাই তো সতত জ্ঞানময়। জাগরণ অর্থই কি জ্ঞানময়তা নয়?

অন্যপক্ষে, ভাব মানে যদি নিছক ফীলিং বা ইমোশনই হবে, তাহ'লে 'ভাবের জানা' কথাটার অর্থই হয় না। কেননা, ইমোশন জানা নয়। জানা মানেই জ্ঞান, তা সে যেমনতরো জানাই হোক্ না কেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে ভাব কথাটা তার ধাতুগত অর্থের খুব কাছাকাছি যায়। সেই দিক থেকে দেখলে, 'ভাবে জানা' অর্থ 'হওয়া-দিয়ে-জানা', অন্তরঙ্গতার জানা অর্থাৎ সত্তা দিয়ে জানা। অনুভূতি প্রসঙ্গে "সাহিত্যতত্ত্ব" প্রবন্ধে ('সাহিত্যের পথে', র।১৪।৩৫৩) রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন :

"আমাদের জানা দু-রকমের, জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানা। অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্য কিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা; শুধু বাইরে থেকে সংবাদ পাওয়া নয়, অন্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা।"

একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন উপলব্ধি। তিনি বলেছেন, সাহিত্যের সত্যকে আমরা শুধু বুদ্ধি দিয়ে বা শুধু হৃদয় দিয়ে পাই না, 'হৃদামনীষা মনসা' উপলব্ধি করি — সমগ্র সত্তা দিয়ে পাই। ক্লাসিকপন্থীদের বুদ্ধি-সর্বস্বতার প্রতিবাদে রোমান্টিকদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথও ফীলিং-এর সমর্থনে দাবী জানিয়েছেন, কিন্তু রোমান্টিকদের

মতো ফীলিং-কেই তিনি চরম ক'রে তোলেননি। সাহিত্যের সত্য যে সমগ্র মন দিয়ে পাওয়া সত্য এবং সেই সত্যই যে সমগ্র সত্য — অখণ্ডিত সত্য, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার জোর দিয়ে বলেছেন :

"সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে মানবজীবনের সম্পর্ক। মানুষের মানবিক জীবনটা কোন্‌খানে? যেখানে আমাদের বুদ্ধি এবং হৃদয়, বাসনা এবং অভিজ্ঞতা সবগুলি গ'লে গিয়ে, মিশে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ ঐক্য লাভ করেছে। যেখানে আমাদের বুদ্ধি প্রবৃত্তি এবং রুচি সম্মিলিতভাবে কাজ করে। এক কথায়, যেখানে আদত মানুষটি আছে। সেইখানেই সাহিত্যের জন্মলাভ হয়। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশ পায়। সেই খণ্ড অংশগুলি বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি রচনা করে — পর্যবেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে, চিন্তাশীল মানুষ দর্শন রচনা করে, এবং সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে।" ("সাহিত্য", 'সাহিত্য', র.১৩।৮৪২)

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে দেখেছেন — অধিকাংশ সময়ই — স্রষ্টার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। এ-দেখা বিশেষভাবে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার দিক থেকে দেখা। সেইজন্যই তিনি সাহিত্য প্রসঙ্গে বারবার আত্মপ্রকাশ, কল্পনাশক্তি, অনুভূতি ইত্যাদি কথাগুলির উপর জোর দিয়েছেন। এটা তাঁর রোমান্টিকতার নিঃসংশয় প্রমাণ নয়। যিনি স্বয়ং স্রষ্টা, সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু রোমান্টিসিস্টদের মতো এই দেখাটাকেই তিনি একমাত্র দেখা ব'লে দাবি করেননি। সাহিত্যের ভালো-মন্দ নিরূপণের সময় এই দেখাটার উপর তিনি নির্ভর করেননি। সমালোচনাকে তিনি দেখেছেন ভোক্তার দৃষ্টিকোণ থেকে, সচেতন ভোক্তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে — যেখানে সমালোচনার সমালোচনাত্ব। সেইজন্যে সমালোচনার প্রসঙ্গে আত্মপ্রকাশের কথা না ব'লে বিশেষ ক'রে বিচারের কথাই বলেছেন।

আর্টকে আত্মপ্রকাশ আর সমালোচনাকে বিচার বলায় রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কোনোরকম অসঙ্গতি ঘটেনি। তার কারণ তাঁর আলোচনায় এ-কথাদুটির প্রসঙ্গ-ক্ষেত্র — ইংরেজিতে যাকে বলে universe of discourse — তা সম্পূর্ণ আলাদা।

৮.

রোমান্টিক, ক্লাসিক — এই ধরনের বহুব্যবহারজীর্ণ নামের ছাপ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনকে সাহিত্যতত্ত্বকে চিহ্নিত করা অসঙ্গত হবে। উভয়বিধ প্রবণতাই এর মধ্যে সমীকৃত হ'য়ে আছে। ক্লাসিক-রোমান্টিক, এই যুগ্ম অভিধাও সন্তোষজনক

নয়। তার কারণ আরো অনেক উপাদান ও প্রবণতা এর মধ্যে সংগৃহীত ও সাঙ্গীকৃত হয়েছে। তা ছাড়া, উপাদান দিয়ে নয়, একে চিনতে হবে এর স্বভাবধর্ম দিয়ে, যা কোনো উৎস-বিশেষের দান নয় — যা রবীন্দ্রনাথেরই নিজের। যে-শক্তি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের নানামুখী ধারাগুলির মধ্যে ঐক্য এনে দিয়েছে তার কথাই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সেই শক্তির মধ্যেই এ-সাহিত্যতত্ত্বের স্বভাব-ধর্মের প্রকৃত পরিচয়।

এক কথায় তার পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয় — রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিল্প-অভিজ্ঞতা — এবং এরই সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংপৃক্ত তাঁর সুগভীর মানবজীবন প্রীতি। যেখানে প্রতিদিনের সুখদুঃখ কান্না হাসির মধ্যে দিয়ে অনিত্য মানুষের একটি নিত্যকালের রূপ ফুটে উঠেছে, মানুষের সেই প্রতিদিনের দিনযাত্রাকে — সেই মানবসংসারকে — কবি রবীন্দ্রনাথ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ এক নিমেষের জন্যও কখনো ভুলতে পারেননি।

জগৎ ও জীবনের প্রতি মমতা, পৃথিবীর সমস্ত-কিছুর প্রতি সুগভীর ভালোবাসা, এইটেই বোধকরি রবীন্দ্রনাথের ভাবজগতের প্রবলতম ও সক্রিয়তম শক্তি। এ-ভালোবাসা রোমান্টিক আত্মপ্রীতি থেকে উৎসারিত নয়। আবার এ-ভালোবাসা আধ্যাত্মিক ব্রহ্মভক্তির নামান্তরও নয়। এই ভালোবাসাই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হ'তে দেয়নি। আবার এই ভালোবাসাই একে অধ্যাত্মলোকের তুরীয় মহাশূন্যে উধাও হ'য়ে যেতে বাধা দিয়েছে। এই ভালোবাসাই রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বের মাধ্যাকর্ষণশক্তি। এরই জন্যে, সমস্ত-কিছু সত্ত্বেও, রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বের আসল পরিচয় দাঁড়িয়েছে এই যে, এ-সাহিত্যতত্ত্ব জগৎ ও জীবনের প্রতি বিশ্বস্ততার সাহিত্যতত্ত্ব।

এই ভালোবাসা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার সমস্ত পর্বে, সব সময় সমান মূল্য পেয়েছে, এমন কথা বললে অবশ্যই ভুল করা হবে। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের একাধিক প্রবন্ধ থেকে এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই পর্বে এসে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা মাটি থেকে একটু বেশি উঁচুতে উঠে গিয়েছে, বিশুদ্ধ পরাতত্ত্বের টানে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি খাঁটি সাহিত্যবস্তু থেকে বেশ খানিকটা যেন দূরে স'রে গিয়েছে। এবং যেখানেই সে-রকম ঘটেছে, দেখতে পাবো, সেইখানেই তাঁর সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে তাঁর নিজেরই সমালোচনাতত্ত্বের, নিজেরই ব্যবহারিক সমালোচনার একটা দুস্তর বিচ্ছেদ ঘ'টে গিয়েছে। ভরসার কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাতত্ত্ব — এবং তাঁর ব্যবহারিক সাহিত্যসমালোচনা কখনোই পরাতত্ত্বের প্রতি কিছুমাত্র দুর্বলতা

দেখায়নি। সমালোচনাতত্ত্ব এবং সমালোচনার মধ্যে যে-সাহিত্যতত্ত্ব অনুস্যূত হ'য়ে আছে, তা নিঃসংশয়ে জীবন-প্রেমিক জীবনরসিক কবির সাহিত্যতত্ত্ব।

মর্ত্যজীবনপ্রীতি রবীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনায় এমন একটা বাস্তব-জীবনমুখী ঝোঁক এনে দিয়েছে যে এ-শিল্পদর্শনকে রিয়ালিজম্‌ বললে যদি ভুল হয়, অন্য-কিছু বললে আরো বেশি ভুল হবে। এ-বলা বাহুল্য, প্রচলিত বস্তুতন্ত্রবাদ থেকে এ-রিয়ালিজম্‌ পৃথক। রিয়ালিজম বস্তুপিণ্ড বা ঘটনাপুঞ্জের নয়। তথ্যের নয়, সত্যের।[১১]

"ইংরেজিতে যাকে বলে real, সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই, যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। তর্কের দ্বারা নয়, প্রমাণের দ্বারা নয়, একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। মন থাকে ব'লে, এই তো নিশ্চিত দেখলুম…।" ('সাহিত্যের পথে'র "ভূমিকা", র।১৪।২৯২) এই নিশ্চিত দেখার আনন্দকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, প্রত্যক্ষ-গোচরতার আনন্দ। এই আনন্দ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ("সাহিত্যতত্ত্ব", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৩৬১): "মানুষও একেবারে শিশুকাল থেকেই এই আনন্দ পেয়েছে, প্রত্যক্ষ বাস্তবতার আনন্দ। এই বাস্তবতার মানে এমন নয় যা সদাসর্বদা হয়ে থাকে, যা যুক্তিসঙ্গত। যে-কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট ক'রে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব।"

এ-বাস্তব মানুষের চেতনার দ্বারা অঙ্গীকৃত বাস্তব, মানুষের উপলব্ধির বাস্তব।

৯.

"মানুষ বিশ্বসংসারে যাহা ভালোবাসে আর্টের দ্বারা তাহার স্তব করে। সুন্দর গড়ন দিয়া মানুষ যখন সামান্য একটা ঘট প্রস্তুত করে তখন সে কী করে? না, রেখার যে মনোহর রহস্য আমরা ফুলের পাপড়ির মধ্যে, ফলের পূর্ণতার মধ্যে, পাতার ভঙ্গিমায়, জীবশরীরের লাবণ্যে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, মানুষ ঘটের গঠনে বিশ্বের সেই রেখা-বিন্যাস-চাতুরীর প্রশংসা করে।" ("শুভবিবাহ", 'আধুনিক সাহিত্য', র।১৩।৯৫৮)

বক্তব্যটা এখানে আশাতীতরকমের স্পষ্ট। বিশ্বসংসারে যাদের দেখে শিল্পী মুগ্ধ হন, নানা রূপে নানান্‌ বেশে তারাই এসে তাঁর আর্টের জগতে প্রবেশ করে। অর্থাৎ মানুষের চেতনায় অঙ্গীকৃত বস্তুবিশ্বই শিল্পের বিশ্ব। ভাব কল্পনা স্বপ্ন — সবই বস্তুবিশ্ব থেকে প্রাণরস আহরণ করে। এবং সবই মানবচেতনায়-বিধৃত বস্তুবিশ্বে অঙ্গীকৃত।

মানুষের জগৎ এবং জগতের উপলব্ধি — এই হ'লো চরম কথা। জীবনবোধই

শিল্প-প্রেরণার উৎস এবং জীবনবোধই রসবোধের ভিত্তি। কী শিল্পী, কী সমালোচক — চরম আদর্শ তাঁদের সামনে একটিই। সে-আদর্শ হ'লো জীবনের আদর্শ। জীবন সংক্রান্ত তথ্যজ্ঞান নয়, জীবনের উপলব্ধি — জীবনের ধ্যানগম্য মূর্তি। আর্ট তারই রূপায়ণ। বলা যেতে পারে, বিগ্রহায়িত জীবন-সত্য।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে উপলব্ধ-সত্যের জীবন্ত বিগ্রহরূপেই দেখেছেন। স্পষ্ট ক'রে বলেছেন ("শকুন্তলা", 'প্রাচীন সাহিত্য', র।১৩।৬৬২।২৯), "সত্যের আভ্যন্তরিক মূর্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সত্যের বাহ্যমূর্তিকে... কাব্যসৌন্দর্যের সহিত সঙ্গত করিয়া" নেওয়াই সাহিত্যের চরম আদর্শ। বাক্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : এর মধ্যে একই সঙ্গে একদিকে যেমন সত্যের দাবিও স্বীকৃত, অন্যদিকে তেমনি রূপায়ণের দাবিও সমানভাবে স্বীকৃত।

জীবনের 'অনুকরণ' নয়, জীবনের (অথবা বলা যায়, জীবন-উপলব্ধির) রূপায়ণ। সত্যের বাহ্যমূর্তি রূপায়ণের দাবিকে স্বীকার ক'রে নেয়। অন্যদিকে, রূপায়ণও তেমনি সত্যের আভ্যন্তরিক মূর্তিকে স্বীকার করে, এবং তাকে উজ্জ্বল ক'রে তোলার মধ্যে দিয়েই সার্থক হ'য়ে ওঠে। এখানে সত্যের দাবি ও রূপের দাবি পরস্পরের থেকে পৃথক নয় — বিষয়বস্তু ('কণ্টেণ্ট্') ও 'ফর্ম' এখানে অবিচ্ছেদ্য।

সাহিত্যে ফর্ম বা রূপ স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসিদ্ধ কিছু নয়। সত্যের উপলব্ধির দ্বারা, সত্যের আভ্যন্তরিক মূর্তির দ্বারা — সত্যকে জীবন্ত ক'রে তোলার প্রয়োজনের দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত। বলা বাহুল্য, এ-নিয়ন্ত্রণ কোনো বাইরের ঘটনা নয়। সত্যের দাবি, উপলব্ধির দাবি এবং রূপায়ণের দাবি, শিল্পীর কাছে এরা সম্পূর্ণ অভিন্ন। (ফর্মের ছাঁদ সম্ভবত আমাদের উপলব্ধি বা বোধেরই ছাঁদ। এবং এ-ও হয়তো সম্ভব যে, জীবনের ছন্দ থেকেই আমাদের উপলব্ধিতে ছন্দ বা প্যাটার্নের বোধ সঞ্চারিত।)

১০.

মহাশিল্পী জীবন দেশে দেশে কালে কালে নিরন্তর যে-শিল্পরচনায় প্রবৃত্ত রবীন্দ্রনাথ সেই মহাশিল্পের দিকে দু-চোখ মেলে তাকাবার জন্য শিল্পী সমালোচক পাঠক সকলকে আহ্বান করেছেন। জীবনের সেই মহাশিল্পই মানুষের শিল্পরচনার আদি ও অন্তিম প্রেরণা। সেই মহাশিল্পই শিল্পীর সামনে তাঁর শিল্পরচনার আদর্শ, সমালোচকের সামনে তাঁর রসবিচারের মানদণ্ড এবং ভোক্তাসাধারণের মনে তাঁদের রসোপভোগের ভিত্তি।

"জীবন মহাশিল্পী। সে যুগে যুগে দেশে দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলছে।...জীবনের এই সৃষ্টিকার্য যদি সাহিত্যে যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে পারে তবেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে। সেই রকম সাহিত্যই ধন্য — ধন্য ডন কুইক্‌সট, ধন্য রবিন্‌সন ক্রুসো।" ("সাহিত্যের মূল্য", 'সাহিত্যের স্বরূপ', র।১৪।৫৩৩)

এইখানে এসে রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন তার নানামুখী প্রবণতাগুলিকে একটি কেন্দ্র-বিন্দুতে সংহত ক'রে নিয়েছে। এবং এইখানেই রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন ও সমালোচনাতত্ত্বের পরিপূর্ণ সঙ্গতি আমাদের চোখের সামনে অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে।

"রসের সৃষ্টিতে সর্বত্রই অত্যুক্তির স্থান আছে, কিন্তু সে অত্যুক্তিও জীবনের পরিমাণ রক্ষা ক'রে তবে নিষ্কৃতি পায়।" ("সাহিত্যের চিত্রবিভাগ", 'সাহিত্যের স্বরূপ', র।১৪।৫৩৫) 'জীবনের পরিমাণ রক্ষা' কথাটা গভীরভাবে অনুধাবন করবার মতো। এই কথাই শেষ কথা যে — "সাহিত্যের চিত্রশালায় যেখানে জীবন-শিল্পীর নৈপুণ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেখানে মৃত্যুর প্রবেশদ্বার রুদ্ধ।"

১. প্রকৃতপক্ষে একমাত্র প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যই বিশিষ্ট অর্থে 'ক্লাসিক সাহিত্য', পরবর্তী সমস্ত অনুগামী সাহিত্যই 'নব্য-ক্লাসিকাল' আখ্যা পাবার যোগ্য। এই অর্থে, শুধু ১৮শ শতকের ফরাসী ইংরেজি প্রমুখ সাহিত্যই নয়, আলেক্‌জান্‌ড্রিয়ান-গ্রীক, রোমান-লাতীন, রেনেসাঁস-ইতালিয়ান — এরাও 'নব্য-ক্লাসিকাল' সাহিত্য। গোঁড়া নিয়মানুবর্তিতা ক্লাসিক সাহিত্যের নয়, পরবর্তী অনুগামী সাহিত্যেরই চরিত্র-ধর্ম। এ-প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে, ক্লাসিক ও ক্লাসিসিস্ট এক নয়। ক্লাসিক মৌলিক, ক্লাসিসিস্ট তিনি যিনি ক্লাসিকের অনুগামী।

২. রোমান্টিক সাহিত্য, রোমান্টিসিস্ট শিল্পতত্ত্ব — এই শব্দগুলি এখানে রোমান্টিক আন্দোলনের পরিণতি-পর্বের পক্ষেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, যখন পর্যন্ত এ-আন্দোলন তার ন্যায়-সঙ্গত পরিণামের সন্ধান পায়নি তখনকার পক্ষে নয়। এবং সামগ্রিকভাবেই প্রযোজ্য, ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্কে ততোটা নয়। আরো বলা প্রয়োজন যে, এখানে শব্দ দুটি নিতান্তই বর্ণনাত্মক, নিন্দা-প্রশংসার কোনো ইঙ্গিত এখানে নেই। অর্থের অনির্দিষ্টতার জন্য অনেকে এইসব শব্দ সম্পূর্ণ বর্জনের পক্ষপাতী।

এখানে ব্যবহারের কৈফিয়ৎ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, শিল্পতত্ত্ব-সমালোচনাতত্ত্বের ক্ষেত্রে কথাগুলির অর্থ খুব অনির্দিষ্ট নয়। আরো একটা কথা এখানে বলা দরকার। সাধারণত 'রোমান্টিক' কথাটি বিশেষ প্রবণতা বা প্রবণতা-সমষ্টির প্রসঙ্গে এবং 'রোমান্টিসিস্ট' কথাটি বিশেষ শিক্ষাতত্ত্ব প্রসঙ্গে প্রযুক্ত হয়। অপ্রয়োজনবোধে এখানে সর্বত্র এই প্রয়োগ-পার্থক্যকে রক্ষা ক'রে চলা হয়নি।

৩. কার্লাইল বলেছেন, "Criticism s'ands like an interpreter between the inspired and uninspired; between the prophet and those who hear the melody of his words." এক সময় সুপ্রাচীনকালে কবিরা সত্যদ্রষ্টা প্রফেট ব'লেই গণ্য হতেন। কবি ও জ্ঞানীতে তখন কোনো তফাৎ করা হ'তো না। বোধকরি প্লেটোই প্রথম কবিদের সত্যদ্রষ্টার উচ্চাসন থেকে টেনে নামিয়েছেন। প্লেটোর বিবেচনায় জ্ঞানীর রাজ্যে কবিদের স্থান ষষ্ঠ ধাপে; প্রকৃতপক্ষে মিথ্যার ব্যাপারী হিসেবে প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে তাঁরা নির্বাসনযোগ্য। পরবর্তী ক্লাসিকপন্থীদের আমলে দার্শনিক-সাহিত্যশাস্ত্রীরাই হ'য়ে উঠলেন প্রফেট, আর শিল্পীরাই হ'য়ে পড়লেন বশংবদ কর্মী। এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় রোমান্টিক যুগে পাল্লা ঝুঁকে পড়লো সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। ঘোষিত হ'লো যে, কবিই একমাত্র সত্যদ্রষ্টা—কাব্যসত্যই একমাত্র সত্য। (নোফালিসের উক্তি স্মরণীয়: 'যতো অধিক কবিত্বপূর্ণ, ততো অধিক সত্যতা'।) কিছুকাল আগে সত্যদ্রষ্টার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলো বিজ্ঞান—বিশেষ ক'রে পদার্থবিদ্যা। সে-দিনও গত হয়েছে। বর্তমানকালে দাবিদারের অভাবে সত্যদ্রষ্টার সিংহাসন খালি প'ড়ে আছে।

৪. অস্কার ওয়াইল্ডের সেই বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণীয়: "There are two ways of disliking art; one is to dislike it, the other is to like it rationally ...."

৫. শুধু আর্টের ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত ক্ষেত্রেই বুদ্ধিবিরোধী প্রবণতার প্রধান প্রতিনিধি এবং রোমান্টিকতার নমস্য পুরোহিত রুশোর উক্তি এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে: "The man who thinks is a depraved animal...."

৬. আধুনিক সাহিত্যের আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে এ-রকম পূজার আবেগ বিশেষ দেখতে পাওয়া যায় না। "মেঘনাদবধ কাব্য" (রবীন্দ্ররচনাবলী ১৫) প্রবন্ধটির কথা না-হয় ছেড়েই দেওয়া গেলো, কিন্তু আধুনিক সাহিত্য বইটির সমস্ত প্রবন্ধই এ-বিষয়ে নিশ্চিত সাক্ষ্য দিতে পারে। "বঙ্কিমচন্দ্র" ('আধুনিক সাহিত্য') প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের কঠোর বিচার-নিষ্ঠার ও নিরাবেগ মননশীলতার যে-রকম প্রশংসা করেছেন, তার মধ্যে সমালোচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছে।

৭. রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের সমস্ত সত্যই মানব-সাপেক্ষ অর্থাৎ মানবিক সত্য। বিজ্ঞানের সত্যও তাই। এ-কথা ধ্রুবত্ব সম্পর্কেও প্রযোজ্য। আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ খুব জোর দিয়েই বলেছেন যে, সত্য শিব সুন্দর—সবই মানবিক, কিছুই absolute নয়। (*The Religion of Man* গ্রন্থের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।)

৮. এ-প্রসঙ্গে গ্যেটের উক্তি স্মরণীয়: "To the errors and aberrations of the hour, we must oppose the masses of universal history...."

৯. বলা বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, যিনি খাঁটি রোমাণ্টিক, তাঁর ভূত-কাল ভাবী-কাল দুই কালের প্রতিই সমান অনাস্থা। বর্তমানের প্রতিও তাই। কুলীন রোমাণ্টিক লেখক কোনো কালের পাঠকেরই ধার ধারেন না। তাঁর রচনা আসলে তাঁর স্বগতোক্তি। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন, "একাকী গায়কের নহে তো গান", তাঁরা তা বলেন না। শেলি বলেন, "A poet is a nightingale who sits in darkness and sings to cheer its own solitude with sweet sounds." রোমাণ্টিক কবিদের অন্যতম প্রবক্তা মিল্ বলেন, "Poetry is feeling, confessing itself to itself in moments of solitude ...." কীট্‌সের কথাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন, "I never wrote one single line of poetry with the least shadow of the public thought...."

১০. বিস্তৃত আলোচনার জন্য "প্রকাশতত্ত্ব" অংশ এবং পরিশিষ্টের "পাশ্চাত্য প্রকাশবাদ ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজিজ্ঞাসা" দ্রষ্টব্য।

১১. তথ্য ও সত্যের সম্বন্ধ নিরূপণ অতি দুরূহ ব্যাপার। তথ্য মিথ্যা নয়, অথচ তাকে 'সত্য' ব'লে মানতে দ্বিধা করি। আবার 'সত্য' তথ্য নয়, অথচ তাকে তথ্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রেও জানি না। তাহ'লে এদের সঠিক সম্পর্কটা কী? সত্য শব্দটি নানা প্রসঙ্গে নানা অর্থে ব্যবহৃত। প্রায় সব কালের এবং প্রায় সব গোষ্ঠীর সাহিত্যশাস্ত্রীরাই সাধারণভাবে সত্যের কথা ব'লে থাকেন। কিন্তু সকলে এক অর্থে বলেন না। আর্টের সঙ্গে সত্যের আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কিনা এ-বিষয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। এ-অবস্থায় রাবীন্দ্রিক রিয়ালিজমের স্বরূপনির্ণয় সহজসাধ্য নয়। প্রচলিত বস্তুতন্ত্রবাদের সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য সহজেই নজরে পড়ে, কিন্তু মৌলিক ভেদ আছে কিনা সে এক জটিল প্রশ্ন। অন্যদিকে, তথাকথিত 'অনুকরণবাদে'র সঙ্গে এর পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে যতোটা প্রশ্নাতীত ব'লে মনে হয়, আসলে ঠিক তা কিনা সে-ও একটা জিজ্ঞাসা। বিস্তৃত আলোচনার জন্য "কল্পনাতত্ত্ব" ও "সাহিত্যের সত্য" অংশ দ্রষ্টব্য।

সমালোচনাতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য

জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ সম্পর্কে আমাদের বোধ যতোই বাড়তে থাকবে, সাহিত্য-আলোচনাতেও ততোই নিত্য নতুন দিক খুলে যাবে, এটা স্বাভাবিক। আমাদের সাহিত্য-আলোচনাতে যে নতুন-নতুন জটিলতার উদ্ভব হচ্ছে, তার একটা কারণ এই যে, সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের সচেতনতার মধ্যেই নিত্য নতুন জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।

এইখানেই শেষ নয়। নতুন-নতুন দৃষ্টিকোণ খুলে যাওয়ার ফলে আমাদের সাহিত্য-আলোচনায় বিচিত্র সব জাতি এবং উপজাতিরও সৃষ্টি হচ্ছে। তার কোনোটা ঐতিহাসিক, কোনোটা সমাজতাত্ত্বিক, কোনোটা হয়তো দার্শনিক। আবার কোনোটা হয়তো নৃতত্ত্বভিত্তিক, কোনোটা মনস্তাত্ত্বিক, কোনোটা বিশুদ্ধ ভাষাতত্ত্বকেন্দ্রিক। তাছাড়া, সাহিত্যভিত্তিক নানারকমের আলোচনা তো আছেই।

এইসব নানা জাতের নানান্ গোত্রের তাবৎ আলোচনাকেই আমরা সাধারণত 'সাহিত্যসমালোচনা' নাম দিয়ে থাকি। কিন্তু এদের বহুবিধতার কথা ভাবলে, এদের মেজাজের মৌলিক ভিন্নতার কথা স্মরণ করলে, একটা প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। 'সমালোচনা' নামটা কি সাহিত্য-আলোচনার এই ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্য ও জটিলতার সঙ্গে সত্যিই পাল্লা রাখতে পারছে? তা যদি পারতো, তা হ'লে প্রকৃত সমালোচনা কী তা নিয়ে এতো মতভেদ থাকতো না, সমালোচনাতত্ত্ব নিয়ে এতো পরস্পর-বিরোধী মতবাদের সৃষ্টি হ'তো না।

দ্বিমত নেই যে, সাহিত্যের আবেদন নিয়েই সাহিত্যসমালোচনা। কিন্তু 'সাহিত্যের আবেদন' কথাটা শুনতে যতো সহজ, ব্যাপারটা ঠিক ততো সরল নয়। আমাদের মনে সাহিত্যের এই আবেদন একদিকে যেমন সহজ ও অব্যবহিত, অন্যদিকে তা তেমনি জটিল, প্রস্তুতিসাপেক্ষ এবং বহুস্তর-বিন্যস্ত। আমাদের প্রত্যেক অভিজ্ঞতার একটা নিজস্ব জগৎ আছে এ যেমন সত্যি, তেমনি এ-কথাটাও সমান সত্যি যে, আমাদের কোনো অভিজ্ঞতাই নিজেকে শেষ পর্যন্ত নিজের দেওয়াল-ঘেরা জগতের মধ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ রাখতে পারে না। এ-কথা সাহিত্য-অভিজ্ঞতার পক্ষেও প্রযোজ্য। বিশুদ্ধ রসাস্বাদনই হয়তো তার অভীষ্ট জগৎ, কিন্তু যেহেতু আমরা খুব মিশ্র ধরনের জীব, সেইহেতু সাহিত্যের সামগ্রিক আবেদন শুধু রসাস্বাদনের মধ্যেই

নিজেকে আটকে রাখে না। রসাস্বাদন থেকেই তার যাত্রা শুরু। কিন্তু তার পর ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো আমাদের উপলব্ধির ঘাটে ঘাটে নিজেকে সে প্রসারিত ক'রে দেয়। উপলব্ধির প্রত্যেকটি ঘাট থেকে প্রতিক্রিয়ার নতুন-নতুন তরঙ্গ ফিরে এসে সেই প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ করে, তাকে ব্যাপকতর ও সমৃদ্ধতর বোধে পরিণত করে। ক্রমে পাঠকের চিত্তে যে একটি গভীর ও জটিল সামগ্রিক উপলব্ধির প্রতিষ্ঠা হয় তা হয়তো প্রাথমিক অভিজ্ঞতার মতো অমিশ্র নান্দনিক (ইস্থেটিক) ব্যাপার নয়, কিন্তু বিস্তৃতি ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে তা পূর্ণতর।

'অমিশ্র নান্দনিক' কথাটা হয়তো কিছু শীর্ণ ঠেকতে পারে। ইচ্ছা করলে 'রস' কথাটিকে আমরা পূর্ণতর অর্থেও গ্রহণ করতে পারি। অর্থাৎ, আস্বাদনের ইস্থেটিক বিশুদ্ধতা নিয়ে যদি খুঁতখুঁতে না হই, তা হ'লে পাঠকের জটিল ও ব্যাপক উপলব্ধিকেই — এই মিশ্রিত কিন্তু ঐশ্বর্যশালী সামগ্রিক চেতনাকেই আমরা রস বা রসাস্বাদন ব'লে গ্রহণ করতে পারি। মোট কথা, খাঁটি ইস্থেটিক হোক্ আর না-ই হোক্ একে রস বলি আর না-ই বলি, এই বহুস্তরান্বিত জটিল এবং পূর্ণতর উপলব্ধিই সাহিত্যে পাঠকের সামগ্রিক প্রাপ্তি।[১]

সাহিত্যসমালোচনা পাঠকের দিকের এই ব্যাপক প্রাপ্তির স্বীকৃতি।

সাহিত্য পাঠকের — পাঠক হিসাবে পাঠকের — প্রাপ্তির যেখানে সীমা, সাহিত্যের সামগ্রিক আবেদনেরও যে সেইখানেই সীমানা তা বলা যায় না। বিশুদ্ধ পাঠক হিসাবে সাহিত্যের কাছে আমরা যা চাই এবং যা পাই, সেইখানেই তার দেওয়া এবং আমাদের পাওয়া থেমে যায় না। সাহিত্য আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে স্পর্শ করে, সেখানেও অনেক নতুন তরঙ্গের সৃষ্টি করে। অনেক সময় বিশুদ্ধ ব্যবহারিক প্রবর্তনার ফলেও আমরা সাহিত্য-আলোচনাতে প্রবৃত্ত হ'য়ে থাকি।

সাহিত্যের আবেদন আমাদের মনের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিকে জাগিয়ে তুলে যে-সব সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের আলোচনার জন্ম দেয়, সাধারণভাবে তাদের সকলেরই নাম সাহিত্য-আলোচনা। কিন্তু এদের সকলকেই কি সমালোচনা বলা চলে? যেখানে আমরা মূলত ভোক্তা নই, অথবা আদৌ ভোক্তা নই — যেখানে আমরা মূলত ঐতিহাসিক, কি সমাজসেবী, কিংবা তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অথবা বৈজ্ঞানিক, সেখানেও সাহিত্য আমাদের স্পর্শ করে। সেই সম্পূর্ণ অ-সাহিত্যিক মন নিয়ে, অ-সাহিত্যিক বৃত্তির প্রবর্তনায় যখন সাহিত্য-আলোচনায় বসি, তখন সে-ও কি সাহিত্যসমালোচনা?

সমালোচনা কথাটা বাংলায় খুব পুরোনো নয়। সাধারণত ইংরেজি 'ক্রিটিসিজ্ম্' কথাটির প্রতিশব্দ হিসাবেই একে আমরা ব্যবহার ক'রে থাকি। পাশ্চাত্য সাহিত্য

ও দর্শনে বহুকালের বহু ব্যবহারের ফলে ক্রিটিসিজম্ কথাটির একটি বিশিষ্ট অর্থ ও ভাবানুষঙ্গ কথাটার গায়ে পাকা হ'য়ে ব'সে গেছে। তার মধ্যে বিচার বা মূল্যায়নের ভাবটাই প্রধান। কথাটার ব্যুৎপত্তিতেও বিচারেরই ইঙ্গিত। কিন্তু সাহিত্য-আলোচনার সবটাই তো আর বিচার-জাতীয় নয়। এ-ক্ষেত্রে, সবরকম বা যে-কোনোরকম সাহিত্য-আলোচনাকে ক্রিটিসিজম্ অর্থে সমালোচনা বললে, অন্য ক্ষতি না-হোক্, কাজের ক্ষেত্রে প্রচুর বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

সব আলোচনাই যদি সমালোচনা না হয়, তা হ'লে ঠিক কোন্‌টুকু যে সমালোচনা তা স্থির ক'রে নেওয়া দরকার। কথাটার আদিম প্রয়োগ যা-ই হোক্-না কেন, বর্তমানে কথাটাকে যদি কোনো-একটা বিশিষ্ট অর্থেই ব্যবহার করতে হয়, তা হ'লে বোঝা দরকার কোন্ ব্যবহারটা সংগততম। অর্থাৎ কোন্‌টা ক্রিটিসিজমের বা সমালোচনার আসল কাজ।

অনেকের মতে সমালোচনার আসল কাজ হ'লো সাহিত্য-বিশেষের পরিচয় দেওয়া। আধুনিককালের প্রবণতা ততোটা পরিচয়ের দিকে নয় যতোটা ব্যাখ্যার দিকে। কেউ কেউ অবশ্য বিচারেরই পক্ষপাতী। দেখতে হবে, এর মধ্যে কোন্‌টি পাঠকের সাহিত্য-সাক্ষাৎকারের জটিল ও বহুমুখী প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে মিলনের সূত্র রচনা করতে পারে। দেখতে হবে, পাঠকের সাহিত্যিক প্রাপ্তির সমগ্রতা কাকে আশ্রয় ক'রে গ'ড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে বিপরীতমুখে এ-ও দেখতে হবে, কোন্ প্রতিক্রিয়া সাহিত্যকে সাহিত্য হিসাবে মোটেই স্পর্শ করছে না।

রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা কথাটাকে কোনো-কোনো সময় ঢিলে-ঢালা অর্থেও ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত কাজের সময় কথাটাকে তিনি বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করারই পক্ষপাতী। তাঁর মনঃপূত সেই বিশিষ্ট অর্থটি কী ?

রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যসমালোচনার বিশিষ্ট অর্থ হ'লো সাহিত্যবিচার। এই বিশিষ্টতার উপরে জোর দেবার জন্যেই তিনি সাহিত্যসমালোচনার বদলে সাহিত্য-বিচার কথাটাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে। বিচার মানে কিন্তু শুধুই বিচার নয়, কেবল রায় দেওয়াই নয়। ক্ষেত্র-বিশেষে আদৌ রায় দেওয়া নয়। এ-বিচার আসলে, এক কথায় বলা যায় — সামগ্রিক সাহিত্য-সচেতনতা। এই সচেতনতা এমন একটা সাধারণ-ভূমি, যাকে স্পর্শ করার ফলে সাহিত্য-আবেদনসঞ্জাত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারে। এই কথাটাই একটু বিশেষভাবে বুঝে দেখা দরকার।

২.

"সাহিত্যবিচার"[২] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসমালোচনা কথাটির বদলে সাহিত্য-বিচার কথাটি ব্যবহারের প্রস্তাব ক'রে সঙ্গে সঙ্গেই মন্তব্য করেছেন, "বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়াই সাহিত্যবিচারের লক্ষ্য।" আবার প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি এ-ও বলেছেন যে, "সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ নয়।" (র।১৪।৩৪১)

এ থেকে সহজেই মনে হ'তে পারে যে, পরিচয়, ব্যাখ্যা ও বিচার, এরা বুঝি একই ক্রিয়ার তিনটি ভিন্ন নাম। আর বিশ্লেষণটা বুঝি একেবারে আলাদা জাতের। বিশ্লেষণের কথা আপাতত যাক, কিন্তু সত্যিই কি ব্যাখ্যা, পরিচয় আর বিচার সম্পূর্ণ অভিন্ন ?

কথাগুলির সাধারণ ব্যবহার কিন্তু মোটেই অভিন্নতার সূচক নয়। শুধু লোক-ব্যবহারই বা কেন, সাহিত্যসমালোচনাতেও এদের প্রয়োগ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে। সাহিত্য আলোচনায় ব্যাখ্যা, পরিচয়, বিচার তিনেরই যথাযোগ্য স্থান আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ-কথাও ঠিক যে এই তিনের মূলগত প্রবর্তনা সম্পূর্ণ পৃথক্। এই পার্থক্যের সূত্রেই আমরা পরিচয়মূলক, ব্যাখ্যামূলক আর বিচারমূলক — এই তিনটি ভিন্ন জাতের সমালোচনার সাক্ষাৎ পাই, তিনটি পরস্পর-বিরোধী সমালোচনাতত্ত্বের তিনরকম দাবির সঙ্গে পরিচিত হই।

পরিচয়ই একমাত্র সমালোচনা, এই হ'লো পরিচয়মূলক সমালোচনাতত্ত্বের বক্তব্য। সমালোচনার কাজ পাঠককে সমালোচ্য বিষয়ের যথাসম্ভব সাক্ষাৎ পরিচয় দেওয়া, এবং পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে মূলের আস্বাদ দেওয়া। বিষয়ের পরিচয় কথাটা অবশ্য খুব স্পষ্ট নয়। কারণ 'বিষয়' বলতে অনেক-কিছুই বোঝায়। রচনার স্থূল বস্তুগত অবলম্বনকেও (যাকে বলা হয়, সাবজেক্‌ট-ম্যাটার) বিষয় বলা যায়, আবার রচিত শিল্প-বিগ্রহ (কন্টেন্ট্), তাকেও বিষয় বলতে বাধা নেই। রূপ, সে-ও বিষয়ের বহির্গত নয়। যাকে রস বলি, তা-ও বিষয়-আশ্রিত। পরিচয়মূলক সমালোচনা কিসের পরিচয় দেয় ?

শিল্পবস্তুমাত্রেই তো অদ্বিতীয়। তার রূপ অনন্য, তার কন্টেন্ট্ — সে-ও অনন্য। তার রস বিকল্প-রহিত। এদের কোনো দ্বিতীয় পরিচয় সম্ভব নয়। এবং তা যেহেতু সম্ভব নয়, সেইহেতু পরিচয়মূলক সমালোচনাকে তার দাবি শুরুতেই অনেকখানি খাটো ক'রে নিয়ে আসতে হয়। রচনা-বিশেষের — তা সে কবিতা নাটক উপন্যাস যাই-হোক্-না কেন, তার — অনন্য শিল্প-রূপটির সাক্ষাৎপরিচয় যেখানে সাধ্যাতীত, অথচ পরিচয়ই যেখানে একমাত্র উপজীব্য, সেখানে করণীয় কী ? বলা বাহুল্য, যে-পরিচয়টুকু

দেওয়া সাধ্যায়ত্ত, অগত্যা সেইটুকুই দেওয়া। তা যদি ভগ্নাংশমাত্র হয়, তা যদি নিতান্তই বহিরঙ্গের পরিচয় হয়, উপায় নেই।

বিভিন্ন গোত্রের পরিচয়মূলক সমালোচনা সাহিত্যের বিভিন্ন বহিরঙ্গের অথবা বিভিন্ন ভগ্নাংশের এক-একটিকে বেছে নিয়েছে। তার একটা হ'লো স্থূল অর্থে যাকে সাবজেক্ট-ম্যাটার বা বিষয়বস্তু বলা হয়, যেমন কাহিনী বা ঘটনাংশ বা শুষ্ক ভাব-বস্তু — এরই একটা বাহ্য বর্ণনা দেওয়া, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় প্যারাফ্রেজ-মূলক সমালোচনা। দ্বিতীয় এক পথ হচ্ছে, সমালোচ্য বিষয়ের আঙ্গিক বা টেক্‌নিকগত পরিচয় দেওয়া। অপর এক পথ হ'লো, রচনাটির জাতি-কুলগত পরিচয় দেওয়া অথবা শ্রেণীগত পরিচয় দেওয়া : রচনাটি কতোটা ভারতীয় অথবা কতোটা ইউরোপীয় তার সন্ধান দেওয়া। কিংবা, কী পরিমাণ ট্র্যাজেডি, কতোখানি লিরিক, খাঁটি সনেট-রীতি কতোটা রক্ষিত হয়েছে ইত্যাদির পরিচয়।

আরও অনেক পথ আছে। রচনাটি যখন বিশেষ দেশের বিশেষ কালের সাহিত্য-ইতিহাসের কোনো-একটি ধারার কোনো-এক নির্দিষ্ট স্থানে অধিষ্ঠিত, তখন সাহিত্য-ঐতিহ্যের দিক থেকে তার একটা অধিষ্ঠানগত পরিচয় নিশ্চয়ই হ'তে পারে। অথবা, অন্যতর ঐতিহাসিক পরিচয়ও সম্ভব। শুধু সাহিত্যধারার নয়, রচনাটি যেহেতু সমগ্র ইতিহাসেরই অঙ্গ, একটি ঐতিহাসিক ঘটনা — বহুবিধ সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক তরঙ্গাভিঘাতের অন্যতম ফল, সেইহেতু উক্ত তরঙ্গগুলির বলক্রিয়ার পরিচয়ের মধ্যে রচনাটির কিছু পরিচয় অবশ্যই মিলবে।

আরও আছে। রচনার জন্মগত, অথবা বলা উচিত, রচনার জন্মদাতাগত পরিচয়। আসলে রচনার নয়, রচয়িতার পরিচয় — তাঁর অন্তর্জীবনের পরিচয়। (এ-ও একরকমের ঐতিহাসিক পরিচয়ই বটে।) মুখ্যত লেখকের প্রেরণার পরিচয়, প্রেরণার পটভূমির পরিচয়, কোনো প্রেরণাদাত্রীর খোঁজ মিললে তাঁর পরিচয়, শিল্পীমানসের চেতন ও অবচেতন উৎকণ্ঠার পরিচয়। অথবা, যে রহস্যময় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিল্পীর আবেগ একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপের মধ্যে স্বস্তি খুঁজে পেলো, তথ্যগত কার্য-কারণের প্রমাণ দিয়ে সেই রহস্যের সমাধান।

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, আঙ্গিকগত পরিচয়, কিংবা এইসব নানান্ জাতের 'ঐতিহাসিক' পরিচয়, এরা অংশত ব্যাখ্যাও বটে। এদের সকলের মধ্যেই একধরনের সন্ধানীবৃত্তি ক্রিয়াশীল। এই সন্ধানীবৃত্তি বিজ্ঞানবুদ্ধিরই সগোত্র।

সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জাতের পরিচয়ের কথাও এখানে বলা দরকার। এমন এক পরিচয়, যার পিছনকার তাগিদটা মোটেই বিজ্ঞানবুদ্ধির নয়, পুরোপুরিই শিল্পপ্রেরণার। এমন

শিল্পপ্রেরণা যেখানে মূল সাহিত্য-সাক্ষাৎকারটা সুদূর একটা উপলক্ষমাত্র। সচরাচর যাকে সৃজনধর্মী বা ক্রিয়েটিভ সমালোচনা বলা হয়, এ হ'লো সেই জাতের জিনিস। কোনো-কোনো শিল্পী সমালোচক এবং অনেক শিল্পী-মন্য সমালোচক এই কাজই ক'রে থাকেন। ব্যাপারটা হ'লো, খানিকটা মূল রচনাকে অবলম্বন ক'রে, অথবা তাকে উপলক্ষ ক'রে, সমালোচকের নিজস্ব সৃষ্টি ক্ষমতার দ্বারা মূলের অনুরূপ (অনেক সময় মোটেই মূলের অনুরূপ নয়) একটি রসের সৃষ্টি করা।[৩]

এর খুব কাছাকাছি আরও এক জাতের সৃজনধর্মী পরিচয় আছে। মূল রচনা বা রচয়িতার পরিচয় নয়, সমালোচকের নিজেরই পরিচয়।

অধিকাংশ পরিচয়ের মধ্যেই যেমন ব্যাখ্যা মিশে থাকে, অধিকাংশ ব্যাখ্যাতেই তেমনি একধরনের পরোক্ষ পরিচয় ঘটা স্বাভাবিক। তবু পরিচয় আর ব্যাখ্যা মোটেই এক বস্তু নয়। এদের পরিধিতে কিছুটা সাধারণ ভূমি আছে, কিন্তু বেশিটাই পরস্পর-বহির্ভূত। আসলে এদের স্বভাব আলাদা, পিছনকার তাগিদও আলাদা।

রচনা-বিশেষ যখন পাঠকের কাছে কোনো-না-কোনো দিক থেকে সমস্যার আকার নিয়ে দেখা দেয় — সে-সমস্যা অংশেরই হোক্ আর সমগ্রেরই হোক্ — মাত্র তখনই ব্যাখ্যার কথা আসতে পারে। সমস্যা না-থাকলে, সমস্যা পূরণের প্রশ্নই ওঠে না। এমন স্বচ্ছ রচনা আশা করি অসম্ভব নয়, যেখানে ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অবান্তর। কিন্তু তার কি সমালোচনাও সম্ভব নয়?[৪]

শিল্পবস্তুর অনন্য সত্তাটির যেমন দ্বিতীয় কোনো পরিচয় নেই, তেমনি তার কোনো ব্যাখ্যাও সম্ভব নয়। তা ব্যাখ্যার ব্যাপারই নয়। বিশুদ্ধ শিল্পসত্তায় সে স্বপ্রকাশ। সমস্যা তাকে নিয়ে নয়, সমস্যা আসলে পাঠকের বোধকে নিয়ে। সাহিত্য-বোধ এবং সাহিত্য-অভিজ্ঞতার ব্যাপারে সব পাঠক সমস্তরের নয়, সমস্যা এইখানে। এ-সমস্যা অনেকটা শিক্ষা-সমস্যার সমগোত্রীয়।

পরিচয়ের মতো ব্যাখ্যাও অনেক জাতের। যেমন, রচনার ভাব-সম্পদের ব্যাখ্যা, সামগ্রিকভাবে দার্শনিক ব্যাখ্যা; লেখকের জীবন-দর্শনের ব্যাখ্যা। অথবা, সাহিত্য-ইতিহাসের আলোতে ব্যাখ্যা। কিংবা টেক্‌নিকের বিশ্লেষণ: রচনার উপাদান-উপকরণ ঘটিত ব্যবহারিক সমস্যার প্রকৃতি-নিরূপণ। ভাষা-বিশ্লেষণের সাহায্যে বিচিত্র ধ্বনিপুঞ্জ এবং চিত্রসম্ভারের অন্তর্নিহিত ছন্দ বা প্যাটার্ন আবিষ্কার। অন্যথায়, রচনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তাদের পারস্পরিক সংস্থানের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

ব্যাখ্যার ক্ষেত্র প্রায় ইচ্ছামতোই বাড়ানো চলে। প্রতীক ও রূপকল্পের তাৎপর্য ব্যাখ্যা। দূরান্বিত উপমা, সুদূরপ্রসারী উল্লেখ, গূঢ় ইঙ্গিত, প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ইত্যাদির রহস্য

উদ্‌ঘাটন। অথবা, শব্দার্থতত্ত্বের সাহায্যে সহজের মধ্যে কঠিনের, পরিচিতের আড়ালে অপরিচয়ের দ্যোতনা আবিষ্কার। মিথলজির সাহায্যে, নৃতত্ত্বের আলো ফেলে, সাহিত্যের মধ্যে বিশিষ্ট জাতি-স্বভাবের প্যাটার্ন আবিষ্কার। রূপক ও সংকেতের ব্যাখ্যা, তাদের সাহায্যে রচয়িতার ভাবনা ও বেদনার ছন্দকে আয়ত্ত করার চেষ্টা। কিংবা রচয়িতার অবদমিত বাসনার সন্ধান নিয়ে তারই সূত্র ধ'রে রচনার মর্মোদ্‌ঘাটন। অথবা যাকে বলে — সামাজিক ব্যাখ্যা। পরিচয়মূলক সমালোচনার প্রসঙ্গে এদের অনেকের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বিচার প্রসঙ্গে প্রথমেই যে-কথা বলা দরকার তা হ'লো এই যে, সাহিত্যে বিচার বলতে যা বোঝায়, প্রচলিত বিচারমূলক সমালোচনার বিচার থেকে তা অনেক ব্যাপক, গভীর ও সংবেদনশীল বস্তু। রচনাটি ভালো কি মন্দ সরাসরি এই রায় দেওয়াটাই বিচার নয়। কতোখানি ভালো তার পরিমাপ করা বা কেন ভালো তার হেতু নির্ণয় করা, এ-ও বিচারের একটি ধাপ মাত্র — তার শেষ কথা নয়। প্রচলিত বিচারমূলক সমালোচনা কিন্তু অনেক সংকীর্ণ এবং অনেক যান্ত্রিক ব্যাপার। সেখানে রায় দেওয়াটাই আসল কথা। তার ভালোত্বের পরিমাপ ও হেতু-নির্ণয় অবরোহ-পদ্ধতির, তার মানদণ্ড পূর্ব-স্বীকৃত সাহিত্যিক অনুশাসন। কোথাও সে-বিচার নব্য-ক্লাসিক অনুশাসনের বিচার। কোথাও সে-বিচার সংকীর্ণ সামাজিক স্বার্থের বিচার। আবার কোথাও সে-বিচার নিতান্তই ব্যক্তিগত রুচির মানদণ্ডে বিচার। অর্থাৎ এমন সাবজেক্টিভ মানদণ্ডে, যাকে কোনো মানদণ্ডই বলা চলে না, অতএব যে-বিচার আদপেই বিচার নয়।

ব্যাখ্যা ও পরিচয় দুয়ের মধ্যেই কিছুটা সন্ধানীবৃত্তির ক্রিয়া আছে, এইটুকুই তাদের সাধারণ ভূমি। এটুকুর কথা বাদ দিলে, পরিচয়ের মেজাজে রয়েছে পুনর্গঠনের ঝোঁক, অনুসরণ বা অনুগমনের আকাঙ্ক্ষা। ক্বচিৎ পূজার আবেগ। কখনো স্বগত সৃষ্টিপ্রেরণা। কখনো-বা নির্ভেজাল আত্মরতির বাসনা। ব্যাখ্যার মেজাজটা ভিন্নরকমের। ব্যাখ্যা কখনো-কখনো পরিচয়েরই ভূমিকা বটে, কিন্তু তা ছাড়াও ব্যাখ্যার বড়ো একটা তাগিদ হ'লো সমস্যাপূরণের পরিতৃপ্তি। আর-একটা তাগিদ হ'লো শিক্ষার তাগিদ, জ্ঞানদানের আকাঙ্ক্ষা। লক্ষণীয় যে, হাল-আমলের ব্যাখ্যামূলক সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্ধর্ষ পণ্ডিতিজাতের সমালোচনা।

বিচার, পরিচয় ও ব্যাখ্যার চরিত্রগত পার্থক্য আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে যদি আমরা স্মরণ করি যে, এই তিনজাতীয় সমালোচনায় তিনটি স্বতন্ত্র যুগধর্মের প্রকাশ ঘটেছে। অল্পস্বল্প ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, প্রাচীন ইউরোপীয় সমালোচনা প্রধানত বিচার-

মূলক এবং উনবিংশ শতকের সমালোচনা প্রধানত পরিচয়মূলক। চরমপন্থী ব্যাখ্যামূলক সমালোচনা বিশেষভাবে বিংশ শতাব্দীরই সম্পত্তি।

এইবারে মূল প্রশ্নে ফিরে আসা যাক্। রবীন্দ্রনাথ এই তিনের মধ্যে একাত্মতা আবিষ্কার করলেন কি উপায়ে? একাত্মতার কথা যদি ছেড়েও দিই, এদের মধ্যে মোটামুটি একটা যোগসূত্রই বা তিনি কী ক'রে স্থাপন করলেন? অথবা, তিনি কি তত্ত্বের ক্ষেত্রেই মাত্র এদের যোগাযোগের কথা বলেছেন, না কার্যক্ষেত্রেও অর্থাৎ নিজের সমালোচনা সাহিত্যেও, এই যোগাযোগ সংসাধিত করতে পেরেছেন? এই তথ্যগত প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানই বর্তমান আলোচনার দিক থেকে আপাতত আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব।

এর উত্তর রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সমালোচনাসাহিত্যের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তাই, যতোই সংক্ষেপে হোক্ তার সবটাই আমাদের এক-নজরে একটু দেখে নেওয়া দরকার।

২.

এ-কথা সকলেরই সুবিদিত যে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যে ব্যাখ্যা পরিচয় এবং বিচার, এই তিনেরই সাক্ষাৎ মেলে। তিনি যে এদের মেজাজগত পার্থক্য সম্পর্কে একেবারেই অবহিত ছিলেন না,এমন মনে করার কারণ নেই। আসলে, এই পার্থক্যকে তিনি মোটেই আমল দেননি। এমন একটা ব্যাপকতর ও গভীরতর কিছুকে তিনি অবলম্বন করতে পেরেছিলেন যে, এই সব পার্থক্য তাঁর ক্ষেত্রে তেমন ক'রে মাথা তুলতেই পারেনি। একই প্রবন্ধে এই তিন ধারার ত্রিবেণীসংগম, এইটেই তাঁর সমালোচনাতে সব থেকে বেশি দেখতে পাওয়া যাবে।

এর মধ্যেও একটা আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রশ্ন অবশ্য থেকে যেতে পারে। তার কারণ, বাইরে থেকে দেখলে মনে হ'তে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় ব্যাখ্যারই গুরুত্ব সব থেকে বেশি। দ্বিতীয় স্থান পরিচয়ের। বিচার যেন অনেকটাই গৌণ। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই সে-ভুল ভাঙবে। দেখা যাবে, বিচার যেখানে সম্পূর্ণ নেপথ্যচারী, সেখানেও তা মোটেই গৌণ নয়।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যকে আমাদের কাজের সুবিধার দিক থেকে আমরা তিনটে কাল-পর্বে ভাগ ক'রে নিতে পারি। প্রথম পর্বে তাঁর বাল্য কৈশোর ও প্রথম যৌবনের রচনা, মোটামুটি ১৮৭৬ থেকে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ। দ্বিতীয় পর্ব তাঁর পরিণত

যৌবনকাল, প্রৌঢ়ত্বেরও কিছুদূর, ১৮৯৩ থেকে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ; 'সাধনা'-'বঙ্গদর্শন' পর্ব। এটাই তাঁর সমালোচনাসাহিত্যের ভরা ফসলের কাল। তৃতীয় পর্ব তাঁর পরিণত বয়সের রচনা নিয়ে। ইতিহাসের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ হ'লেও, বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথম পর্বের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম।

পুরোপুরি সাহিত্যসমালোচনা ব'লে গণ্য হ'তে পারে এমন রচনার সংখ্যা এ-পর্বে নিতান্তই যৎসামান্য। তার সবগুলিকেই মোটামুটি বিচারমূলক বলা যায়। তবে প্রথম রচনা "ভুবনমোহিনী প্রতিভা" ইত্যাদিতে অথবা 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর সমালোচনা দুটিতে বিচার যে-রকম স্পষ্টোচ্চারিত, অপরগুলিতে — অর্থাৎ "ডি প্রোফণ্ডিস", "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি", "বসন্ত রায়" — ঠিক তা নয়। এবং এদের মধ্যে ব্যাখ্যা ও পরিচয়ের গুরুত্বও কিছু কম নয়। কাব্যসংকলন-গ্রন্থের সমালোচনাকে যদি সাহিত্যসমালোচনা ব'লে ধরা যায় তা হ'লে "প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ"[৫] প্রবন্ধটির কথাও উল্লেখ করা যায়। এর মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে সযত্ন পাঠব্যাখ্যা, অন্যদিকে তেমনি কাব্যসংকলনের আদর্শ সম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ বিচারও স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বটি কিছু জটিল। এ-পর্বের অধিকাংশ রচনাই 'আধুনিক সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য' ও 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থ তিনটিতে স্থান পেয়েছে। প্রথম দুটি বইয়ের অধিকাংশ রচনাই এ-পর্বের আগের দিকের এবং একটি বাদে ("মেঘদূত") 'প্রাচীন সাহিত্য'-এর সমস্ত রচনাই এ-পর্বের শেষের দিকের। বিচার প্রথম দিকের রচনায় যেমন অকুণ্ঠ, শেষের দিকে ঠিক তা নয়। সেখানে পূজার আবেগই যেন মুখ্য। সেদিক থেকে গোটা পর্বটিকে মোটামুটি দুটো আলাদা পর্যায়ে ভাগ ক'রে দেওয়া যায়। কাজের সুবিধার জন্যে শেষের পর্যায়ের রচনা নিয়েই আমরা প্রথমে আলোচনা করবো।

'প্রাচীন সাহিত্য' বইটির প্রসঙ্গে একটা কথা আগেই ব'লে রাখা দরকার। এর কোনো কোনো প্রবন্ধ আদৌ সমালোচনা হিসাবে রচিত নয়, তারা গ্রন্থবিশেষের ভূমিকা বা চিত্রবিশেষের পরিচয়পত্র হিসাবে রচিত হয়েছে। যেমন, "রামায়ণ" এবং "কাদম্বরীচিত্র"।

'প্রাচীন সাহিত্য'-এর সমস্ত প্রবন্ধই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের — ও সংস্কৃতির — আলোচনা। প্রধানত তাদেরই নিয়ে, কালের বিচারে যাদের উৎকর্ষ সুপ্রমাণিত। রবীন্দ্রনাথ এখানে নতুন ক'রে রায় দিতে বসেননি, পরোক্ষভাবে কালের রায়কেই তিনি সমর্থন করেছেন। ব্যাখ্যার আকারে আপন সমর্থনের হেতুটাকে সামনে তুলে ধরেছেন, রায়টাকে নয়। এদের মধ্যে মূল্যায়নের ভূমিকা যে কোন্‌খানে তা যেন নজরেই পড়ে না। ব্যাখ্যা আর পরিচয়কেই বেশি ক'রে নজরে পড়ে।

যেটা এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষ করবার তা হ'লো এই যে, 'প্রাচীন সাহিত্য' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসন্ধানই শুধু নয়, নবীন ভারতের জন্যে পথের সন্ধানেও যে একদা তিনি অতীতের ভারতবর্ষে পদযাত্রা করেছিলেন, এর মধ্যে তার চিহ্নও সুস্পষ্ট। অতীতের ভারত এখানে তাঁর সমালোচ্য বিষয় নয়, প্রেরণার উৎস। এর প্রবন্ধগুলি প্রধানত প্রশস্তিমূলক। তার সবটাই সাহিত্যিক কৃতিত্বের প্রশস্তি নয়, অনেকখানি সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের প্রশস্তি। সেই ভাবাদর্শের কিছুটা সাহিত্যকে পরোক্ষভাবে স্পর্শ করে, কিছুটা তা-ও করে না। এইসব কারণে, 'প্রাচীন সাহিত্য'কে ষোলো-আনা সাহিত্যসমালোচনা-গ্রন্থ ব'লে গ্রহণ করা যায় না।

সাহিত্যিক প্রশস্তিও অবশ্য এর মধ্যে প্রচুর আছে। কিন্তু সে-প্রশস্তি কোনোখানেই নিষ্কারণ নয়। সকারণ প্রশস্তিকে যদি বিচার বলতে আপত্তি না-থাকে তা হ'লে 'প্রাচীন সাহিত্য'-এর প্রায় সর্বত্র ব্যাখ্যা ও পরিচয়ের সঙ্গে-সঙ্গে বিচারেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। "শকুন্তলা" কিংবা "কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা"র কথাই ধরা যাক। এখানে যে-ব্যাখ্যা তা কি সুস্পষ্ট মূল্যবোধের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে না? অথবা, "কাব্যের উপেক্ষিতা" — একে সমালোচনা বলি আর না-ই বলি, এ-কথা মানতেই হবে যে, এর মূল বক্তব্যটি গূঢ় বিচারের ভিত্তির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। এবং সে-বিচার যেমন সশ্রদ্ধ তেমনি সূক্ষ্মদর্শী, যেমন বিনীত তেমনি লক্ষ্যভেদী। যদি "কাদম্বরীচিত্র"-এর কথা ধরি, তাহ'লেও এই একই কথা। বর্ণনার প্রতি সংস্কৃত সাহিত্যের অতি-পক্ষপাত; 'মনুষ্য ও সংসারের প্রতি সেকালের সেই অপেক্ষাকৃত ঔদাসীন্য'; 'কিরীটে কুণ্ডলে কঙ্কণে কণ্ঠমালায়' রাজার মতো সজ্জিত কিন্তু 'মেদস্ফীত বিলাসীর' মতো অচল সংস্কৃত গদ্যের হাতে গল্পের দুর্গতি — এইসব প্রাসঙ্গিক মন্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, 'পূজার আবেগ' রবীন্দ্রনাথের সতর্ক সাহিত্য-বিবেককে কখনোই ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারেনি।[৬] যে-পূজা প্রাপ্য তা তিনি অকুণ্ঠচিত্তে দিয়েছেন। কিন্তু যে-পূজা প্রাপ্য নয় তা তিনি, বাণভট্ট কেন, কালিদাসকেও দেননি। সময়-বিশেষে বৃদ্ধ বাল্মীকিকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি, যদিও — গ্যেটে যেমন বলেছিলেন — 'with bended knees'।

"মেঘদূত" প্রবন্ধটি অবশ্য ভিন্ন জাতের। বাইরের দিকে তা কালিদাসের কাব্যের ভাবব্যাখ্যা। ভিতরে তাকালে দেখা যাবে, কালিদাস উপলক্ষ, স্বগত রসসৃষ্টিই আসল লক্ষ্য। এই একটি প্রবন্ধই সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম স্থানীয়। এর সঙ্গে সুরের মিল 'মানসী'র "মেঘদূত" কবিতার। এ যেন তারই কাব্য-রূপ। এর রচনাকালও 'সোনার তরী'-পর্বে "মেঘদূত" কবিতা রচনার এক বছর পরে — ১২৯৮ সালে।

এইবারে প্রথম পর্যায়ের রচনা। অর্থাৎ 'লোকসাহিত্য' এবং 'আধুনিক সাহিত্য'।

'লোকসাহিত্য'-এর তিনটি প্রবন্ধই পরিচয়-প্রধান। তবে ব্যাখ্যাও আছে। বিচার তো আছেই (পুনর্বিচার বলাই বোধকরি সংগত)। 'আধুনিক সাহিত্য'-এর বিষয়বস্তুই এমন যে তার মধ্যে ব্যাখ্যার অবকাশ কম। এরও অধিকাংশ প্রবন্ধই পরিচয়-প্রধান। কিন্তু শুধু যে বিষয়-নির্বাচনেই বিচার পরোক্ষভাবে ক্রিয়া করেছে তা নয়, পরিচয়ের ভূমিকার মধ্যেই বিচারের ক্রিয়া অনুপ্রবিষ্ট।

'আধুনিক সাহিত্য'-এ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পাঁচটি: একদিকে "বঙ্কিমচন্দ্র", "বিহারীলাল" ও "সঞ্জীবচন্দ্র" অন্যদিকে "কৃষ্ণচরিত্র" এবং "রাজসিংহ"। প্রথমোক্ত তিনটি প্রবন্ধই বাহ্যত লেখক-পরিচিতি। সুতরাং, বলা বাহুল্য, তিনটিই পরিচয়-প্রধান। কিন্তু মূল্যায়ন তিনটিতেই ক্রিয়াশীল। তার মধ্যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকৃতি যেহেতু পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না, ব্যাখ্যাও যেহেতু এ-ক্ষেত্রে অনাবশ্যক, সেইহেতু রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিক মূল্যায়নের উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। "বিহারীলাল" প্রবন্ধে কিছু ভাবব্যাখ্যা এবং কিছু টেক্‌নিকগত আলোচনাও স্থান পেয়েছে।

টেক্‌নিকগত কিংবা গঠনগত আলোচনা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যে খুব বেশি নেই। সেইজন্যে এই প্রসঙ্গে "ফুলজানি" ও "যুগান্তর" এ দুটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা দরকার। উক্ত প্রবন্ধদুটিতে, আলোচিত উপন্যাসদুটির গঠনগত ত্রুটি সম্পর্কে, তাদের উভয়েরই এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের সামঞ্জস্যের অভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে-যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন তার মধ্যে মূল্যের নির্দেশ অনতিপ্রচ্ছন্ন। প্রসঙ্গত "কঙ্কাবতী"র [৭] কথাও স্মরণ করা যায়। 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসখানির প্রথম অংশের সঙ্গে পরবর্তী অংশের সংগতি-অসংগতির প্রশ্ন নিয়ে, তার বাস্তব-অংশের সঙ্গে পরবর্তী রূপকথা-অংশের জোড়-মেলানো নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিপুণ বিচার-বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যবিচার মোটেই বিশ্লেষণ নয়, শুধুই ব্যাখ্যা— রবীন্দ্রনাথের নিজের সমালোচনাসাহিত্যে কিন্তু তাঁর এইধরনের উক্তির খুব জোরালো সমর্থন আমরা খুঁজে পাবো না। বরং কিছু প্রতিবাদই নজরে পড়বে। তার কারণ, বিশ্লেষণ ও বিচার অচ্ছেদ্য। অবশ্য শুধু বিশ্লেষণ নয়, সংশ্লেষণও।

বিচার-বিশ্লেষণ "কৃষ্ণচরিত্র"-এ যেমন প্রখর এমন বোধকরি আর কোনো প্রবন্ধেই নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে যুগপৎ এমন মুগ্ধ উদ্‌বেজিত ও বিচলিত করেছিলো, এর বিষয়বস্তুর মহত্ত্ব এবং তার উপস্থাপনার দুঃসাহসিকতা রবীন্দ্রনাথের বোধ বুদ্ধি ও বিবেককে এমন এক সানন্দ দ্বৈরথে আহ্বান করেছিলো

যে, সমস্ত গৌণ বিবেচনাকে উপেক্ষা ক'রে রবীন্দ্রনাথ এখানে গোড়া থেকেই সমালোচকের মুখ্যতম দায়িত্বটি বেছে নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। সমালোচ্য বিষয়টি সাহিত্য নয়, রবীন্দ্রনাথের এ-সমালোচনাও সাহিত্যসমালোচনা নয়। কিন্তু মূল্যায়ন যে কতো সংবেদনশীল হ'তে পারে এবং অপর পক্ষে, শ্রদ্ধা যে কতো নির্মোহ হ'তে পারে, তা এই প্রবন্ধটি এবং এর সঙ্গে "বঙ্কিমচন্দ্র" মিলিয়ে পড়লেই আমরা বুঝতে পারবো। তাঁর সাহিত্যসমালোচনাতেও আমরা সব সময় এই শ্রদ্ধা ও সংবেদনশীলতার পরিচয় পাই। উপরন্তু সমবৃত্তিকের সৌজন্য ও বিনয়, এবং কাউকে আহত না-করবার সতত-সচেষ্টতা সেখানে বিচারের কাঠিন্যের চারপাশে একটি পুরু ভেলভেটের আস্তরণ রচনা ক'রে রেখেছে।

"রাজসিংহ" প্রবন্ধটি অনেক দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। এর ব্যাখ্যাংশের মধ্যে রূপ ও সত্যের, অথবা বলি, ফর্ম ও কন্টেন্টের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর যে-আলোকপাতের প্রয়াস দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যে তা দুর্লভ বস্তু। এই সূত্রে, শিল্পরূপের উপর আঙ্গিকের প্রভাব; অথবা উল্টো ক'রে বললেই বোধকরি ঠিক বলা হয়, শিল্পরূপের প্রয়োজনে আঙ্গিকের নির্বাচন — এই রহস্যের উপরেও হয়তো কিছুটা আলো এসে পড়েছে। উপন্যাসখানির শ্রেণীগত পরিচয়কেও রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা করেননি (যদিও সাধারণত তিনি শ্রেণীগত পরিচয়ে মোটেই আস্থাশীল নন)। রসবিচারের ক্ষেত্রে এর 'ঐতিহাসিক রস'-এর দিকটাতেই তিনি বেশি জোর দিয়েছেন বলা যায়। লেখকের মনস্তত্ত্বের দিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি। এমন-কি, পাঠকের মনস্তত্ত্বও বাদ যায়নি।

"কৃষ্ণচরিত্র" যদি প্রীতিপূর্ণ দ্বৈরথ হয়, "রাজসিংহ" তা হ'লে আনন্দিত অভ্যর্থনা, পুলকিত করমর্দন। উভয়ত্রই মূল্যবোধ সক্রিয়। "রাজসিংহ" প্রবন্ধটিতে পরিচয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ তত্ত্বালোচনা — সমস্তই একটি ব্যাপক ও গভীর প্রাপ্তি-চেতনার মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত। সমালোচনাতত্ত্বের দিক থেকে এই প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্রনাথের 'সমন্বিত সমালোচনা'র একটি বিশিষ্ট নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

সমন্বয়ের ভিত্তির কথা পরে আসবে, কিন্তু সমন্বয়ের আদর্শই যে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার তত্ত্বগত আদর্শ, এর পরে তাতে বোধকরি আর সন্দেহ করা যায় না।[৮]

৩

আমাদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসার উত্তরের জন্য আর বেশি দূর অগ্রসর না-হ'লেও চলতে পারে। তবু, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যের তৃতীয় পর্বটিকে যদি বাদ দিই,

তা হ'লে আমাদের অনুসন্ধান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সমালোচক রবীন্দ্রনাথের পরিণত সাহিত্যচিন্তার চেহারাটা যে বরং এইখানেই স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাওয়া যাবে এমন আশা করাটা অন্যায় নয়।

অথচ তাঁর সমালোচনাসাহিত্যে এ-পর্বটা যেন নিতান্তই একটা পরিশিষ্ট। বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে তাঁর সমালোচক-জীবন 'সাধনা'-'বঙ্গদর্শন'-পর্বের পরিসমাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হয়েছে। সমালোচনা-প্রবন্ধ বলতে যা বোঝায় — সমালোচনা যেখানে মাত্র প্রসঙ্গসূত্রে আগন্তুক নয়, সমালোচনাই যেখানে মূল লক্ষ্য — সেইরকম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যসমালোচনার প্রবন্ধ বোধকরি রবীন্দ্রনাথ এ-পর্বে একটিও রচনা করেননি।

তা না-করলেও, নানাবিধ প্রসঙ্গসূত্রে — বিশেষ ক'রে সাহিত্যতত্ত্বের প্রসঙ্গে — অনেক সময়েই তাঁকে এমন-সব আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'তে হয়েছে যাকে খাঁটি সাহিত্য-সমালোচনা ব'লে গণ্য না-করার হেতু নেই। আলাদা ক'রে তারা যতোই স্বল্পায়তন বা অসম্পূর্ণ হোক্-না কেন, এই জাতীয় প্রাসঙ্গিক সমালোচনার সামগ্রিক পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। অবশ্য শুধু পরিমাণের প্রশ্নই নয়, চিন্তার পরিণতির কথাও এখানে বিশেষ বিবেচনার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের রসগ্রাহিতা এবং মননশীলতা যে এ-পর্বে কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি, বরং তাঁর সাহিত্য-বিবেক যে আরো প্রখরভাবে সচেতন হ'য়ে উঠেছে, এগুলির মধ্যে তার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। সরকারীভাবে সমালোচকের ভূমিকা পরিহার করার ফলে কিঞ্চিৎ ভারমুক্ত হ'য়ে তাঁর মতামত যেন আরো ঋজু, আরো অকুণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছে।

এইসব খণ্ড ছিন্ন প্রাসঙ্গিক সমালোচনা ছাড়া এ-পর্বে আরো দু-জাতের 'সাহিত্য-সমালোচনার' সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

ভিতর ও বাইরের নানারকম তাগিদে অনেক সময় রবীন্দ্রনাথকে নিজের বিভিন্ন রচনার ব্যাখ্যা করার ভারও নিতে হয়েছে। এর অধিকাংশই তত্ত্বব্যাখ্যা। কিছু-কিছু পাঠকের প্রশ্নের উত্তর। কিছু-কিছু পঠন-পাঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে আমরা যে-রবীন্দ্রনাথকে পাই, বেশিরভাগ সময়ই তিনি তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ, সমালোচক রবীন্দ্রনাথ নন।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রন্থের "সূচনা" বা ভূমিকা বরং আমাদের সন্ধানের দিক থেকে অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। পূর্বোক্ত প্রাসঙ্গিক সমালোচনা-খণ্ডগুলির সম্পর্কে বিবেচনা আপাতত স্থগিত রেখে আমরা এই গ্রন্থ-সূচনাগুলির দিকেই প্রথম দৃষ্টি দিতে চাই।

বলা বাহুল্য, এগুলি গ্রন্থ-সূচনাই। এদের কাছে খুব বেশি দাবি করলে ভুল হবে। সংক্ষেপে রচনার পটভূমি দেওয়া হয়েছে; কখনো-বা প্রায় সূত্রাকারে দু-একটি প্রধান বিশেষত্বের কথা বলা হয়েছে, ক্বচিৎ একটু-আধটু ব্যাখ্যাও স্থান পেয়েছে। গ্রন্থের সাক্ষাৎ পরিচয় তো গ্রন্থ-মধ্যেই আছে, সূচনা-অংশে অল্প-স্বল্প তার আভাসও হয়তো কিছু মিলবে। আর মূল্যায়ন? নিজের রচনা, সুতরাং স্বভাবতই এটা মূল্যায়নের ক্ষেত্র নয়। 'নৌকাডুবি'র গ্রন্থ-সূচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন:

"পাঠক যে-ভার নিলে সংগত হয় লেখকের প্রতি সে-ভার দেওয়া চলে না। নিজের রচনা উপলক্ষে আত্ম-বিশ্লেষণ শোভন হয় না। তাকে অন্যায় বলা যায় এই জন্যে যে, নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাবে এ কাজ করা অসম্ভব — এইজন্য নিষ্কাম বিচারের লাইন ঠিক থাকে না।"

বোঝা গেলো, রবীন্দ্রনাথের মতে, সমালোচনা হ'লো খাঁটি পাঠকের তরফ থেকে সাহিত্যের 'নিষ্কাম বিচার', এবং সেই কারণে তা অন্তত কিছু পরিমাণে 'নৈর্ব্যক্তিক' হওয়া দরকার। এখানে তা শোভনও নয়, সম্ভবও নয়। অতএব এই 'সূচনা'গুলিকে আমরা পুরোপুরি সমালোচনা ব'লে গণ্য করতে পারি না।

কিন্তু আদৌ সমালোচনা নয়, এমন কথা বললে ভুল বলা হবে। অশোভনতার প্রশ্ন যেখানে ওঠে না, 'নিষ্কাম বিচার' যেখানে নিজের অনুকূলে যায় না, সেখানে মাঝে-মাঝেই আমরা অতি কঠোর (বোধহয় অতিরিক্ত কঠোর) এক বিচারকের সাক্ষাৎ পাই। বিভিন্ন কাব্য নাটক ও উপন্যাসে "সূচনা" থেকে এর কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। বোঝা যাবে যে, সমালোচক রবীন্দ্রনাথ সৌজন্য ইত্যাদির কারণে অপরের ক্ষেত্রে যা করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন, নিজের ক্ষেত্রে সুযোগ পেয়ে তা যেন সুদ সমেত উশুল ক'রে নিয়েছেন।

'প্রভাত-সংগীত' সম্পর্কে:

"মনের ভাবগুলো নূতনত্বের আবেগ নিয়ে রূপ ধরতে চাচ্ছে কিন্তু যে উপাদানে তাদেরকে শরীরের বাঁধন দিতে পারত তারই অবস্থা তখন তরল,...ওরা মূর্ত হয়ে ওঠে নি সুতরাং কাব্যের পদবীতে পৌঁছতে পারে নি।"

'ছবি ও গান' সম্পর্কে:

"মোটের উপরে অক্ষম ভাষার ব্যাকুলতায় সবগুলিতেই বানানো ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সহজ হয় নি।"

'রাজা ও রাণী' সম্পর্কে:

"এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ

হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয় রকমের অসংগত।"

পূর্বে 'তপতী'র ভূমিকায় (১৯২৯) 'রাজা ও রানী' সম্পর্কে বলেছেন :

"কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্থ ও দ্বিধা-বিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার-উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে — এই মৃত্যু আখ্যানধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।"

'বউঠাকুরানীর হাট' :

"চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। তারা আপন চরিত্রবলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, ...।"

'নৌকাডুবি' :

"এর চরম সাইকলজির প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, স্বামী'র সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে-সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কি না যাতে অজ্ঞানতাজনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে।...বন্ধনটা এবং সংস্কারটা দুই সমান দৃঢ় হয়ে যদি নারীর মনে শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষের অস্ত্র-চালাচালি চলত তা হলে গল্পের নাটকীয়তা হতে পারত সুতীব্র, মনে চিরকালের মতো দেগে দিত তার ট্র্যাজিক শোচনীয়তার ক্ষতচিহ্ন। ...এই কারণে বিচারক যদি রচয়িতাকে অপরাধী করেন আমি উত্তর দেব না।"

উদ্ধৃতিগুলির যৌক্তিকতা এখানে আমাদের আলোচ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বিবেক যে সতত-সক্রিয়, এইটেই আমাদের প্রধান লক্ষণীয় বিষয়।

৪.

আমাদের প্রশ্ন এখন আর এ নয় যে, ব্যাখ্যা পরিচয় আর বিচার — সমালোচনায় এরা আদৌ সমন্বিত হ'তে পারে কি না। পারে যে, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য। কোন্ সাধারণ ভিত্তির উপর রবীন্দ্রনাথ এই ত্রিমুখী বৃত্তিত্রয়ের মিলন ঘটিয়েছেন, তা-ও আমরা দেখেছি। সে হ'লো, পাঠকের সাহিত্য-চেতনা ; সাহিত্য-সাক্ষাৎকারের ফলে পাঠকের যে সামগ্রিক প্রাপ্তি, সেই প্রাপ্তির মূল্য সম্পর্কে পাঠকের সচেতনতা।

প্রশ্ন এখন কিঞ্চিৎ তত্ত্বঘটিত। ওই সামগ্রিক প্রাপ্তি কথাটাকে নিয়েই প্রশ্ন। সামগ্রিক প্রাপ্তিটা সামগ্রিক ব'লেই তার মধ্যে স্তরভেদ অপরিহার্য। স্তরগুলিও সবকটিই তুল্যমূল্য নয়। সামগ্রিক প্রাপ্তির মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য কোন্‌টা?

নিশ্চয়ই রসাস্বাদন? — অর্থাৎ কিনা খাঁটি ইস্থেটিক সম্ভোগ? সাহিত্য-সাক্ষাৎকার-সঞ্জাত উপলব্ধিই যখন সমালোচনার একমাত্র আশ্রয়, এবং সেই উপলব্ধিতে রসাস্বাদন ব্যাপারটাই যখন মুখ্য, তখন বিশুদ্ধ আস্বাদনই তো সমালোচনার একমাত্র উপজীব্য হওয়ার কথা? কিন্তু আস্বাদন আর মূল্যায়ন তো মোটেই এক কথা নয়? এ-কথা যদি মানি, তা হ'লে সমালোচনাতে মূল্যায়ন বা বিচারের ভূমিকাই তো গৌণ হবার কথা? বিচার নয়, বরং আস্বাদনই তো সমালোচনাতে সর্বত্র-পরিব্যাপ্ত? রবীন্দ্রনাথ কি রসাস্বাদনের গুরুত্ব সম্যক্‌ অনুধাবন করতে পারেননি? নতুবা তিনি নৈর্ব্যক্তিক' হবার কথা বলবেন কেন, 'নিষ্কাম বিচারের লাইন ঠিক' রাখার উপর এমন জোর দেবেন কেন?

এ-প্রশ্নের মধ্যে কিছুটা যেমন সত্য আছে, অনেকখানি ভ্রান্তিও তেমনি লুকিয়ে আছে। এর সদুত্তর পেতে হ'লে রসাস্বাদন ব্যাপারটাকে একটু ভালো ক'রে বুঝে দেখতে হবে।

এ-কথা ঠিক যে, সাহিত্য-সাক্ষাৎকারের প্রতিক্রিয়াসমূহের মধ্যে রসাস্বাদনই সর্বাগ্রগণ্য। রসাস্বাদন না-ঘটলে সমালোচনার জন্ম অসম্ভব। আবার এ-কথাও মানতে হবে যে, রসাস্বাদন ঘটলে মনের মধ্যে কোনো-না-কোনোরকম সমালোচনা — তা প্রকাশ্য হোক্‌, প্রচ্ছন্ন হোক্‌, অবচেতন হোক্‌, স্তিমিত বা প্রখর, সুবিন্যস্ত বা অবিন্যস্ত, যে-রকমই হোক্‌-না কেন — কিছু-না-কিছু সমালোচনা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু রসাস্বাদন নিজেই সমালোচনা নয়, সমালোচনাও নিজেই রসাস্বাদন নয়। রসাস্বাদন সমালোচনার অবলম্বন বটে, কিন্তু উপজীব্য নয়। অবলম্বন মাত্র এই অর্থেই যে, তা সমালোচনার উদ্‌বেজক, সমালোচনার অপরিহার্য পূর্ব-শর্ত, সমালোচনার আগাগোড়াই তার ক্রিয়া অব্যাহত। পাঠকের মনোভূমি থেকে রসাস্বাদন সম্পূর্ণ অপসারিত হ'লে পাঠক আর খাঁটি পাঠক থাকেন না। তখন যে-সমালোচনা সম্ভব, তার প্রবর্তনা বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বৃত্তির দ্বারা। তা সাহিত্যিক সমালোচনা নয়। অর্থাৎ সাহিত্যসমালোচনা নয়।

কিন্তু রসাস্বাদনকেই উপস্থাপিত করা — এটা সমালোচনার লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হওয়া সম্ভবও নয়। কেন সম্ভব নয়, সেই কথাটা এখানে একটু পরিষ্কার ক'রে দেওয়া দরকার।

চলতি কথায় আমরা যাকে 'ভালো-লাগা' বলি, সেটা একটা ঢিলে-ঢালা মিশ্র ধরনের ব্যাপার। তার মধ্যে অনেক বাইরের উপাদান, অনেক ব্যক্তিগত অবাস্তর বিবেচনা, অনেক খাদ অনেক ভেজাল মিলে-মিশে থাকতে পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ রসাস্বাদন — নান্দনিক সম্ভোগ, পাশ্চাত্য শিল্পশাস্ত্রীরা যাকে বলেছেন 'ইস্থেটিক কন্‌টেম্‌প্লেশন' — তা মোটেই এ-রকম ঢিলে-ঢালা ব্যাপার নয়। সে এমন এক তীব্র রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতা, এমন একটা বিদ্যুৎ-উদ্‌ভাসের মতো প্রজ্বলন্ত ব্যাপার, ভাষার মাধ্যমে যার সশরীরী উপস্থাপন সম্পূর্ণ অসম্ভব। (হয়তো বাইরের দিক থেকে তার বর্ণনা কিছু পরিমাণে সম্ভব, কিন্তু তা নিয়েও প্রচুর মতভেদ আছে।)

ব্যাপারটা জ্ঞানাত্মক, কি বাসনাত্মক, কি বেদনাত্মক, কিংবা এই তিনের সম্মিলিত উপলব্ধি, অথবা কি এই তিনের অতিরিক্ত এক অনন্য অভিজ্ঞতা, তা নির্ণয় করা সহজ নয়। এ-বিষয়ে তত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যেও মতের মিল নেই। সমালোচনায় যে বিশেষ ধরনের আত্মসচেতনতা এবং যে-রকম ব্যাপক বস্তু-সচেতনতা অপরিহার্য, রসাস্বাদনের স্তরে তার অবকাশ কতোটুকু সেইটেই প্রশ্ন।

ভারতীয় রসশাস্ত্রীদের বর্ণনায়, এ যেন এক তুঙ্গস্পর্শী আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। আস্বাদনই এর তন্মাত্র। আস্বাদনের মধ্যে দ্বিতীয় কোনো-কিছুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। শুধু যে রস আর তার আস্বাদনই অভিন্ন তা নয়, আস্বাদনের প্রচণ্ড রাসায়নিক পাকে রসের অবলম্বন এবং রসের আস্বাদক (অর্থাৎ সাহিত্যবস্তু এবং তার পাঠক), এরাও সম্পূর্ণ দ্রবীভূত, আস্বাদন-ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চিহ্ন। এ হ'লো দর্শন-পরিভাষায় যাকে বলা যেতে পারে, কেবলাস্বাদন। অথবা, কেবলানন্দও বলতে পারি। অর্থাৎ ছোটোখাটো স্কেলে — ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জাতীয় ব্যাপার।

রসাস্বাদন যদি এইরকম জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ত্বভেদরহিত, এইরকম নির্বিকল্প সমাধি-জাতীয় ব্যাপার হয়, অথবা যদি এর কাছাকাছি কিছু-একটাও হয়, তা হ'লে এ-স্তরে পাঠকের স্বকীয় বা বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তার কারণ পাঠক এখানে আপন পাঠকত্ব বিষয়ে সচেতনই নন। পাঠক এখনো তাঁর পাঠকত্ব-ভূমিকায় অধিষ্ঠিতই নন।

রসের প্রসঙ্গে রূপের কথাও অবশ্য উঠতে পারে। কখন রস-তন্ময়তাকে আড়াল ক'রে রূপ-তন্ময়তা জেগে ওঠে, কিংবা রূপ-চেতনা বরাবরই রস-চেতনার সহগামী কিনা, অথবা বরাবরই তার সমান্তরাল কিনা, এ-সব প্রশ্ন নন্দনতত্ত্বের অন্তর্গত।[৯] রস-চেতনা ও রূপ-চেতনার ভেদ বা অভেদ অথবা অচিন্ত্যভেদাভেদ আমাদের আলোচনার পক্ষে দরকারি নয়। আমাদের পক্ষে যা দরকারি তা হ'লো এই যে,

রস — যাকে ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রীরা বলেছেন অলৌকিক, তা — যেমন সমালোচ্য নয়, তেমনি, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ সৌন্দর্যধ্যান — যাকে পাশ্চাত্য শিল্পশাস্ত্রীরা বলেছেন 'ইস্থেটিক কন্‌টেম্‌প্লেশন', যে-সম্পর্কে একটু আগেই উল্লেখ করেছি তা-ও তেমনি সমালোচ্য বিষয় নয়। বিশুদ্ধ নান্দনিক চেতনা, তা রূপ বা রস যারই হোক্, মূলত একই। কেননা দুই-ই আস্বাদনধর্মী।[১০] সমালোচনাবুদ্ধির জাগরণের পূর্বগামী।

কিন্তু কোনো অভিজ্ঞতারই শাণিত সূক্ষ্মাগ্রে মানুষ বেশিক্ষণ অটল থাকতে পারে না। এ-কথা নান্দনিক অভিজ্ঞতার সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। হয়তো-বা বেশি ক'রেই প্রযোজ্য। শুদ্ধ অভিজ্ঞতার সেই তনুবাত-শিখরে সীমিত-শক্তি এবং বিমিশ্র-চরিত্র মানুষ কতোক্ষণ অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে ?

অমানুষিক বিশুদ্ধি আমাদের স্বভাবধর্মেরই বিরোধী। বিশুদ্ধ আস্বাদন কেবল তীব্র ব'লেই যে ক্ষণস্থায়ী তা নয়, তার সহযোগী শক্তিরাও তার একচ্ছত্র আধিপত্য সহ্য করে না, ক্ষেত্র-বিশেষে তারাও তার প্রতিযোগী হ'য়ে দাঁড়ায়। সাহিত্য-সাক্ষাৎকার যে-মনের সঙ্গে ঘটলো, সে তো ফাঁকা মাঠ নয়, কেবলমাত্র কতকগুলি 'ভাব'-এর আধার, তা-ও নয়। সে এক বিশাল মনোব্রহ্মাণ্ড। নিজের শিক্ষা-দীক্ষা, অভ্যাস-অভিজ্ঞতা ও রুচি-প্রবণতা নিয়ে সে-ও তো একটা বিরাট প্রস্তুতির ক্ষেত্র রচনা ক'রে রেখেছে ; অনেক অনুরাগ ও অনেক বিরাগের জটিল জনতা নিয়ে সে-ও তো উদ্যত হ'য়ে আছে। এই-যে প্রস্তুতি, তা রসাস্বাদনেরই সহায়, হয়তো তার অপরিহার্য শর্ত (ক্বচিৎ অবশ্য কিঞ্চিৎ বিঘ্নও হ'য়ে দাঁড়াতে পারে বটে)। কিন্তু এরও একটা সুদীর্ঘ জীবন আছে, নিজস্ব চরিত্র আছে, স্বাধীন সত্তা আছে। নিজের সম্পূর্ণ আত্ম-বিসর্জন সে কখনো সানন্দে স্বীকার ক'রে নেয় না। রসাস্বাদনের তুঙ্গ মুহূর্তে তার ক্রিয়াশীলতা হয়তো স্তম্ভিত থাকে। কিন্তু এ-ও ঠিক যে, উপনিষদ্-বর্ণিত দুই পাখির মতো মানুষের একটা সত্তা যখন আস্বাদন করে, অপর একটি আপাত-মুহ্যমান সত্তা তাকে নিরীক্ষণও করে।

ক্রমে এই আপাত-নিষ্ক্রিয় আর মাত্র নিরীক্ষণকারীই থাকে না। রসাস্বাদনের প্রসাদে তার চরিত্রের মৌলিক রূপান্তর ঘটে, রসাস্বাদনের প্রসাদেই তার মধ্যে নতুন সক্রিয়তার সঞ্চার হয়। রসাস্বাদনকে সে বিস্মৃত হয় না। রসাস্বাদনকে অবলম্বন ক'রেই তার অগ্রগতি এবং তার কাজের পরিসমাপ্তি। কিন্তু তার কাজটা রসাস্বাদন নয়, রসাস্বাদনের বর্ণনাও নয়। কাজটা বিষয়-আশ্রিত, বিষয়-চেতনার সঙ্গে সংবদ্ধ। তা বিশুদ্ধ আস্বাদন-ধর্মী নয়, অনেকখানি পরিমাণে মননধর্মী।

এখন আর পাঠকচিত্ত নির্বিশেষ আনন্দেই মগ্ন নয়। সেই আনন্দের হেতু, পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও এখন সে সচেতন। এখন আর সে শুদ্ধ রূপ-ধ্যানেই সমাহিত নয়। রূপের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে — রূপের সত্যতা সম্পর্কেও — এখন সে সজাগ। অর্থাৎ সাহিত্য-সাক্ষাৎকারের অভিজ্ঞতা এখন কেবল ধ্যানলোকেই বিরাজিত নয়, সে এখন পর্যবেক্ষণের ভূমিতেও নিজেকে প্রসারিত ক'রে দিয়েছে। এইখানেই আমরা আপন-পাঠকত্বে-অধিষ্ঠিত পাঠকের বিশিষ্ট ভূমিকার প্রথম সাক্ষাৎ পেলাম। সমালোচনার সূচনা এইখান থেকেই।

রসাস্বাদন নয়, রসাস্বাদনের প্রান্তদেশেই সমালোচনার ঊর্ধ্বতম সীমা। ঊর্ধ্বতম সীমানাতেও সমালোচনা ষোলো-আনা নান্দনিক ব্যাপার নয়। তা না-হোক্, কিন্তু ষোলো-আনা নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ ক'রেই যাত্রা শুরু, এবং এই অভিজ্ঞতাকে (বা তার স্মৃতিকে) বরাবরই সে নিজের মধ্যে লালন ক'রে চলে। তাই প্রত্যক্ষ জীবনের ব্যবহারিক দায়-দাবির সঙ্গে একটা নিশ্চিত ব্যবধান তার স্বভাবে বরাবরই রক্ষিত থাকে। এই-যে দূরত্ববোধ, এর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে, কিন্তু এর সম্পূর্ণ-বিলুপ্তি অর্থই হ'লো, পাঠকের পাঠকত্ব-ভূমিকার অবসান। যতোদূর পর্যন্ত এই ব্যবধানের প্রভাব কিছু-পরিমাণেও পাঠকের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অনুভব করা যাবে ততোদূর পর্যন্তই সেই প্রতিক্রিয়া সাহিত্যিক প্রতিক্রিয়া। যেখানে এসে এই ব্যবধান সম্পূর্ণ ঘুচে যায়, সেইখানেই সমালোচনার নিম্নতম সীমা। এই সীমার বাইরে সাহিত্যের যে-কোনো আলোচনাই অ-সাহিত্যিক আলোচনা। তা সাহিত্য-সমালোচনা নয়।

৫.

ব্যক্তিগত ভালো-লাগা অনেক সময় আমাদের উপলব্ধিকে ছোটো একটা গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখে, ভালো-লাগার সম্পূর্ণ চেহারাটা দেখতে দেয় না। ব্যক্তিগত ভালো-লাগার অর্থই হ'লো ব্যক্তিগত কারণে ভালো-লাগা। অর্থাৎ শিল্পগত কারণে নয়, আপেক্ষিক ও আপতিক কারণে ভালো-লাগা। ভালো-লাগার ব্যক্তি-অতিরিক্ত কারণকে ব্যাক্তিগত আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখলে ভালোত্বের বিশুদ্ধ আস্বাদটা টের পাওয়া যায় না। রসাস্বাদন এই আবরণ ভেঙে দেয়।

ভালো-লাগার পূর্ণ রূপটি দেখতে পেলে তখন ভালো-লাগার কারণ সম্পর্কেও চেতনা জন্মে, সেই কারণ বা কারণ-সমাহার থেকে ব্যক্তিগত উপাদানগুলি খ'সে যায়। ভালো-লাগার ব্যক্তি-অতিরিক্ত রূপটি মনের পটে উদ্‌ভাসিত হয়। 'লেখাটি আমার

ভালো লেগেছে' — চেতনার এই স্তর থেকে পাঠক তখন 'লেখাটি ভালো এবং এই এই কারণে ভালো' — এই স্তরে উপনীত হন। এরই নাম বিচারশীলতা। এরই সক্রিয় সহযোগিতায় ব্যক্তিগত পাঠক প্রতিনিধিস্থানীয় পাঠকে, সর্বজনীন পাঠকে পরিণত হন।

মূল্যায়ন একটা হঠাৎ-ঘটা ব্যাপার নয়, কোনো দিব্য আবির্ভাবের মতো চকিত উদ্ভাস নয়। মূল্যায়ন মোটেই অব্যবস্থিত ঘটনা নয়, এ একটা জীবন্ত প্রক্রিয়া। রসাস্বাদন নিজেই মূল্যায়ন-প্রক্রিয়াকে সতত-উদ্বেজিত ক'রে রাখে। এই সতত-সক্রিয়তাই সাহিত্যপাঠককে নানা ঘাট ঘুরিয়ে শেষ পর্যন্ত সেইখানে পৌঁছে দেয় যেখানে তার উপলব্ধির পরিপূর্ণতা।

চরিত্রের দিক থেকে রসাস্বাদন ব্যাপারটা যে-রকমই হোক্-না কেন, ঘটনা হিসাবে সে-ও কোনো আকাশ-থেকে-পড়া আকস্মিক আবির্ভাব নয়; তার জন্যও একটা বহুশর্তসাপেক্ষ ভূমিকা রচনার প্রয়োজন হয়। সাহিত্যপাঠ ব্যাপারটাই তো একটা জটিল ও জীবন্ত প্রক্রিয়া। তাছাড়া, এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে, সাহিত্য-বস্তু নিজেও নানা জটিলতার সমন্বয়, তারও শিকড় নানা ভূমিতে প্রোথিত, ডালপালা নানা আকাশে প্রসারিত। সেই কারণে, তার সামগ্রিক মূল্য সম্পর্কে আমাদের চেতনাও তেমনি স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠতে থাকে। এই চেতনা কোথায় কতোদূর পর্যন্ত যেতে পারে আগে থেকে তার নির্দেশ দেওয়া যায় না। এই মূল্যায়ন-প্রক্রিয়া যেখানে যতোদূর পর্যন্ত পৌঁছয়, সমালোচনাও ততোদূর গিয়ে পৌঁছতে পারে। ততোদূর পর্যন্তই তার দায়িত্ব। তার কম গেলে অসম্পূর্ণতা। কিন্তু তার বেশি গেলে আত্মনাশী পরধর্ম।

এই বন্ধুর বিসর্পিল স্বল্পালোকিত পথে অনেক প্রতিবন্ধক ডিঙিয়ে, অনেক সমস্যার সমাধান ক'রে ক'রে, তবে সমালোচনাকে অগ্রসর হ'তে হয়। তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়, তত্ত্বের কাছে আলোক ভিক্ষা করতে হয়, সন্ধানীর ভূমিকায় নামতে হয় — এতে তার স্বধর্মচ্যুতি ঘটে না। এবং এইখানেই পরিচয়ের দাবি, ব্যাখ্যার অধিকার।

সাহিত্যের উপাদান একদিকে যেমন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি, অন্যদিকে তেমনি ভাষা। এর কোনোটাই জটিলতা-বর্জিত নয়, কোনোটাই বশংবদ আজ্ঞাবহ নয়। সাহিত্যবস্তুর সংগঠনের মধ্যে অনেক সমস্যা ও অনেক সমস্যাপূরণ, অনেক যুদ্ধ ও অনেক যুদ্ধজয়ের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকে। সেইসব ক্ষেত্রে, মূল্যবোধের তাগিদেই সমালোচনাকে নির্মিতি-ঘটিত বিবিধ সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। সেই কারণে,

তারা মূল্যায়নেরই অঙ্গ ব'লে গণ্য হ'তে পারে। তাগিদটা কার, প্রয়োজনটা কিসের, সেটাই এখানে আসল কথা। মূল্যায়নের প্রয়োজনেই যেখানে ব্যাখ্যা বা পরিচয়ের জন্ম, সেখানে তা সমালোচনার অপরিহার্য অঙ্গ, এবং বিচারের সঙ্গে তা জন্মাবধিই সমন্বিত।

কিন্তু যেখানে তারা স্বাধীন বৃত্তি হিসাবে জন্মলাভ করে অথবা স্বাধীন বৃত্তি হিসাবে বেড়ে উঠবার সুযোগ পায়, সেখানে মূল্যায়নের সঙ্গে তাদের অন্তরের যোগ ঘটতে পারে না। সেখানে ব্যাখ্যা ও পরিচয় উভয়েরই ভূমিকা বিজ্ঞানীর ভূমিকা, কৌতূহলীর ভূমিকা, এমন-কি কখনো-কখনো গোয়েন্দার ভূমিকা। অথবা, ব্যাখ্যা মানে শিক্ষকতা। আর পরিচয় হ'লো অনুগমন। ক্ষেত্র-বিশেষে বিশুদ্ধ আত্ম-কণ্ডূয়ন এইরকম স্বাধিকারপ্রমত্ত ব্যাখ্যামূলক বা পরিচয়মূলক সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই অ-সাহিত্যের ভূমিতে পা দিয়ে দাঁড়ায়। যেমন সাম্প্রতিককালের 'বৈজ্ঞানিক সমালোচনা' — নিছক তথ্য-আশ্রিত সাহিত্য-ব্যাখ্যা, অথবা একান্তভাবে ইতিহাস-নির্ভর সাহিত্য পরিচয়।[১১] নিজ নিজ ক্ষেত্রে এদের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য-স্বীকার্য। এরা মূল্যবান সাহিত্য-আলোচনা। কিন্তু সমালোচনা নয়।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা বা পরিচয় কোনোটাই স্বাধিকারপ্রমত্ত নয়। বিচারও খণ্ডিত-দৃষ্টির বিচার নয়। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের উদারপন্থী সমালোচনায় একাধিক বৃত্তির দান এমন অনায়াসে সমন্বিত হ'তে পেয়েছে।

এই যে তত্ত্বগত ব্যাপকতা বা স্থিতিস্থাপকতা, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু সমালোচনার মৌল ঐক্যে তাঁর অনাস্থা প্রমাণ করে না। বরং ঠিক তার উল্টো। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, মতবাদের ক্ষেত্রে না-হ'লেও, কার্যক্ষেত্রে পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ সমালোচকই অল্পবিস্তর উদারপন্থী। এটা হ'তেই হবে। কিন্তু তাঁদের সকলেরই উদারপন্থা ঠিক এক জাতের নয়। একটি বলিষ্ঠ তত্ত্বগত ভিত্তি না-থাকলে উদারতা সব সময় সমন্বয়ের সার্থকতায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে না। অনেক সময় এ শুধু লুব্ধ একলেকটিসিজমেরই জন্ম দেয়। উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ আহরণের সঞ্চয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথের উদারপন্থা একলেকটিক সংগ্রহ-প্রবণতা নয়। চিন্তার অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাই : একটি মৌল বিশ্বাসের ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে — তারপর সমন্বয়।

ব্যাখ্যা পরিচয় আর বিচার, এর এক-একটিকে অবলম্বন ক'রে সমালোচনার ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন গোত্রের অদ্বৈতবাদের উদ্ভব হয়েছে, কিছুকাল যাবৎ তার বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যাচ্ছে। সাহিত্যবস্তুর জটিলতার দিকে দৃষ্টি রেখে, তার

সত্তার অনেকত্বের দিকটাকেই একান্ত ক'রে ধ'রে এই প্রতিক্রিয়া সমালোচনায় চরম বহুবিধতার মতবাদ (pluralism) প্রচার করতে শুরু করেছে।

এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথও সমালোচনার বহুবিধতায় বিশ্বাসী। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই অনেকত্বকে তিনি চরম ব'লে গ্রহণ করেননি। একটা মূল ঐক্যকেও তিনি স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। সাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যই সেই ঐক্যের ভিত্তি। সাহিত্য সাক্ষাৎকারের ফলে আমাদের যে-প্রাপ্তি, তা যুগপৎ সুন্দর সত্য ও কল্যাণকর। সত্য শিব ও সুন্দর — মানবজীবনের এই পরম সম্পদগুলির প্রতি মানুষের যে দুর্মর নিষ্ঠা, মানবমনের এই মজ্জাগত মূল্যবোধকে রবীন্দ্রনাথ চরম ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। এবং এই স্বীকৃতিই তাঁর সমালোচনাতত্ত্বে বহুত্বের অন্তরালে ঐক্যসূত্র রচনা ক'রে রেখেছে।

কিন্তু সত্য আর মঙ্গল আর সৌন্দর্য, এ-ও তো সেই বহুই হ'লো? এরা কি হুবহু এক? এরা কি তিনটি স্বতন্ত্র ভাবভূমির অধিবাসী নয়? কে না জানে যে, সত্যের অধিষ্ঠান জ্ঞানলোকে, মঙ্গলের অধিষ্ঠান কর্মজগতে আর সুন্দরের অধিষ্ঠান একান্তভাবে অনুভূতিলোকেই আবদ্ধ? সাহিত্যবিচার কি তা হ'লে ত্রিধাবিভক্ত হ'য়ে পড়ছে না? পড়ে না, যদি এদের অভিন্ন ব'লে মেনে নিই। উত্তম কথা; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই তিন 'ভ্যালু'র অভিন্নতা প্রতিপাদন করলেন কী উপায়ে?

অভিন্নতা প্রতিপাদনের প্রশ্নটা দর্শনের প্রশ্ন। তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথ যে এদের অভিন্ন ব'লে মেনেছেন, এইটেই আমাদের কাছে আসল কথা। সমালোচকের মৌল বিশ্বাসের স্বরূপ নিয়েই আমাদের জিজ্ঞাসা, সেই বিশ্বাসের যৌক্তিকতা নিয়ে নয়।

৬

মুখে সত্য শিব ও সুন্দরের কথা বলা এক বস্তু, আর কার্যক্ষেত্রে — অর্থাৎ সত্যি-কারের সাহিত্যবিচারে — এই তিনেরই প্রয়োগ করা আর-এক বস্তু। সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথ যে রূপের মানদণ্ড দিয়ে সাহিত্যবিচার করবেন, এটা সহজবোধ্য। কিন্তু সত্যি-সত্যিই কি তিনি সত্যের মানদণ্ড তেমনি অনায়াসে প্রয়োগ করতে পেরেছেন? না, এখানে রূপটাই আসল, সত্য আর মঙ্গল তারই ছদ্মনাম মাত্র?

ক্ষেত্র বিশেষে এ-রকম সন্দেহ যে সম্পূর্ণ অমূলক, তা বলা যায় না। মুখে সত্য ও সুন্দর বললেও, কারও-কারও ক্ষেত্রে দেখতে পাই, আসলে এরা কল্যাণেরই নামান্তর

মাত্র। অথবা মুখে সুন্দর ও মঙ্গলের কথা বললেও কেউ-কেউ কার্যক্ষেত্রে এদের সত্যেরই লেজুড় হিসাবে গণ্য করেন। রবীন্দ্রনাথের মতো লীলাবাদী কবি-সমালোচকের কাছে আমাদের আশঙ্কাটা অন্যরকম। কার্যক্ষেত্রে হয়তো সৌন্দর্যের প্রশ্নটাই তাঁর মনে একান্ত হ'য়ে উঠবে। হয়তো তিনি যে-সত্যের কথা বলবেন তা মোটেই বাস্তব সত্য বা জীবনের সত্য নয়, যে-কল্যাণের কথা বলবেন তা মোটেই ঐহিক কল্যাণ নয়।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা সাহিত্যের দিকে একটু অভিনিবেশ সহকারে তাকালেই এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। তাঁর সমগ্র সমালোচনাসাহিত্যেই সেই উত্তর ছড়ানো। কিন্তু তা হ'লেও, আমাদের বর্তমান অনুসন্ধান শুধু তৃতীয় বা পরিণত পর্বের পূর্ব-কথিত সেই প্রাসঙ্গিক সমালোচনাসমূহের মধ্যেই আবদ্ধ রাখবো। প্রথমত, এই অংশটি এখনো অনালোচিত আছে। দ্বিতীয়ত, বিচার প্রসঙ্গে মতামত এই অংশেই সব থেকে কুণ্ঠাহীন।

আপাতত আমাদের কাজ শুধু এমন কয়েকটি উক্তি উৎকলিত ক'রে দেওয়া, যার মধ্যে কেবল বিচার নয়, বিচারের আদর্শটাও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

প্রথমে রূপের প্রসঙ্গ। —

"কুন্দনন্দিনী সূর্যমুখীকে নিয়ে যে একটা উৎপাতের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা গৃহধর্মের পক্ষে ভালো নয়, এই অতি জীর্ণ কথাটাকে প্রমাণ করবার উদ্দেশ্য রচনাকালে সত্যই যে তাঁর [বঙ্কিমচন্দ্রের] মনে ছিল, এ আমি বিশ্বাস করিনে — ওটা হঠাৎ পুনশ্চ-নিবেদন; বস্তুত তিনি রূপমুগ্ধ রূপদ্রষ্টা রূপস্রষ্টা রূপেই বিষবৃক্ষ লিখেছিলেন।" ("সাহিত্যরূপ", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৩৯৮)

অথবা —

"মধুসূদন দত্তের প্রতিভা আত্মপ্রকাশের জন্যে সাহিত্যে একটি রূপের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিল।...রূপটিকে মনের মতো গাম্ভীর্য দেবেন বলে ধ্বনিবান শব্দ বেছে বেছে জড়ো করলেন। তাঁর বর্ণনীয় বিষয় যে রূপের সম্পদ পেল সেইটেতেই সে ধন্য হল।" ("সাহিত্যরূপ", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৩৯৬)

বিদ্যাপতির সেই 'যব গোধূলি সময় বেলি' ইত্যাদি পংক্তিগুলির সম্পর্কে —

"তিন লাইনে আমরা একটি সম্পূর্ণ রূপ দেখলুম — সামান্য একটা ঘটনা কাব্যে অসামান্য হয়ে রয়ে গেল।" ("সাহিত্যরূপ", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৪০৩)

কিংবা কীট্‌সের "Ode To A Nightingale" কবিতার স্তবক-বিশেষ সম্পর্কে —

"একে ইন্‌টেন্সিটি বলা চলে না, এ রুগ্ন চিত্তের অত্যুক্তি, এতে অস্বাস্থ্যের দুর্বলতাই প্রকাশ পাচ্ছে — তৎসত্ত্বেও মোটের উপর সমস্তটা নিয়ে এই কবিতাটি রূপবান।" ("সাহিত্যরূপ", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৪০২)

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই যে রূপ, এ কি শূন্যাশ্রয়ী? গগন-কুসুমের মতো বৃন্তহীন? এর উত্তর রবীন্দ্রনাথের মুখেই শোনা যাক্। —

"শিশুকাল থেকে মানুষ বলেছে 'গল্প বলো'; সেই গল্প তথ্যের প্রদর্শনী নয়, কোনো-একটা মানব পরিচয়ের সমগ্র ছবি, আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দানা বেঁধেছে তার মধ্যে।...এর মধ্যে অলৌকিক জীবের কথাও আছে কিন্তু তারা মানুষেরই প্রতীক।...মানুষ আপন হাতে আপনাকে, আপন সংসারকে তৈরি করে সেই সংসারের ছবি বানায় আপন হাতে; তাতে তাকে নিবিড় আনন্দ দেয়, কেননা সেই ছবি তার মনের নিতান্ত কাছে আসে। যে শকুন্তলার ঘটনা মানবসংসারে ঘটতে পারে তাকেই কবি আমাদের মনের কাছে নিবিড়তর সত্য করে দেখিয়ে দেন।" ("সাহিত্যের তাৎপর্য", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৩৭১)

কিংবা —

"শেক্‌স্‌পীয়র রচিত ফল্‌স্‌টাফ একটি বিশিষ্ট মানুষ সন্দেহ নেই। তবু বলতে হবে, আমাদের অভিজ্ঞতায় অনেক মানুষের কিছু কিছু আভাস আছে, শেক্‌স্‌পীয়রের প্রতিভার গুণে তাদের সমবায় ঘনীভূত হয়েছে ফল্‌স্‌টাফ-চরিত্রে।" ("সাহিত্যের তাৎপর্য", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৩৭২)

অথবা —

"কুমারসম্ভবের হিমালয় বর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিম, তাতে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিমর্যাদা হয়তো আছে, তার রূপের সত্যতা একেবারেই নেই, কিন্তু সখীপরিবৃতা শকুন্তলা চিরকালের।" ("সাহিত্যের মূল্য", 'সাহিত্যের স্বরূপ', র।১৪।৫৩৩)

'রূপের সত্যতা' কথাটা বিশেষভাবে লক্ষ করবার মতো। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, সাহিত্য যে-রূপ-কে পরিবেষণ করে, সে-রূপ শূন্যে ভাসমান নয়। তার বৃন্ত মানব সংসারে। তথ্যে না-হোক্, নিবিড়তর সত্যে। সেই নিবিড়তর সত্যটা অবাস্তব-কিছু নয়। কেননা মানবসংসার জিনিসটা খাঁটি বাস্তব। সেই খাঁটি বাস্তবের খাঁটি রূপের কথাই রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়ে বলেছেন। যেমন —

"রূপকার বাস্তবকে আমার অতি কাছে এনে দেন, রিয়্যালিটির চেতনা আমার মধ্যে উজ্জ্বল করে তোলেন। নানা পদার্থের মধ্যে বাস্তব ছড়িয়ে আছে, তাকে অব্যবহিত বিশুদ্ধরূপে সমগ্র করে দেখতে পাই না — রসসৃষ্টির মধ্যে বাস্তব অব্যবহিতভাবে

চেতনার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, তার রূপ দেখতে পাই।" ("রূপকার", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৪৭৪)

রিয়্যালিটির চেতনা ব'লেই তাকে বলি সত্য, আর উজ্জ্বল বিশুদ্ধ এবং অব্যবহিত-ভাবে উপস্থিত ব'লেই তাকে বলি রূপ।

সাহিত্যে রূপ যে সত্যকেই প্রকাশ করে, এবং সত্য যে রূপের প্রসাদেই সাহিত্যে স্থান পায় — এই হ'লো উপরের উদ্‌ধৃতিগুলির সারমর্ম। কিন্তু শুধু তাই নয়। রূপ ও সত্যের সঙ্গে কল্যাণের যোগ অবিচ্ছেদ্য। এ-যোগ বাইরের নয়। রূপ যেমন জীবনের রূপ, সত্য যেমন জীবনেরই সত্য, কল্যাণও তেমনি জীবনেরই কল্যাণ। জ্ঞানলোক, কর্মলোক, ভাবলোক — তিনটি পৃথক্ জগৎ নয়। চেষ্টা করলে এদের বিশ্লিষ্টভাবেও দেখতে পারি বটে, কিন্তু আমাদের অখণ্ড উপলব্ধির কাছে এরা এক এবং অবিভাজ্য।

সুন্দর যে সুন্দর ব'লেই কল্যাণকর, এটি রবীন্দ্রনাথের একটি মৌল প্রত্যয়। সত্যের কথাও তাই। উপলব্ধির সত্য যে তথ্যমাত্র নয় ব'লেই — সমগ্র সত্য ব'লেই নিজের মধ্যে মঙ্গলের বীজকে বহন করে, এবং যে-সত্য বড়ো, যে-সত্য গভীর তা যে মঙ্গলের স্পর্শেই বৃহত্ব, তাৎপর্য এবং মহত্ত্ব অর্জন করেছে, এ-ও সেই একই প্রত্যয়ের আর-একটা দিক। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, সাহিত্য ও জীবনের ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক প্রভাব সম্পর্কে যিনিই বিশ্বাসী, সাহিত্যের অগ্রগতিতে এবং সাহিত্যের প্রগতিশীল ভূমিকায় যিনিই আস্থাবান, ঠিক এইরকম একটি মৌল প্রত্যয়ের পাদপীঠে তাঁকে দাঁড়াতেই হবে। অন্য গতি নেই।

কল্যাণবোধের দৈন্য যে সৌন্দর্যকে কীভাবে শীর্ণ ক'রে দেয়, অন্যদিকে মঙ্গলের সঙ্গ যে তাকে কীভাবে পূর্ণ ক'রে তোলে, সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক যে কতো নিবিড়, তা রবীন্দ্রনাথ নানা স্থানে নানাভাবে বলেছেন। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি।

"আমাদের দেশের অধিকাংশ আচার-বিচার পুরাতনের নির্জীব পুনরাবৃত্তি। বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তাহার অসঙ্গতির সীমা নাই। এইজন্য তাহার অধি-কাংশই আমাদিগকে পদে পদে পরাভবের দিকে লইয়া যাইতেছে। কেবল আমাদের সাহিত্যই নূতন রূপ লইয়া নূতন প্রাণে নূতন কালের সঙ্গে যোগসাধন করিতে প্রবৃত্ত। এইজন্য বাঙালীকে তাহার সাহিত্যই যথার্থভাবে ভিতরের দিক হইতে মানুষ করিয়া তুলিতেছে। যেখানে তাহার সমাজের আর-সমস্তই স্বাধীন পন্থার বিরোধী, যেখানে তাহার লোকাচার তাহাকে নির্বিচার অভ্যাসের

দাসত্বপাশে অচল করিয়া বাঁধিয়াছে, সেখানে তাহার সাহিত্যই তাহার মনকে মুক্তি দিবার একমাত্র শক্তি। সেখানে সাহিত্যেই অনেক সময়ে তাহার অগোচরেও জীবনসমস্যার নূতন নূতন সমাধান, প্রথার গণ্ডি পার হইয়া আপনিই প্রকাশ হইতেছে। এই অন্তরের মুক্তি একদা তাহাকে বাহিরেও মুক্তি দিবে।" ("সাহিত্য-সম্মিলন", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৩৮৭-৮)

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আপন অগোচরেই কল্যাণপ্রদ সাহিত্য। সহজভাবেই সে জীবনের সপক্ষে। বিকৃতি শুধু যে সংকীর্ণ সামাজিক স্বার্থেই নিন্দনীয় তা নয়, তাতে সাহিত্যিক মূল্যেরই হানি ঘটে। কেননা তাতে সত্যেরও হানি সৌন্দর্যেরও হানি। সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষের প্রতি মানুষের মনে যে একটি অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা আছে, সাহিত্য সেই মহৎ আকাঙ্ক্ষারই অন্যতম প্রকাশ।

"এক-একটা সময় আসে যখন এক-একটা জাতির মধ্যে মানুষের ভিতরকার বিকৃতিগুলিই উগ্র হয়ে দেখা দেয়।

"আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও এই বিকৃতি অনেক দেখা গিয়েছে।...বর্তমান কালের আরম্ভে কবির লড়াই, পাঁচালি, তর্জা প্রভৃতিতে সাহিত্যের যে-বিকার দেখা দিয়েছিলো সেগুলিতে বীর্যবান জাতির প্রবল উন্নতির বা মহৎ আকাঙ্ক্ষার পরিচয় নেই। তার ভিতর অত্যন্ত পঙ্কিলতা আছে। সমাজের পথযাত্রায় পাথেয় হচ্ছে উৎকর্ষের জন্যে আকাঙ্ক্ষা। জীবনের মধ্যে ব্যবহারে তার প্রকাশ খণ্ডিত হয়ে যায় বলেই মনে তার জন্যে যে-আকাঙ্ক্ষা আছে তাকে রত্নের মতো সাহিত্যের বহুমূল্য কৌটোর মধ্যে রেখে দিই — তাকে সংসারযাত্রায় ব্যক্ত সত্যের চেয়ে সম্পূর্ণতর করে উপলব্ধি করি।" ("সাহিত্যসমালোচনা", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৪০৫-৬)

কিংবা —

"আমাদের সব সাহিত্যের গোড়াতেই যে মহাকাব্য, স্পষ্টই দেখি, তার লক্ষ্য মানুষের দৈন্য প্রচার, মানুষের লজ্জা ঘোষণা করা নয় — তার মাহাত্ম্য স্বীকার করা।" ("সাহিত্যসমালোচনা", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৪০৪)

পুনশ্চ —

"বাল্মীকি যেদিন ছন্দ পেলেন সেদিন অনুভব করলেন, এ ছন্দ কোনো মহৎ চরিত্র, কোনো পরম অনুভূতি প্রকাশ করবার জন্যে, এমন-কিছু যাতে মানবজীবনের পূর্ণতা, যাতে তার গৌরব। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, তখনকার লোক মনুষ্যত্বের কোন্ রূপকে শ্রেষ্ঠ বলে জানতেন।" ("সাহিত্যসমালোচনা", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৪০৫)

৭

রূপ সত্য ও মঙ্গল সম্পূর্ণ পৃথক্‌-পৃথক্‌ভাবেও সাহিত্যবিচারের মানদণ্ডরূপে গৃহীত হ'য়ে থাকে।

যাঁরা বিশুদ্ধ ফর্ম-বাদী, তাঁদের বিচারের মানদণ্ড নিছক রূপ, বস্তুবর্জিত রূপ, — ভাসমান বৃন্তহীন অবচ্ছিন্ন রূপ। কেবল রূপকেই অবলম্বন করলে শেষ পর্যন্ত বস্তুকে — এবং সেই সূত্রে জীবনকে — বাদ দেওয়া ছাড়া পথ থাকে না। অন্যপক্ষে, সংকীর্ণ বস্তুতান্ত্রিক বিচারের মাপকাঠি হ'লো সত্য, নির্জলা আকাট সত্য — অর্থাৎ কিনা বিশুদ্ধ তথ্য। নিছক তথ্যের দিক থেকে সত্যই তুল্যমূল্য। নির্বাচনের উপায় নেই ব'লে সমস্ত সত্য সেখানে পিণ্ডীকৃত বস্তুভারে পরিণত হয়। তেমনি, বিশুদ্ধ নৈতিক বা সামাজিক বিচারের একমাত্র মানদণ্ড মঙ্গল। শেষ পর্যন্ত — প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক মঙ্গল। তারই নাম প্রচার, প্রোপাগাণ্ডা, আধুনিক সাংবাদিকতা।

এ-রকম মানদণ্ড রবীন্দ্রনাথের নয়। সম্পূর্ণ সমন্বিতভাবেই এদের তিনটিকে তিনি সাহিত্যবিচারের মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করেছেন। আসলে মানদণ্ড তো তিনটি নয়। মানদণ্ড একটিই। তার নাম মূল্যবোধ, কিন্তু প্রকৃত অর্থ হ'লো জীবনবোধ।

যদি এ-কথা মানি যে, মানবজীবনই সমস্ত 'ভ্যালু'র আদি উৎস; যদি জানি যে এই পরম সম্পদগুলি ব্যবহারিকের ঊর্ধ্বে বটে কিন্তু তা ব'লে জীবনের ঊর্ধ্বে নয়; যদি বুঝি যে, শেষ পর্যন্ত জীবনের মূল্যেই এদের যা-কিছু তাৎপর্য, — তা হ'লে সহজেই বুঝতে পারবো রবীন্দ্রনাথ কোন্‌ পথে এদের সমন্বয়সাধন করেছেন। সহজেই বুঝতে পারবো যে, জীবনের সূত্রে এরা স্বভাবতই সমন্বিত।

সে-দিক থেকে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের মতে, জীবনের আদর্শই সাহিত্যসমালোচনার চরম ও পরম আদর্শ। সবার উপরে সেইটেই সত্য, তার উপরে আর-কিছু নেই। এই জীবনের আদর্শের কথা স্মরণ ক'রেই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—

" 'চরণনখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে' এই লাইনের মধ্যে বাক্‌চাতুরী আছে, কিন্তু জীবনের স্বাদ নেই। অপর পক্ষে—

তোমার ঐ মাথার চূড়ার যে রঙ আছে উজ্জ্বলি
সে রঙ দিয়ে রাঙাও আমার বুকের কাঁচলি—

এর মধ্যে জীবনের স্পর্শ পাই, একে অসংশয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।"
("সাহিত্যের মূল্য", 'সাহিত্যের স্বরূপ', র।১৪।৫৩৩)

১. রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় এইরকম সামগ্রিক প্রাপ্তিকেই রস ব'লে বর্ণনা করেছেন। যেমন, "শ্রেষ্ঠ কাব্য প্রথমে আমাদের কানের এবং কলাবোধের তৃপ্তি, তার পরে আমাদের বুদ্ধির তৃপ্তি ও তার পরে হৃদয়ের তৃপ্তি ঘটলে তবেই আমাদের সমগ্র প্রকৃতির তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যে যে রস তাই আমাদের স্থায়িরূপে প্রগাঢ়রূপে অন্তরকে অধিকার করে। নইলে, হয় রসের ক্ষীণতা ক্ষণিকতা নয় রসের বিকার ঘটে।" ("বিকার শঙ্কা", 'শান্তিনিকেতন' । প্রথম খণ্ড, র।১২।১২২)

বলা প্রয়োজন যে, এই উদ্‌ধৃতিটিতে ঐ যে 'কলাবোধের তৃপ্তি'র কথা আছে, অনেকের মতে মাত্র ঐটুকুই খাঁটি ইস্থেটিক আস্বাদন। আস্বাদন কথাটিকে এ-প্রবন্ধে বিশুদ্ধ ইস্থেটিক আস্বাদন অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে।

২. গ্রন্থপরিচয়, 'সাহিত্যের পথে'

৩. বিখ্যাত সমালোচক J. E. Spingarn, যিনি একদিকে ক্রোচের ভাবশিষ্য, অন্যদিকে 'New Critic'দের অন্যতম মন্ত্র-দাতা (যোগাযোগটা লক্ষণীয়), তাঁর একটি উক্তি এখানে তুলে দিচ্ছি: "As for me, I re-dream the poets' dream.... I at least strive to replace one work of art by another, and art can only find its *alter ego* in art."

৪. আধুনিক ব্যাখ্যাপন্থীরা বিশ্বাস করেন যে, এ-রকম রচনা সত্যিই সম্ভব নয়। অথবা তাঁরা মনে করেন যে, ব্যাখ্যা যেখানে অসম্ভব তেমন রচনা শিল্পবস্তুই নয়।

৫. 'ভারতী' ১২৮৮ শ্রাবণ

৬. র।১৩।৬৬২ (২৯-৩৮) দ্রষ্টব্য।

৭. 'সাধনা' ১২৯৯ ফাল্গুন; এটি 'আধুনিক সাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত নয়।

৮. বিশ্লেষণের বিপরীতধর্মী — এই অর্থে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাকে কেউ-কেউ সংশ্লেষণাত্মক বা 'সিন্‌থেটিক্যাল' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথেব সমালোচনায় বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ দুই-ই আছে। প্রকৃতপক্ষে, যা আদৌ বিশ্লিষ্ট নয়, তার সংশ্লেষণের প্রশ্নই ওঠে না। তবে, বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা-আদর্শের সমন্বয় ঘটেছে — এই অর্থে যদি কেউ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাকে সংশ্লেষণাত্মক আখ্যা দেন, তাতে আপত্তি করার কিছু নেই।

৯. রস-চেতনা ও রূপ-চেতনার পার্থক্য নিয়ে দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর "The concept of Rasa" প্রবন্ধে (*Studies in Philosophy*) অতি সূক্ষ্মদর্শী ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় অন্তর্মুখী চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা রূপের অভিমুখে।

১০. রূপ-চেতনা ব্যাপারটা বিষয়-আশ্রিত, হয়তো ষোলো আনা আস্বাদনধর্মী নয়। সম্ভবত বিষয়-আশ্রিত ব'লেই রূপ জিনিসটা সমালোচনার সম্পূর্ণ অনধিগম্য নয়।

১১. প্রসঙ্গক্রমে সাম্প্রতিক New Criticism এবং Historical Criticism-এর কথা এখানে উল্লেখ করা যায়।

১২. এই প্রসঙ্গে R. S. Crane-প্রমুখ 'চিকাগো গোষ্ঠী'র ('নব্য-এ্যারিস্টটেলীয় গোষ্ঠী'র) সমালোচকদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ

পরিশিষ্ট

পাশ্চাত্য প্রকাশবাদ ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজিজ্ঞাসা

"যাকে সৃষ্টি বলি তার নিঃসংশয় প্রকাশই তার অস্তিত্বের চরম কৈফিয়ৎ।"

রবীন্দ্রনাথ, "সাহিত্যতত্ত্ব", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৩৬১।

সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ 'প্রকাশ' কথাটার উপর প্রচুর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "সৃষ্টি মাত্রের আসল কথাই হচ্ছে প্রকাশ।"[১] এই প্রকাশ কথাটিকে ঘিরে বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে একটি বিশেষ তত্ত্বকে গ'ড়ে তুলেছেন — যাকে বলা যেতে পারে প্রকাশতত্ত্ব — সেই তত্ত্বটিকে রবীন্দ্রনাথের শিল্প-দর্শনের একটি প্রধান স্তম্ভ ব'লে বর্ণনা করা যায়।

প্রকাশবাদ বা এক্স্‌প্রেশনিজম ইউরোপীয় শিল্পদর্শনের একটি সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত মতবাদ। সেখানেও আমরা একটি প্রকাশতত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই। সেই মত অনুসারে আর্ট প্রকৃতির 'অনুকরণ' নয়; জগৎ বা জীবনের কোনো 'সত্যের' রূপায়ণ নয়। আর্ট হ'লো সৃষ্টি; আর সৃষ্টি মানেই হ'লো প্রকাশ। প্রকাশেই আর্টের বিশিষ্ট-তম পরিচয়: প্রকাশেই তার চরম সার্থকতা। প্রকাশের মাপকাঠি দিয়েই তার ভালোমন্দের শেষ বিচার।

রবীন্দ্রনাথও মনে করেন, আর্ট মানেই সৃষ্টি এবং সৃষ্টি মানেই প্রকাশ। তিনি বলেন, "সাহিত্য ও ললিতকলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ।"[২] সহজেই মনে হ'তে পারে, অন্তত এই ব্যাপারটার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব নিশ্চয়ই পাশ্চাত্য প্রকাশবাদীদের সাহিত্যতত্ত্বের সমগোত্রীয়।

রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্য অর্থে প্রকাশবাদী ব'লে অভিহিত করা সমীচীন কিনা সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। 'অনুকরণ' জিনিসটাকে সরাসরি অস্বীকার করলেও, আর্টে জগৎ ও জীবনকে রূপায়িত করার কথা, জীবনের সত্যকে ফুটিয়ে তোলার কথা রবীন্দ্রনাথ বেশ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠেই ঘোষণা করেছেন। জীবনের মহাশিল্পই যে শিল্পীর সামনে তাঁর শিল্পসৃষ্টির চরম আদর্শ এমন কথা বলতে রবীন্দ্রনাথের কিছুমাত্র দ্বিধা নেই। পাশ্চাত্য প্রকাশবাদীরা কিন্তু বহুকাল পূর্বেই এ-সব কথা বলা ছেড়ে দিয়েছেন। শিল্পীর দিব্য প্রতিভা এবং সেই প্রতিভার আত্মপ্রকাশের রহস্যের দিকেই তাঁদের দৃষ্টি একান্ত-ভাবে নিবদ্ধ। এইখানেই খটকা লাগে। সাহিত্যতত্ত্বের রবীন্দ্রনাথ কি সত্যিই পাশ্চাত্য প্রকাশবাদীদের সমধর্মী?

'প্রকাশ' কথাটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী অর্থে ব্যবহার করেছেন, তাঁর মতে সাহিত্য সত্যি সত্যি কী প্রকাশ করে, পাশ্চাত্য প্রকাশবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশতত্ত্বের পার্থক্য কোথায়, এই প্রশ্নের মীমাংসাই আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়।

১.

সুপ্রাচীনকাল থেকে শুরু ক'রে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে পাশ্চাত্য শিল্পচিন্তায় যে বিশেষ মতবাদটি অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব ক'রে আসছিলো, এক কথায় তার নাম দেওয়া হয়েছে অনুকরণবাদ। নামটি সন্তোষজনক কিনা সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে, কেননা অনুকরণ কথাটার অর্থ নিয়েই গোলমাল আছে। নামের কথা যাক্, মতবাদটির আসল জোর কিন্তু নিছক অনুকরণের উপরেই নয়। মতবাদটির আসল জোর সত্যের উপর — সত্যের আদর্শের উপর। প্রাচীন অনুকরণবাদে হয়তো অনুকরণের উপরেই বেশি জোর ছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে তা নয়। প্লেটোর অনুকরণবাদে মিথ্যার কারবারী ব'লে আর্ট তিরস্কৃত বটে, কিন্তু অ্যারিস্টটল এবং তাঁর অনুবর্তীদের অনুকরণবাদে — প্রকৃতপক্ষে প্লেটো-পরবর্তী সমগ্র অনুকরণবাদে — সত্যের কারবারী হিসাবেই আর্টের বিশেষ সম্মান। এ-শিল্পতত্ত্বের মর্মকথাটি হ'লো এই যে, আর্ট নিজের বাইরে অপর একটি সত্তার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে। সেই সত্তা — তাকে জীবনই বলি আর প্রকৃতিই বলি — তারই আদর্শের দ্বারা আর্ট নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ আর্টের সামনে আর্টের বাইরের একটা স্বতন্ত্র আদর্শ আছে, সে-আদর্শ হ'লো জগৎ ও জীবন। আর্ট যে-জগৎকে সৃষ্টি করে তা কোনো-না-কোনো অর্থে বাস্তব জগতেরই প্রতিচ্ছবি। আর্টের কাজ জগৎ-সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করা — সে-সত্য যা-ই হোক্-না কেন। সত্যের প্রতিফলনের গুণেই, সত্যের আবিষ্কারের গুণেই আর্টের মহত্ত্ব।

একেবারে গোড়ার দিকটাতে যাই হোক্-না কেন, সুগঠিত মতবাদ হিসাবে প্রকাশবাদের আবির্ভাবকে অনায়াসে অনুকরণবাদের প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিবাদ ব'লে গণ্য করা চলে। প্রকাশবাদের মর্মকথা হ'লো এই যে, সৃষ্টি জিনিসটা নিজের বহিঃস্থিত কোনো সত্তার প্রতিফলন নয়, কোনো সত্যের আবিষ্কার নয়। সৃষ্টি হ'লো মুক্ত কল্পনার বাধাহীন লীলা, কারও কাছে তার জবাবদিহি নেই। আর্ট জগৎ-সত্যকে কতোখানি প্রকাশ করে, বা আদৌ করে কিনা সে-প্রশ্ন অবান্তর। আর্ট প্রকাশ করে স্রষ্টার প্রতিভাকে, স্রষ্টার আবেগ ও অনুভূতিকে, স্রষ্টার নিগূঢ় আত্ম-রহস্যকে। নিজের বাইরের অপর-কোনো সত্তার দিকে সে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে না ;

স্রষ্টার কল্পনাশক্তির বাইরের কোনো সত্তার আদর্শের দ্বারা সে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে না। স্রষ্টার অনুভূতিপ্রকাশের মানদণ্ড দিয়ে, স্রষ্টার আত্মপ্রকাশের মানদণ্ড দিয়ে, আর্টের উৎকর্ষ-অনুৎকর্ষের শেষ বিচার ; জগৎ-সত্যের মানদণ্ড দিয়ে নয়।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনে এমন অনেক উক্তি মিলবে যা এই মতবাদকে সমর্থন করে ব'লে মনে হ'তে পারে। পুরোপুরি না-হোক্, অন্তত আংশিকভাবে তো নিশ্চয়ই। সে-সব উক্তি এতোই সর্বজনপরিচিত যে এখানে তার বিস্তৃত উদ্ধৃতি বাহুল্য মাত্র। আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, এইটেই কি রবীন্দ্র-শিল্পদর্শনের শেষ কথা? এর সম্পূর্ণ বিপরীত কোটির কথাই কি রবীন্দ্রনাথের রচনায় খুব সুদর্লভ? এইখানেই সমস্যা।

জগৎ-সত্যের আদর্শের কথা — জীবনের স্বহস্তরচিত শিল্পকে অনুগমন করার কথা, তা-ও রবীন্দ্রনাথ বেশ উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করেছেন। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, এই দুই আদর্শের মধ্যে কোন্‌টি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র শিল্পদর্শনের সঙ্গে গভীরতরভাবে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারছে। প্রশ্ন ওঠে, প্রচলিত প্রকাশবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমধর্মিতা কতোখানি গভীর। প্রকাশ কথাটাকে প্রকাশবাদীরা যে-অর্থে ব্যবহার ক'রে থাকেন, রবীন্দ্রনাথও কি ঠিক সেই অর্থেই ব্যবহার করেছেন? এইটেই এখানে আমাদের প্রধান বিবেচ্য।

একটা কথা এখানে ব'লে রাখা দরকার। প্রকাশবাদ আর রোমান্টিক শিল্পদর্শন হুবহু এক বস্তু নয়, এবং প্রকাশবাদের আধুনিক পৃষ্ঠপোষকদের অনেকেই রোমান্টিসিস্ট নন। কিন্তু এমন রোমান্টিসিস্ট খুঁজে পাওয়া বোধকরি কঠিন হবে যিনি কোনো-না-কোনো অর্থে প্রকাশবাদের সমর্থক নন। আমাদের বর্তমান আলোচনা রোমান্টিক প্রকাশবাদীদের মতবাদের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কাজের সুবিধার জন্য অ-রোমান্টিক প্রকাশবাদীদের মতামতকে আমরা আমাদের বিষয়-পরিধির বহির্ভূত ব'লে গণ্য করবো।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, পাশ্চাত্য প্রকাশবাদের প্রথম পদক্ষেপ রোমান্টিক আন্দোলনের হাত ধ'রেই। রেনেসাঁস-পরবর্তী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে এর যোগা-যোগ মোটেই দুর্লক্ষ্য নয়। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, গ্যেটে শিলার শপেনহাওয়ার — এঁদের কাছ থেকেই এ-মতের ভাব-বীজ রোমান্টিক আন্দোলনে প্রবেশ করে। কালক্রমে হেগেলীয়ানদের সূত্রে এ-মত নানা দিকে প্রসারিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত নানান্‌রকমের রূপ পরিগ্রহ করেছে। সেইসব রূপের অনেকগুলির সঙ্গেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই।

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, খাঁটি রোমান্টিক প্রকাশবাদীরা স্রষ্টার ব্যক্তিগত

অনুভূতিপ্রকাশ বা স্রষ্টার বিশিষ্ট ব্যক্তিসত্তার প্রকাশের কথা যেমন যদি-কিন্তু-হীন ঋজুতার সঙ্গে ঘোষণা করেন, অ-রোমান্টিক কোনো প্রকাশবাদীর মুখে স্রষ্টার ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশের কথা কখনোই তেমন স্পষ্ট উচ্চারিত নয়। রোমান্টিক প্রকাশবাদীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমধর্মিতার একাধিক সূত্র অনেকেরই নজরে পড়তে পারে। তিনি নিজে রোমান্টিক কবি। তাঁর শিল্পদর্শনে রোমান্টিকতার প্রভাবপাতের কথা বহুজনকথিত। সমধর্মিতার সূত্র রয়েছে ব'লেই পার্থক্যের প্রশ্নটা আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অ-রোমান্টিক প্রকাশবাদীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিলের সূত্রটা এতোই ক্ষীণ যে বর্তমান আলোচনায় তাঁদের প্রসঙ্গ অনায়াসে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

২.

আর্ট কী প্রকাশ করে? রোমান্টিক প্রকাশবাদীদের উত্তর হ'লো — এক, আর্ট স্রষ্টার অনুভূতিকে, স্রষ্টার হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করে; দুই, আর্ট স্রষ্টার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। উত্তরদুটি আসলে খুব আলাদা নয়। কেননা, অনুভূতিপ্রকাশের মধ্যে দিয়েও ব্যক্তিত্বই প্রকাশিত হয়, আবার ব্যক্তিত্বপ্রকাশের মধ্যেও অনুভূতিপ্রকাশ অনুস্যূত — বিশেষত যদি ধ'রে নেওয়া যায় যে স্রষ্টৃত্বের মুখ্যতম উপাদানই হ'লো অনুভূতি।

সে যা-ই হোক্, আপাতত আমাদের সামনে বিবেচ্য বিষয় হ'লো তিনটি। এক, প্রকাশ কথাটার সঠিক তাৎপর্য কী; দুই, অনুভূতিপ্রকাশ বলতে ঠিক কী বোঝায়, এবং এ-বিষয়ে প্রচলিত মত বা রোমান্টিক মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের কতোটুকু মিল; আর তৃতীয় হ'লো আত্মপ্রকাশ কথাটা। এ-কথাটার রোমান্টিক ব্যাখ্যাই বা কী, আর রবীন্দ্রনাথই বা এ-কথাটাকে কী অর্থে গ্রহণ করেছেন।

প্রথমেই একটা কথা ব'লে রাখা দরকার। প্রকাশ কথাটার সঠিক অর্থ বা সঠিক তাৎপর্য যা-ই হোক্-না কেন, আর্টের ক্ষেত্রেই কথাটার সম্পূর্ণ দুই ধরনের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এক, প্রক্রিয়া হিসাবে; আর দ্বিতীয় হ'লো — প্রক্রিয়াবিশেষের ফল বা পরিণতি হিসাবে। প্রকাশক্রিয়া সে-ও প্রকাশ; আবার প্রকাশিত বস্তু তাকেও বলি প্রকাশ। যেমন আর্ট কথাটা। সৃজনক্রিয়া বা ক্রিয়েটিভ প্রসেস্ সে-ও আর্ট; আবার শিল্পবস্তু (**work of art**, যাকে বলা হয় **art-product** বা **artifact**, যেমন মূর্তি, চিত্র, কবিতা, নাটক) — সে-ও আর্ট। এ-রকম বলাতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোনো দোষ নেই। দোষ শুধু দুটি ব্যাপারকে মিশিয়ে ফেলাতে। দোষ এই কথা ভুলে যাওয়াতে যে, প্রক্রিয়া আর ফল এক নয়, সম্পূর্ণ আলাদা।

প্রকাশবাদীরা যখন আর্টকে প্রকাশ বলেন, তখন কথাটা তাঁরা কোন্ দিক থেকে বলেন? এক সঙ্গে দু-দিক থেকেই। তাঁদের মতে সৃজনক্রিয়া ও প্রকাশক্রিয়া অভিন্ন, এবং প্রকাশক্রিয়ার মধ্যেই শিল্পবস্তুর শিল্পত্বেরও চাবিকাঠি। অর্থাৎ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া ও ফল তাঁদের কাছে বিশেষ আলাদা নয়।

এইখানেই মুশকিল। ক্রিয়েটিভ প্রসেস্‌টা একটা ঘটনা বা ঘটনা-পরম্পরা। সেই ঘটনার খানিকটা সংঘটিত হচ্ছে শিল্পীর মনোরাজ্যে, খানিকটা সংঘটিত হচ্ছে বহির্জগতে শক্তি চলাচলের মধ্যে, আর বাকিটা ঘটছে উপকরণ-রাজ্যে। ক্রিয়েটিভ প্রসেস্ একটা স্থানকালসাপেক্ষ ব্যাপার, পাত্রসাপেক্ষ ব্যাপার। তা জাগতিক ঘটনা-পরম্পরার সঙ্গে কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত। তা চঞ্চল এবং ক্ষণস্থায়ী। শিল্পবস্তু কিন্তু মোটেই এ-রকম নয়, তার শিল্পত্ব সবরকমেই এর বিপরীতধর্মী। মানতেই হবে যে, সৃজনক্রিয়া ও শিল্পবস্তু হুবহু এক নয়, সম্পর্ক তাদের যতোই ঘনিষ্ঠ হোক্-না কেন।

এ-কথা মানলে এ-ও মানতে হবে যে, শিল্পবস্তুর পরিচয় স্বয়ং শিল্পবস্তুই, শিল্পবিচার শিল্পবস্তুরই বিচার। কবির কাজ যা-ই হোক্-না কেন, পাঠকের লক্ষ্য কবিতা। পাঠকের আস্বাদ্য বিষয় কবির জীবনলগ্ন কোনো ঘটনা বা ঘটনা-পরম্পরা নয়, কোনো চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী জাগতিক ক্রিয়া নয়, অর্থাৎ সৃজনক্রিয়া নয়, পাঠকের আস্বাদ্য বিষয় কবিতা-সমালোচকের বিচার্য বিষয়ও তা-ই।

একটা কথা মনে রাখতে হবে — সৃজনক্রিয়া সম্পর্কে যে-কথা প্রযোজ্য, শিল্পবস্তু সম্পর্কে সে-কথা প্রযোজ্য না-ও হ'তে পারে। ঠিক যেমন শিল্পবস্তু সম্পর্কে যে-কথা খাটে, সৃজনক্রিয়া সম্পর্কে সে-কথা সম্পূর্ণ অবান্তরও হ'তে পারে। শুক্তির ব্যাধি সম্পর্কে যে-কথা প্রযোজ্য, মুক্তার মূল্য-নিরূপণের ক্ষেত্রে সে-কথা অবান্তর। আবার মুক্তার রূপগুণের প্রসঙ্গে যে-প্রশংসা সম্পূর্ণ সংগত, শুক্তির যন্ত্রণার ক্ষেত্রে সেইসব প্রশংসা-বাক্যই নির্ভেজাল নিষ্ঠুরতা। অথচ শুক্তির যন্ত্রণাতেই নাকি মুক্তার জন্ম।

সৃজনের ঘটনাটি স্রষ্টার নিজের বোধের কাছে কীরকম ঠেকছে না-ঠেকছে সে একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোনো শিল্পীর কাছে যদি সত্যিই এমন প্রতিভাত হয় যে সৃজনক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তাঁর আত্মপ্রকাশও ঘটছে, তাতে কারো কিছু বলবার নেই। এই ব্যক্তিগত উপলব্ধির সাক্ষ্যকে অপর কেউ খণ্ডন বা সমর্থন কিছুই করতে পারেন না। ঠিক তেমনি, এই ব্যক্তিগত ধারণাকে সাধারণ সত্য হিসাবে গ্রহণ করারও কারো বাধ্যবাধকতা নেই।

তবু, তর্কস্থলে যদি তাকে সাধারণ সত্য ব'লে মেনেও নেওয়া যায়, শিল্পবস্তুর শিল্পত্বকে — তার উৎকর্ষ-অনুৎকর্ষকে — তা স্পর্শ করে না। সৃজনক্রিয়ার সম্পর্কে

যা-ই বলা হোক্-না কেন, ভোক্তাসাধারণের কাছে তা প্রমাণ-অপ্রমাণের বাইরের ব্যাপার। শিল্পবস্তুর শিল্প-সার্থকতার প্রশ্নে সে-প্রসঙ্গের উত্থাপন অবৈধ। অর্থাৎ কিনা, যদি মেনেও নিই যে সৃজনক্রিয়া সত্যি-সত্যিই স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ, তার দরুন শিল্প-বস্তুকেও যে স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ ব'লে মানতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা জন্মায় না।

রবীন্দ্রনাথ কোনো-কোনো দিক থেকে সৃজনকে স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ-প্রক্রিয়া ব'লেই বর্ণনা করেছেন। এখানে রোমান্টিক সাহিত্যশাস্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর মিল সহজেই নজরে পড়বে, যদিও সে-মিল কতোটা গভীর সে-সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। পরে যথাকালে সে-প্রশ্নের মীমাংসায় আমাদের প্রবৃত্তও হ'তে হবে। এ-মিল অবশ্য কেবল রোমান্টিক-দের সঙ্গেই নয়, কেননা রোমান্টিকতার পরিধির বাইরেও এ-রকম উক্তি প্রচুর শুনতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এ তো গেলো প্রকাশ-প্রক্রিয়া এবং সৃজন-প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গ। রোমান্টিক প্রকাশবাদীরা কিন্তু এইখানে থামেন না। তাঁরা শিল্পবস্তুকেও স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ ব'লে দাবি করেন। তাঁদের মতে আর্টের স্বরূপ-নির্ণয় সংজ্ঞা-নিরূপণ সবই ঐ আত্মপ্রকাশ দিয়ে। তাঁরা বলেন, স্রষ্টার আত্মপ্রকাশের তারতম্যই হ'লো শিল্পবস্তুর ভালোমন্দ বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। রবীন্দ্রনাথ তা বলেন না। এই পার্থক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু আত্মপ্রকাশ দিয়ে শিল্পবস্তুর স্বরূপ-নির্ণয় করেননি, সংজ্ঞা-নির্ধারণ করেননি। আত্মপ্রকাশের মাপকাঠি দিয়ে শিল্পবস্তুর মূল্যবিচারের কথা তিনি বলেননি। স্রষ্টা হিসাবে তাঁর নিজের কাছে আর্টের অন্তরঙ্গ পরিচয় এবং পরম মূল্য দুই-ই হয়তো আপন আত্মপ্রকাশের সার্থকতায়। কিন্তু এ-ও তিনি জানেন যে, এ-দৃষ্টি একান্তভাবেই স্রষ্টার স্বগত দৃষ্টি। শিল্পবস্তুকে যে ভোক্তার দৃষ্টিতেও দেখা যায় — এবং সেই দেখাই যে 'পাবলিক' দেখা, অর্থাৎ তত্ত্বগতভাবে দেখা, এ-কথা তিনি কখনো ভোলেননি। মূল্যায়ন ব্যাপারটা যে আসলে ভোক্তা-ভূমিকারই ব্যাপার, এ-কথাও তিনি সব সময় স্মরণ রেখেছেন।

এইখানেই পাশ্চাত্য প্রকাশবাদীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা প্রধান অমিল।

৩.

রোমান্টিক প্রকাশবাদীদের মতবাদে প্রকাশ সম্পর্কে, অথবা বলা যেতে পারে স্রষ্টার অনুভূতিপ্রকাশ ও আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে ডবল দাবি। সৃজনক্রিয়াও স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ,

শিল্পবস্তুও তা-ই। — মূর্তি চিত্র কবিতা নাটক, তা রচয়িতারই অনুভূতির প্রকাশ, রচয়িতারই নিগূঢ় নিজত্বের অভিব্যক্তি, এবং সেই হিসাবেই তার মূল্য। পূর্বেই বলেছি, প্রথম দাবিটা খণ্ডন-সমর্থনের বাইরে। প্রশ্ন হ'লো দ্বিতীয় দাবিটাকে নিয়ে। স্রষ্টার অনুভূতিপ্রকাশেই কি শিল্পবস্তুর শিল্পত্বের মাপকাঠি ?

এ-সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে প্রকাশ কথাটিকে একটু বিশ্লেষণ ক'রে দেখা দরকার। বিশেষত ইংরেজি এক্‌স্‌প্রেশন কথাটিকে, প্রকাশ শব্দটিকে যার অনুবাদ ব'লে আমরা সাধারণত মনে ক'রে থাকি। পাশ্চাত্য এক্‌স্‌প্রেশনিস্টরা প্রকাশ বা এক্‌স্‌প্রেশন কথাটির দ্বারা ঠিক কী জিনিস বোঝাতে চান ?

এক্‌স্‌প্রেশন কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'লো টিপে বা চেপে বার করা (ex premo, press out)। যেমন ক'রে রস বার করে, টিউব থেকে পেস্ট বার করে। এ থেকে অর্জিত অর্থ হ'লো, আন্তর-ব্যাপারকে বাইরে নিয়ে আসা, আন্তর-সত্যকে বাইরে রূপ দেওয়া। ব্যঞ্জনা থেকে বাড়তি অর্থ পাওয়া গেলো — একটা-কিছুকে অপর-কিছু দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া। ক্রমে — চিহ্ন, প্রতিনিধি, প্রতীক ইত্যাদি। দেশি প্রকাশ কথাটার মূল মানে হ'লো বিশেষভাবে দীপ্তি পাওয়া।

কালক্রমে দেশি প্রকাশ এবং ইংরেজি এক্‌স্‌প্রেশন দুয়েতেই অনেক নতুন অর্থের সংযোজনা ঘটেছে এবং দেশি প্রকাশ অনেকখানি পরিমাণে ইংরেজি এক্‌স্‌প্রেশনের প্রতিশব্দ ব'লে গণ্য হয়েছে। বর্তমানে এদের ব্যবহার বহু-বিচিত্র। সূর্যের আলোতে বস্তুর প্রকাশ, ছিন্নমেঘে সূর্যের প্রকাশ, আবার, সূর্য নিজে-নিজেই নিজের প্রকাশ। সাহিত্যের এক-একটা এক্‌স্‌প্রেশন বলিষ্ঠ, এক-একটা এক্‌স্‌প্রেশন দুর্বল; কোনোটা সুন্দর, কোনোটা কুৎসিত। অন্যদিকে, গণিতের বা লজিকের এক্‌স্‌প্রেশন যারা কিনা অত্যন্ত জটিল সম্পর্ককে প্রকাশ করতে পারে, তারা সব সময় অতিশয় নির্বিকার। সর্দি হ'লে হাঁচির প্রকাশ হয়, আবার বলি — হাঁচিতে সর্দির প্রকাশ। যেমন বলি, বসন্তরোগে দেহে গুটিকার প্রকাশ, আবার, গুটিকাতেই বসন্তের প্রকাশ। মৌনে সম্মতির প্রকাশ, পলায়নে ভীরুতার প্রকাশ, আবার, স্বাক্ষরে সম্মতির প্রকাশ, ভোটে ইচ্ছার প্রকাশ, বিশেষে সামান্যের প্রকাশ, রূপে অরূপের প্রকাশ, পেয়াদায় রাজশক্তির প্রকাশ, — ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। দেখা যাচ্ছে, সবরকম প্রকাশ এক নয়। কখনো তা চিহ্ন বা লক্ষণ, কখনো অনুমিত সিদ্ধান্ত, কখনো প্রতীক, কখনো-বা নিছক রূপ। প্রশ্ন হচ্ছে, শিল্পবস্তু ঠিক কোন্ অর্থে স্রষ্টার অনুভূতিকে বা স্রষ্টার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অনুভূতিপ্রকাশ আর আত্মপ্রকাশ অঙ্গাঙ্গী। ও দুই প্রায় একই কথা, বিশেষত রোমান্টিক থিয়োরিতে। আত্মপ্রকাশের কথাটাকে নেপথ্যে

রেখে, কাজের সুবিধার জন্য আপাতত অনুভূতিপ্রকাশকে অবলম্বন ক'রেই আমরা আমাদের আলোচনায় অগ্রসর হবো। অর্থাৎ, 'শিল্পবস্তু অনুভূতির প্রকাশ' — এ-কথা প্রকাশবাদীরা কী অর্থে বলেন, এখন সেইটেই আমাদের প্রাথমিক আলোচ্য বিষয়।

প্রকাশবাদীরা বারবার বলেছেন, শিল্পবস্তু অনুভূতির চিহ্ন, লক্ষণ বা 'সিম্পটম' নয়। প্রকাশের এ-অর্থ এখানে অচল। চিহ্ন থেকে যেভাবে চিহ্নিতকে অনুমান করা হয়, অনুভূতি শিল্পবস্তুতে সে-রকম অনুমানের ব্যাপার নয়। অনুভূতি শিল্পবস্তুতে প্রত্যক্ষগোচর।

প্রকাশকে এখানে প্রতীক অর্থে গ্রহণ করা যায় কি? শিল্পবস্তু কি স্রষ্টার অনুভূতির প্রতীক, রাষ্ট্রীয় পতাকা যেমন রাষ্ট্রশক্তির অথবা নাম যেমন নামীর প্রতীক? প্রকাশবাদীদের এতেও আপত্তি। কেননা, এখানেও সেই প্রত্যক্ষগোচরতার প্রশ্ন ওঠে। 'সিম্বল্'-এ যদি 'সিম্বলাইজড' সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত না-থাকে, তা হ'লে আর্টকে সিম্বল্-ই বা বলা যায় কীভাবে?

প্রকাশবাদীরা অনুভূতির সাক্ষাৎ-উপস্থিতি চান। দেখতে হবে, এখানে সাক্ষাৎ-উপস্থিতি মানেটা কী। জলের নলে যে-জল থাকে, কলের মুখ খুলে দিলে সেই জলেরই প্রকাশ হয়। এই হ'লো সাক্ষাৎ উপস্থিতি। নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা থেকে যে-নির্যাসের প্রকাশ, সে সাক্ষাৎভাবেই উপস্থিত। আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে যে-লাভা অদৃশ্য ছিলো, হুবহু সেই লাভাই তার আধারকে শূন্য ক'রে বাইরে বেরিয়ে আসে। সে-ও নিঃসংশয়ে সাক্ষাৎ। কবির হৃদয়-ভাণ্ডারে যে-অনুভূতিটি সংগুপ্ত ছিলো, হুবহু সেই অনুভূতিটিই কি কবির হৃদয়-ভাণ্ডার থেকে সশরীরে নির্গত হ'য়ে দৃশ্যমানরূপে বাইরে এসে দাঁড়ায় — উক্ত হৃদয়-ভাণ্ডারকে খালি ক'রে দিয়ে? এবং বাইরে এসেই 'কাব্য' উপাধি অর্জন করে?

এ-কথা মানা কঠিন। অনুভূতি জিনিসটা অশরীরী, আর্ট শরীরী। অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী, আর্ট নিত্য। অনুভূতি চঞ্চল, আর্ট স্থির। অনুভূতি ব্যক্তিবদ্ধ, আর্ট সর্বজনবেদ্য। কবির হৃদয়স্থিত অনুভূতি আর বাইরে প্রকাশিত শিল্পবস্তু, এ দুয়ের মধ্যে চরিত্রগত ব্যবধান দুস্তর। তৎসত্ত্বেও কি বলবো, ওরা হুবহু এক? কোন্ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বলে এদের একত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় হ'তে পারছি?

আর যদি তর্কস্থলে মেনেই নিই যে, এরা হুবহু এক — কবি-হৃদয়ের অনুভূতি আর সর্বজন-আস্বাদ্য শিল্পবস্তু যথার্থ ই অভিন্ন, তা হ'লেই কি সব সমস্যা মিটে যায়? তা মেটে না। কেননা, সে-ক্ষেত্রে স্রষ্টার ভূমিকা — তাঁর প্রতিভা কল্পনাশক্তি এ-সব একদম অর্থহীন হ'য়ে পড়ে। স্রষ্টার কাজ রইলো কতোটুকু? অনুভূতিকে ঢেলে

দেওয়া? কাঁচা অনুভূতিকে সরাসরি উদ্‌গীরণ ক'রে দিতে পারলেই তা আর্ট হ'য়ে গেলো?

কোনো-কোনো রোমান্টিক লেখক অবশ্য এইরকম ঢেলে দেবার কথাই বলেছেন। সেই-যে বায়রন বলেছিলেন, কবিতা হচ্ছে "the lava of the imagination whose eruption prevents an earthquake", এ হ'লো অনেকটা সেই জাতের কথা। মানতে আপত্তি ছিলো না, কিন্তু সৃষ্টি কথাটা এখানে একেবারেই মানায় না। তা ছাড়া, এইরকম একটা জৈব-স্তরের ব্যাপারকেই কি তা হ'লে প্রকাশ ব'লে মানতে হবে? খাঁটি প্রকাশবাদীরা এইরকম একটা স্থূল মতবাদকে কখনোই সমর্থন করতে পারেন না। এমন কোনো মতই তাঁরা পোষণ করতে পারেন না, যাতে কল্পনাশক্তি ও কবিপ্রতিভার অনুমাত্র মর্যাদাহানি ঘটে।

তবে কি শিল্পবস্তু অনুভূতিকে প্রকাশ করে নিজে অনুভূতির বাহক হ'য়ে? অর্থাৎ এই কি বলবো যে, শিল্পবস্তু অনুভূতি-মণ্ডিত, অনুভূতি-সিক্ত অথবা অনুভূতি-সমন্বিত? কিন্তু কথাটার অর্থ কী দাঁড়ালো? শিল্পবস্তু একটা জিনিস, আর অনুভূতি আর-একটা জিনিস? এ দুই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে? শিল্পবস্তু নিজেই সম্পূর্ণ, অনুভূতি একটা বাহ্য সংযোজন মাত্র? তা ছাড়া, অনুভূতির মতো মনোলোকের বাসিন্দা, সে কী ক'রে গিয়ে একটা বাহ্য-বস্তুর সঙ্গে অন্বিত হয়? ব্যক্তির মনেই যার অধিষ্ঠান, বস্তুর দেহে সে কী ক'রে অধিষ্ঠিত হয়, তা বোঝা কঠিন। পিরামিড কিংবা তাজমহল সামনে কোনো দর্শক না-থাকলেও কি একা-একাই অনুভূতিতে টস্‌টস্‌ করতে থাকে? কাব্যগ্রন্থ কি পাঠক-নিরপেক্ষভাবেই অনুভূতিতে সিক্ত হ'য়ে থাকে?

যার কাছে প্রকাশ হচ্ছে, তাকে ছাড়া প্রকাশ কথাটা অর্থহীন, তা সে-প্রকাশ বলতে যা-ই বুঝি-না কেন। অনুভূতিপ্রকাশ বললেও এর ব্যক্তিক্রম হবে না। প্রকাশিতব্য অনুভূতির অধিষ্ঠান হ'লো স্রষ্টার মন। প্রকাশিত বস্তুটি যদি অনুভূতিই হয়, অথবা যদি অনুভূতি-সমন্বিতও হয়, তো সেই অনুভূতিরও একটা অধিষ্ঠান-ভূমি চাই। ভোক্তার মনই সেই অধিষ্ঠান-ভূমি, শিল্পবস্তু নিজে নয়। প্রকাশের প্রশ্নে ভোক্তাকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না।

রোমান্টিক লেখকেরা অনেক সময় আর্টের প্রশ্নে ভোক্তার ভূমিকাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার চেষ্টা ক'রে থাকেন। শিল্পবিচারে থিয়োরিকে তাঁরা পুরোপুরিই স্রষ্টা-কেন্দ্রিক রাখতে চান। স্রষ্টার অনুভূতি কতোটা গভীর ব্যাপক ও তীব্র, এবং শিল্প-বস্তুতে তা কতোটা যথাযথ প্রকাশিত হয়েছে, তারই মানদণ্ডে তাঁরা শিল্পের মূল্য-বিচার করতে চান। এ-ক্ষেত্রে, শিল্পবস্তুতে স্রষ্টার অনুভূতিকে (বা তার কোনো

নিঃসংশয় রূপান্তরকে) সাক্ষাৎভাবে পাওয়া একেবারে অবশ্য-প্রয়োজনীয়। নচেৎ শিল্পবিচারে ভোক্তার অনুভূতিকে কিছুতেই বাদ দিয়ে চলা সম্ভব হয় না।

কিন্তু এর, অর্থাৎ ভোক্তাকে বাদ দেওয়ার, ভীষণ একটা অসুবিধা আছে। সমালোচকের পক্ষে স্রষ্টার অনুভূতিকে সরাসরি জানতে পারার কোনো উপায়ই নেই। স্রষ্টার অনুভূতিকে মাপার উপায়টা কী? সমালোচকের সামনে আছে কাব্য, কবি নয়। কবির অনুভূতিকে জানলে তাই দিয়ে কাব্যে প্রকাশিত অনুভূতিকে হয়তো যাচাই করা যায়। অন্যদিকে, কাব্যে প্রকাশিত অনুভূতির সঠিক হদিশ পেলে, তাই থেকে কবির অন্তরের অনুভূতি সম্পর্কে অনুমানও হয়তো একটা করা চলে। কিন্তু দুটো ক্রিয়াকে এক সঙ্গে জড়ানো যায় না। যেমন দু-জন দরিদ্র লোক পরস্পরের কাছ থেকে ধার ক'রে ধনী হ'য়ে উঠতে পারে না। কাব্য থেকে কবির অনুভূতিকে অনুমান ক'রে নিয়ে, তারপর সেই অনুমিত অনুভূতি দিয়েই আবার কাব্যে প্রকাশিত অনুভূতির যথার্থতা বিচার করবো, তা হয় না। শিল্প-বিচারকে একান্তভাবে স্রষ্টা-কেন্দ্রিক করলে প্রকাশবাদী শিল্পতত্ত্ব এই ভ্রান্তিচক্র কিছুতে এড়াতে পারে না।

ভোক্তার কথা বলতেই হয়। কাজেকাজেই কমিউনিকেশনের কথাও এসে পড়ে। বলতে হয়, প্রকাশ ও কমিউসিকেশন অচ্ছেদ্য। অথবা বলতে হয়, কমিউনিকেশনই প্রকাশ। প্রকাশিতব্য অনুভূতি স্রষ্টার মনে, প্রকাশিত অনুভূতি ভোক্তার মনে। শিল্পবস্তুর কাজ হ'লো এক মন থেকে অপর মনে অনুভূতিকে পৌঁছে দেওয়া। অনুভূতির খেয়া-পারাপার ক'রে দেওয়া — অনুভূতির সংবহন বা সংক্রমণ। প্রকাশ-বাদীরা বেশিরভাগ সেই কথাই বলেন।

এই সংবহন বা কমিউনিকেশন ব্যাপারটাকে একটু বুঝে দেখা দরকার। এখানে সংবাহিত হচ্ছে কী বস্তু? রূপ নয়, ধ্বনি নয়, স্পর্শ নয়, অর্থ নয় — এরা শিল্পবস্তুরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সুতরাং বাহন মাত্র। এদের কাঁধে চ'ড়ে যা সংবাহিত হচ্ছে তা হ'লো অনুভূতি। ডাকগাড়ির কাঁধে চ'ড়ে চিঠি প্রেরকের হাত থেকে প্রাপকের হাতে সংবাহিত হয়, টেলিফোনের তারের মধ্যে দিয়ে এক প্রান্তের ধ্বনি অন্য প্রান্তে সংবাহিত হয়, নলের মাধ্যমে এক প্রাপকের চৌবাচ্চার জল অন্য চৌবাচ্চায় সংবাহিত হ'তে পারে — অনুভূতির সংবহন ঠিক সেইরকম একটা ব্যাপার কি? অনুভূতি তার বাসস্থান পরিত্যাগ ক'রে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে কি? এবং সেই বাস্তুত্যাগী অনুভূতির পক্ষে অপর-একটা মনের মধ্যে ঢুকে পড়া এবং পুনর্বাসনলাভ করা সম্ভব কি?

এর অসম্ভাব্যতার কথা অনুভূতির সাক্ষাৎ-উপস্থিতির প্রসঙ্গে পূর্বেই কিছুটা আলোচিত হয়েছে। স্রষ্টার অনুভূতি একটা বিশিষ্ট মনের সুনির্দিষ্ট অনুভূতি, ভোক্তার

সংখ্যা অনির্দিষ্ট। স্রষ্টার অনুভূতি সীমাবদ্ধ, শিল্পবস্তুর আবেদন (অনুভূতি উদ্রেক করার ক্ষমতা) দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ নয়। তা ছাড়া, অনুভূতি জিনিসটা এমনই একান্ত-ভাবে ব্যক্তিগত, তা অনুভবকারীর জীবনেতিহাসের এমনই অচ্ছেদ্য অঙ্গ যে তাকে সেখান থেকে উপড়ে নিলে তা আর অনুভূতিই থাকে না। আসলে, অনুভূতি দেওয়াও যায় না, নেওয়াও যায় না। সুতরাং আক্ষরিক অর্থে সংবহন এ-ক্ষেত্রে অচল। একই অনুভূতি মন থেকে মনান্তরে যাতায়াত ক'রে বেড়ায় না! অনুভূতির অধিষ্ঠান-ভূমি যখন পৃথক্, তখন অনুভূতিও পৃথক্।

প্রকাশবাদীরা বলতে পারেন, আক্ষরিক অর্থে অভিন্ন না-হয় না-ই হ'লো, সম্পূর্ণ অনুরূপ তো হ'তে পারে? স্রষ্টার মনের মধ্যে যে-অনুভূতিটা রয়েছে, শিল্পবস্তুর মধ্যস্থতায় ভোক্তার মনেও অবিকল অনুরূপ অনুভূতি তো জাগ্রত হ'তে পারে? অনুরূপ অনুভূতির উদ্রেকই কমিউনিকেশন, তারই নাম প্রকাশ।

কিন্তু অবিকল অনুরূপ হওয়াই কি সম্ভব? দুটি মন যখন পৃথক্, যে সম্পূর্ণ পৃথক্ জীবনেতিহাসদুটিতে এই অনুভূতিদুটি অচ্ছেদ্যভাবে সংবদ্ধ হ'য়ে আছে সেই জীবনেতিহাসদুটি যখন পরস্পরের অবিকল অনুরূপ নয়, তখন অনুভূতিদুটির মধ্যে যতোই আনুরূপ্য থাক-না কেন, পার্থক্যও থাকতে বাধ্য।

আরো একটা মুশকিল আছে। এই থিয়োরি অনুসারে স্রষ্টা ও ভোক্তা উভয়ের অনুভূতির আনুরূপ্যের উপরেই শিল্পবস্তুর শিল্পত্ব নির্ভর করছে — এইখানেই তার ভালোমন্দের মাপকাঠি। কিন্তু অনুভূতিদুটি যে আদৌ অনুরূপ তা জানবো কী ক'রে? দুটো অনুভূতিকে পাশাপাশি রেখে মিলিয়ে নেবার তো কোনো উপায় নেই। অনুমান? কোন্ তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করবো? তা ছাড়া, শিল্পবস্তুর শিল্পত্ব সম্পর্কে বোধ কি আমাদের অনুমানলব্ধ সিদ্ধান্ত, না, সাক্ষাৎ বোধ? স্রষ্টা এবং ভোক্তা দু-জনে পরস্পরের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রেও পরস্পরের অনুভূতির মিল বা অমিল সম্পর্কে কোনো মীমাংসা ক'রে নিতে পারবেন না। কেননা বুদ্ধিগ্রাহ্য বা আটপৌরে বর্ণনা দিয়ে নিজের অনুভূতির যথার্থ স্বরূপটি অপরকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। তা নাকি একমাত্র আর্ট দিয়েই পারা যায়। অর্থাৎ, একটা শিল্পবস্তুর শিল্পত্ব সম্পর্কে স্রষ্টার জবানবন্দী চাইলে, তিনি বড়োজোর আর-একটা শিল্পবস্তু আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু, এখানে তো আর্টকে বোঝা নিয়েই প্রশ্ন। একটা আর্টের আর্টত্ব বুঝতে যদি আর-একটা আর্টের প্রয়োজন হয়, তা হ'লে অন্তহীন আর্ট-পরম্পরা দিয়েও কখনো মীমাংসায় উপনীত হ'তে পারবো না।

রোমান্টিক প্রকাশবাদী অনুভূতিপ্রকাশ কথাটিকে যে-অর্থে বা যে-যে অর্থে গ্রহণ

করতে ইচ্ছুক, তার কোনোটিই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। এইসব বিকল্প ব্যাখ্যার প্রত্যেকটিই সমস্যাসঙ্কুল। লক্ষণীয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ এর কোনো ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করেননি। কমিউনিকেশন ব্যাপারটাকে তিনি অস্বীকার করেননি, কিন্তু অনুভূতির কমিউনিকেশনকেই তিনি প্রকাশ আখ্যা দেননি, এবং তাই দিয়েই তিনি সাহিত্যের মূল্য-নিরূপণের কথা বলেননি।

৪.

প্রকাশের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন রূপের কথা। রূপই প্রকাশ। যে-রূপ সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট, অবিসংবাদিত। যে-রূপ সুনিশ্চিত এবং সুপ্রত্যক্ষ। কিন্তু সে-রূপ কার? অনুভূতির?

অনুভূতির রূপায়ণ — আর্ট সম্পর্কে এ-কথাটা অনেকেই বলেন বটে। আর্টের ক্ষেত্রে রূপায়ণ কথাটা হয়তো একটুও অসংগত নয়, কিন্তু সে কি শুধু অনুভূতিরই রূপায়ণ? অথবা, সে কি আদৌ অনুভূতির রূপায়ণ?

বিশুদ্ধ অনুভূতি একটি অবচ্ছিন্ন কল্পসত্তা — নিছক অ্যাবস্ট্রাকশন। তার রূপ নেই, আকার নেই, অবয়ব নেই। ঘটনার আশ্রয় ব্যতিরেকে সে একটি মরীচিকা মাত্র। নিরালম্ব অনুভূতি এতোই মিথ্যাময় যে তার রূপায়ণের প্রশ্নই ওঠে না। ঘটনায়-আশ্রিত অনুভূতিই সত্য অনুভূতি, জীবনে-বিধৃত অনুভূতিই রূপ-সমন্বিত অনুভূতি। আসলে, রূপ জীবনেরই। তাই রূপায়ণও জীবনেরই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, জীবনই সাহিত্যের বিষয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রকাশ বলতে তিনি 'বিষয়ের প্রকাশ'কেই বুঝেছেন, নিছক অনুভূতিপ্রকাশকে নয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি সাহিত্যে 'ভাবপ্রকাশে'র কথা আদৌ বলেননি? ভাবপ্রকাশই কি অনুভূতিপ্রকাশ নয়?

ভাবপ্রকাশের কথা রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই বলেছেন। বলেছেন বটে, কিন্তু মোটেই রোমান্টিক অর্থে নয়, মোটেই প্রচলিত অর্থে নয়। 'ভাব' এবং 'অনুভব' দুটো কথাকেই তিনি ব্যবহার করেছেন ব্যুৎপত্তিগত অর্থে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যখন বলেন, প্রকৃত কবিতা হচ্ছে "the spontaneous overflow of powerful feelings", অথবা মিল্ যখন বলেন যে কবিতা আর-কিছুই নয়, সে হ'লো "the expression or utteringforth of feeling", তখন 'ফীলিং' বলতে তাঁরা যা-বোঝেন, রবীন্দ্রনাথ ভাব বা অনুভূতি বলতে মোটেই তা বোঝেন না। "সাহিত্যতত্ত্ব" প্রবন্ধে ('সাহিত্যের পথে', র।১৪।৩৫৫) তিনি বেশ স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন, "অনুভব মানেই হওয়া"; বলেছেন, "বাহিরের সত্তার অভিঘাতে সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন সৃষ্টিলীলায় উদ্‌বেল হয়।"

এখানে এই 'বাহিরের সত্তা' কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। বাইরের সত্তার সঙ্গে নিজের সত্তাকে যুক্ত ক'রে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠার নামই অনুভূতি। বাইরের সত্তার অভিঘাতেই 'মন সৃষ্টিলীলায় উদ্‌বেল হয়'। অর্থাৎ সৃষ্টির অপরিহার্য শর্তই হ'লো বাইরের সত্তা, এবং অনুভূতির মধ্যেই সেই বাইরের সত্তা উপস্থিত। রাবীন্দ্রিক অর্থে ভাব বা অনুভূতির প্রকাশ হ'লো — জগৎ-সত্যের মধ্যে দিয়ে আত্ম-সত্যের এবং আত্ম-সত্যের মধ্যে দিয়ে জগৎ-সত্যের রূপায়ণ। নিছক ব্যক্তিগত ফীলিং-এর রূপায়ণ নয়।

সংস্কৃত আলংকারিকেরাও ভাবপ্রকাশের কথা বলেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তাঁরা ফীলিং-এর কথাই বুঝি বলতে চান। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, সচরাচর আমরা যাকে ভাব বা অনুভূতি বলি (ইংরেজিতে যাকে ফীলিং বা ইমোশন বলা হয়), সংস্কৃত আলংকারিকেরা ঠিক-ঠিক সেই বস্তুকে প্রকাশ করার কথা মোটেই বলেননি। ফীলিং সব সময়ই ব্যক্তিগত, কিন্তু অলংকারশাস্ত্রের 'ভাব' ব্যক্তিগত ভাব নয়। অর্থাৎ কাব্যে প্রকাশিত ভাব মোটেই কবির নিজস্ব ফীলিং নয়। কাব্যের ভাব কবিরও নিজের নয়, পাঠকেরও নিজের নয়। অভিনবগুপ্ত ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে, ক্রৌঞ্চের শোকে বাল্মীকির মনে যে-বেদনা পরিপূর্ণকুম্ভোচ্ছলনবৎ উচ্ছলিত হ'য়ে কবিত্বপ্রাপ্ত হ'লো, তা লৌকিক শোক থেকে ভিন্ন, তা আস্বাদ্যমানতা-প্রাপ্ত করুণ রস। মুনির দিক থেকে তা স্বচিত্তবৃত্তির আস্বাদন, পাঠকের দিক থেকেও তা-ই। 'রামায়ণ' শোকের কাব্য, কিন্তু সে-শোক লৌকিক শোক নয়। এবং শোক মোটেই বাল্মীকির নিজের নয় ('ন তু মুনেঃ শোক ইতি মন্তব্যম্' — অভিনবগুপ্ত)। 'শকুন্তলা' নাটকে শৃঙ্গার রস আছে, কিন্তু রতি-ভাব কালিদাসের নিজের নয়। কাব্যের ভাব — কী কবি কী পাঠক, কারোই নিজের নয়. আবার কারো কাছেই তা সম্পূর্ণভাবে পরেরও নয়। বিশ্বনাথ বলেছেন, 'পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ'।

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে 'সাধারণীকরণ'-এর উপর অনেকেই খুব জোর দিয়েছেন। পুরোপুরি না-হোক্, এই তত্ত্বের মূল ভাবটি রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনেও অনুপস্থিত নয়। তিনি বলেছেন, আর্টের কাজই হ'লো ভাবকে সকলের ক'রে দেওয়া। সাহিত্যের ভাব শুধু বিশিষ্টই নয়, তা সর্বজনীনও বটে।

যাকে 'সাধারণীকরণ' বলি, তার একটা ঐতিহাসিক অথবা সামাজিক ভিত্তিভূমির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে রবীন্দ্রনাথ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত করেছেন। সমাজবদ্ধ মানুষ একটি সর্বগত উৎস থেকে প্রতিনিয়ত প্রাণরস মনোরস আহরণ ক'রে চলেছে।

সে-দিক থেকে, যাকে একান্তই ব্যক্তিগত ভাব ব'লে মনে করি তারও একটা সামাজিক পরিচয় আছে, সর্বজনীন সত্তা আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, রচনা যদিও লেখকেরই, ভাব কারো নিজস্ব সম্পত্তি নয়। ভাব সমাজের সম্পত্তি, মানুষের ইতিহাসের সম্পত্তি, — 'সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মন'-এর সম্পত্তি।

"মানুষের সাহিত্যে যে-একটা ভাবের সৃষ্টি চলিতেছে তাহার স্থিতিগতির ক্ষেত্র অতি বৃহৎ—।"[৩] "সাহিত্যের সামগ্রী" প্রবন্ধে ('সাহিত্য', র।১৩।৭৪৩) তিনি স্পষ্ট ক'রে বলেছেন, "ভাব সাধারণ মানুষের।...সাধারণের জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।" সাহিত্যের ভাব বিশিষ্ট এবং মূর্ত, কিন্তু ব্যক্তিগত নয়। "ভাব... মনুষ্যসাধারণের, কিন্তু তাহাকে বিশেষ মূর্তিতে সর্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায়রচনাই লেখকের কীর্তি।" ("সাহিত্যের সামগ্রী", 'সাহিত্য', র।১৩।৭৪৩)

একটা জিনিস এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রোমান্টিক সাহিত্যশাস্ত্রীদের ঝোঁক ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশের দিকে, অতি-বিশেষীকরণের দিকে।[৪] রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্টতার কথা বেশ জোর দিয়েই বলেছেন, কিন্তু অতি-বিশেষীকরণের ঝোঁকটা তাঁর নেই। নেই ব'লেই, রোমান্টিক শিল্পভাবনার প্রচুর সূত্রকে আত্মসাৎ ক'রেও, রোমান্টিকতার তত্ত্বগত পরিণামকে তিনি অনায়াসে এড়িয়ে যেতে পেরেছেন।

৫.

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিশেষভাবে সৃজনক্রিয়ার প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টার আত্মপ্রকাশের কথাটা উত্থাপন করেছেন। এ-ও বলা হয়েছে যে, কথাটি যেহেতু ক্রিয়েটিভ প্রসেসের ক্ষেত্রের, সেইহেতু শিল্পবিচারকে তা সরাসরি স্পর্শ করে না।

শুধু তা-ই নয়। সৃজনক্রিয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু আত্মপ্রকাশ ব্যাপারটাতে রোমান্টিক প্রকাশবাদীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

সত্যিই কি রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশক্রিয়া আর সৃজনক্রিয়াকে সম্পূর্ণ অভিন্ন ব'লে মনে করেন? আত্মপ্রকাশমাত্রই কি তাঁর মতে সৃজন? আত্মপ্রকাশ কথাটাকে যদি প্রচলিত অর্থে বা রোমান্টিক অর্থে ধরি, তা হ'লে এ-কথা মোটেই মেনে নেওয়া যায় না।

সমস্তরকম ক্রিয়াতেই কর্তার কিছু-না-কিছু 'আত্মপ্রকাশ' ঘ'টে থাকে, ঘটতে বাধ্য। তার প্রত্যেকটিই সৃজন নয়, প্রত্যেকটিই আর্ট নয়। যেখানে কেবল আত্মপ্রকাশের

জন্যই আত্মপ্রকাশ, যেখানে আত্মপ্রকাশ ভিন্ন অন্য লক্ষ্য নেই, মাত্র সেইখানেই বলতে পারি — সৃজন। যেখানে আত্মপ্রকাশ সার্থক, অবারিত। কথাটাকে উল্টো ক'রেও বলা যায়। একমাত্র সৃজনের ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ সার্থক ও অবারিত। রবীন্দ্রনাথের মতে, এই সার্থক আত্মপ্রকাশের সব থেকে বড়ো বাধাই হ'লো আমাদের অহংবোধ। অহং-এর দেওয়ালগুলি না ভাঙা পর্যন্ত আত্মার প্রকাশ সম্ভব হয় না। সৃজন বলতে রবীন্দ্রনাথ শুধু নির্মাণই বোঝেন না, উৎসর্জনও বোঝেন। এ হ'লো অহং-এর উৎসর্জন। তাইতেই আত্মলাভ। সৃজনের ক্ষেত্রেই এই আত্মলাভ সার্থক ও অবারিত।

সৃজনপ্রক্রিয়া এই অর্থেই আত্মপ্রকাশ-প্রক্রিয়া। প্রচলিত আত্মপ্রদর্শন অর্থে নয়, আত্মসিদ্ধি অর্থে। তার মধ্যে দিয়ে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে স্রষ্টা যোগযুক্ত। যেখানে কিনা রোমান্টিক আত্মপ্রকাশবাদের মুখ্যতম কথাই হ'লো নিজত্ব-প্রকাশ — অহং-এর প্রকাশ।

ঊনবিংশ শতকের রোমান্টিক কবিদের সঙ্গে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের মনের সুগভীর মিল অনেকেই লক্ষ করেছেন। এ-মিল যে অত্যন্ত স্পষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের কাব্য সম্পর্কে আলোচনার প্রসঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যে-সব মন্তব্য করেছেন তা-ও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। "আধুনিক কাব্য" প্রবন্ধে ('সাহিত্যের পথে', র৷১৪৷৩৪২) তিনি উক্ত কবিদের বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা ক'রে বলেছেন যে, তাঁদের কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণই হ'লো 'ব্যক্তিগত খুশির দৌড়'। বলেছেন,

"তাঁরা বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখেছিলেন, জগৎটা হয়েছিল তাঁদের ব্যক্তিগত। আপন কল্পনা মত ও রুচি সেই বিশ্বকে যে কেবল মানবিক ও মানসিক করেছিল তা নয়, তাকে করেছিল বিশেষ কবির মনোগত। ওয়ার্ডস্বার্থের জগৎ ছিল বিশেষভাবে ওয়ার্ডস্বার্থীয়, শেলির ছিল শেলীয়, বাইরনের ছিল বাইরনিক।"

উদ্ধৃতিটিতে ওই যে 'বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে' দেখার কথা এবং 'বিশ্বকে মানবিক ও মানসিক' করার কথা আছে, যা সব কালের সব কবিই ক'রে থাকেন, ঐটুকু রবীন্দ্রনাথের নিজের সাহিত্যতত্ত্বের দ্বারাও সমর্থিত। কিন্তু জগৎটাকে 'মানবিক ও মানসিক' করা এক কথা, আর জগৎটাকে ব্যক্তিগত করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। কাব্যের জগৎকে 'বিশেষ কবির-মনোগত' ক'রে তোলা, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — 'কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা', এ-জিনিসকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ ব'লে গণ্য করেননি। ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে, এইরকম একটা 'ব্যক্তিগত খুশির দৌড়' এবং সেই সঙ্গে একটা 'বিষয়ীর আত্মতা'-মূলক মতবাদ যে তৎকালের সাহিত্যে অনিবার্য ছিলো — এমন-কি প্রয়োজনীয়ও ছিলো, সে-কথা তিনি অস্বীকার করেননি।

কিন্তু তত্ত্বগতভাবে এ-বস্তু তাঁর সমর্থন পায়নি। রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের রোমান্টিক কবিদের রচনার ইন্দ্রজালশক্তির তারিফ করেছেন, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে তাঁদের বিদ্রোহকে অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন করেছেন, কিন্তু বিদ্রোহের উন্মাদনায় তাঁদের শিল্পভাবনার যে একটা আতিশয্য ও অপরিণতমনস্ক ভাবের সঞ্চার হয়েছে, এ-কথাও তিনি বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন।

ব্যক্তিত্বের কথা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন। কিন্তু রোমান্টিকদের দ্বারা আদৃত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে (অর্থাৎ ব্যক্তিতন্ত্রবাদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে) রবীন্দ্রনাথ-কথিত ব্যক্তিত্বের যোগ কম। বহুধা-বিভক্ত সমাজ শিল্পীর মধ্যে যে একাকিত্ববোধের জন্ম দেয়, প্রতিকূল পরিবেশ স্রষ্টার মনে সময়বিশেষ যে-আত্মাভিমান জাগিয়ে তোলে, যে-ব্যক্তিত্বের মর্মস্থলে অহমিকার সিংহাসন মাথা তুলেছে, রবীন্দ্রনাথ সেই ব্যক্তিত্বের কথা বলেননি। রবীন্দ্রনাথ 'পার্সোনালিটির' কথা বলেছেন, কিন্তু রোমান্টিকদের মতো কোনো স্ফীতকায় অহং-কে নিয়ে — নিজে রোমান্টিক হ'য়েও কীট্‌স্ যাকে ঠাট্টা ক'রে বলেছেন "egotistical sublime" — সেই জাতীয় কোনো বিশ্বগ্রাসী আমি-কে নিয়ে তাঁর পার্সোনালিটি-তত্ত্ব গ'ড়ে ওঠেনি।[৫]

স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ যে আসলে মানবপ্রকৃতিরই আত্মপ্রকাশ তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি চিঠিতে বেশ স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে বলেছেন,

"লেখকের নিজের অন্তরে একটি মানবপ্রকৃতি আছে এবং বাহিরের সমাজে একটি মানবপ্রকৃতি আছে, অভিজ্ঞতাসূত্রে প্রীতিসূত্রে এবং নিগূঢ় ক্ষমতাবলে এই উভয়ের সম্মিলন হয়, এই সম্মিলনের ফলেই সাহিত্যে নূতন নূতন প্রজা জন্মগ্রহণ করে। সেই সকল প্রজার মধ্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি দুইই সম্বদ্ধ হয়ে আছে, নইলে কখনোই জীবন্ত সৃষ্টি হতে পারে না।" ("সাহিত্য", 'সাহিত্য', র।১৩।৮৪১)

এখানে যে লেখকের আত্মপ্রকৃতির কথা বলা হয়েছে, তা আসলে বৃহৎ মানব-প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত। সেই কথাটা আরো পরিষ্কার করার জন্য পরবর্তী একটি চিঠিতে ("মানবপ্রকাশ", 'সাহিত্য', র।১৩।৮৫৪-৫) তিনি লিখেছেন,

"আমার মনে হচ্ছে, আমার প্রথম চিঠিতে লেখকেরই নিজত্ব-প্রকাশের উপর এতটা ঝোঁক দিয়েছিলুম যে সেইটেই সাহিত্যের মূল লক্ষ্য এই রকম বুঝিয়ে গেছে। আমার বলা উচিত ছিল, লেখকের নিজত্ব নয়, মনুষ্যত্ব প্রকাশই সাহিত্যের উদ্দেশ্য (আমার মনের মধ্যে নিদেন সেই কথাটাই ছিল)।...লেখক উপলক্ষ মাত্র, মানুষই উদ্দেশ্য।"

সম্মিলিত মানবমনই নিজেকে প্রকাশ করে। লেখক সেই মানব-মহাসমগ্রতার একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি। সৃজনের নিভৃত লীলাক্ষেত্রে, যেখানে স্রষ্টাকে আমরা একাকী এবং একেশ্বর মনে করি, সেখানেও তিনি একাকী নন, একেশ্বর নন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"লেখককে আমরা যখন অত্যন্ত নিকটে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখি তখন লেখকের সঙ্গে লেখার সম্বন্ধটুকুই আমাদের কাছে প্রবল হইয়া ওঠে; তখন মনে করি গঙ্গোত্রীই যেন গঙ্গাকে সৃষ্টি করিতেছে।"[৬]

অন্যত্র :

"যেখানে সাহিত্যরচনায় লেখক উপলক্ষ মাত্র না হইয়াছে সেখানে তাহার লেখা নষ্ট হইয়া গেছে।"[৭]

পুনশ্চ :

"সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মন, মনের নিগূঢ় এবং অমোঘ নিয়মেই আপনাকে কেবলই প্রকাশ করিয়া অপরূপ মানসসৃষ্টি সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে।"[৮]

সৃজনক্রিয়ায় স্রষ্টাকে উপলক্ষ্য ক'রে সমগ্র মানবতারই আত্মপ্রকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন মানবপ্রকাশ।

৬.

দেখা যাচ্ছে, সৃষ্ট শিল্পবস্তুটি যা-ই প্রকাশ করুক-না কেন, রবীন্দ্রনাথের মতে সৃজনক্রিয়া মানবমনেরই আত্মপ্রকাশক্রিয়া। এ-মানুষ কোনো অমূর্ত ভাবপদার্থ নয়। এ-মানুষ বাস্তব মানুষ, ইতিহাসের মানুষ, মানবসমাজ ও মানবসংসারের মানুষ — রক্তমাংসের মানুষ।

এখানে ব'লে রাখা প্রয়োজন যে, ক্ষেত্রবিশেষে রবীন্দ্রনাথ আর-একরকমের মানুষের কথাও বলেছেন। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনকে ছাপিয়ে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি 'উদ্‌বৃত্ত' সত্তা — একটি লীলাময় সত্তা — বিরাজমান। তার স্থান জীবন-সংগ্রামের ঊর্ধ্বে, অনেকটা যেন ইতিহাসেরও ঊর্ধ্বে। সেই লীলাময় আনন্দময় মানুষটিই মানুষের মধ্যেকার সৃষ্টিকর্তা-মানুষ। সৃজনলীলায় তারই আত্মপ্রকাশ।

এই দুইধরনের উক্তির মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর পরিমাণে রবীন্দ্র-শিল্পদর্শনসম্মত, রবীন্দ্রনাথ এদের মধ্যে কোনো সমন্বয়সাধন করতে পেরেছেন কিনা, অথবা এদের সত্যিকারের কোনো পরস্পর-বিরোধিতা আছে কিনা, বর্তমানে সে-আলোচনায়

আমরা প্রবেশ করবো না। আমাদের মূল আলোচ্য সৃষ্টিপ্রক্রিয়া নয়। আমাদের মূল আলোচ্য হ'লো শিল্পবস্তু, তার স্বরূপ, তার মূল্যায়ন।

অর্থাৎ সৃষ্টিক্রিয়াতে যারই প্রকাশ ঘটুক-না কেন, সৃষ্টিতে (বা শিল্পবস্তুতে) কী প্রকাশিত হয়, শিল্পবস্তু কী প্রকাশ করে বা কাকে প্রকাশ করে, বর্তমানে সেইটেই আমাদের প্রধান বিবেচ্য।

দিক যে এখানে দুটো, এবং দিকদুটো যে সম্পূর্ণ আলাদা, তা রবীন্দ্রনাথ নিজেই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। সৃজনক্রিয়ায় সৃষ্টিকর্তার দিকটাই আসল। আর-একটা দিক ভোক্তার। সে-দিকটাতে সৃষ্টিই (অর্থাৎ শিল্পবস্তুই) আসল কথা। তিনি বলেছেন ('পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি', র।১০।৫৮৭-৮), "সৃষ্টিকর্তার দিকে বিশেষত্ব প্রতিভায়। সেটা হচ্ছে দৃষ্টির বিশেষত্ব, অনুভূতির বিশেষত্ব, রচনার বিশেষত্ব নিয়ে।" আর সৃষ্টির দিকে? "সৃষ্টির দিকে বিশেষত্ব এই তো আছে ক্যারেক্‌টার।" আর, দুটো দিককে মিলিয়ে ছবিটাকে যদি পূর্ণাঙ্গ করতে চাই, তা হ'লে? "রূপকারের রচনাতেও...স্রষ্টা ব্যক্তিটি আপন প্রতিভার স্বরূপ দিয়ে আপন সৃষ্টির রূপটিকে দ্রষ্টা ব্যক্তিটির কাছে সুনির্দিষ্ট করে দেয়।" অর্থাৎ, স্রষ্টার স্রষ্টৃত্বের চাবি তাঁর প্রতিভায়, কিন্তু ভোক্তার লক্ষ্য সৃষ্টির রূপ — ক্যারেক্‌টার। সেইখানেই শিল্পবস্তুর শিল্পত্ব।

৭.

"সাহিত্যের তাৎপর্য" প্রবন্ধে ('সাহিত্য', র।১৩।৭৩৯) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় ও মানবচরিত্র।" কথাটাকে ব্যাখ্যা ক'রে তিনি আরো বলেছেন, "বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।"

বহিঃপ্রকৃতি ও মানবচরিত্র নিয়ে যে বৃহৎ বিশ্বজগৎ, মানুষের কাছে তা আপন হৃদয়ে-প্রতিফলিত উপলব্ধিতে-বিধৃত মানবিক বিশ্ব। সাহিত্যে মানুষ ভাষা দিয়ে সেই মানববিশ্বেরই চিত্র রচনা করে। সাহিত্য এই মানববিশ্বেরই রূপকে প্রকাশ করে।

সৃজনক্রিয়ায় যেমন মানবমনের আত্মপ্রকাশ, সৃষ্ট শিল্পবস্তুতেও তেমনি মানবমন ও মানববিশ্বই প্রকাশিত হয়। তাই প্রসেস্ এবং প্রডাক্ট এই দু-রকম অর্থেই সাহিত্যকে ললিতকলাকে মানবপ্রকাশ বলা চলে। কিন্তু দুটো অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের আলোচ্য শেষেরটা।

বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিতে — জগৎ ও জীবনের মাঝখানেই মানুষ মানুষ। তাই

'নিছক-মানুষ' ব'লে কোনো নিষ্কাশিত অবচ্ছিন্ন ভাবপদার্থ নয়, জগৎ ও জীবনই সাহিত্যের বিষয়। সাহিত্য তাকেই ব্যক্ত করে, তাকেই রূপ দেয়।

বিষয়ের ব্যক্ততাই যে সাহিত্যের আসল কথা, এটা রবীন্দ্রনাথ খুব জোর দিয়েই বলেছেন। তিনি বলেছেন, সাহিত্যবিষয়কে তার নিজের রূপে ব্যক্ত হ'তে হবে। এই ব্যক্ত রূপকেই তিনি বলেছেন 'ব্যক্তি'। "সাহিত্যবিচার" প্রবন্ধে ('সাহিত্যের পথে', র।১৩।৩৪১) তিনি বলেছেন যে, সাহিত্যসমালোচনা হ'লো 'মুখ্যত সাহিত্য-বিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে'। ব্যাখ্যা ক'রে একটু আগেই বলেছেন,

"এখানে ব্যক্তি শব্দটাতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপর জোর দিতে চাই। স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তাই ব্যক্তি।...ব্যক্তিরূপের এই ব্যক্ততা সকলের সমান নয়, কেউ বা সুস্পষ্ট, কেউ বা অস্পষ্ট।...সাহিত্যের ব্যক্তি কেবল মানুষ নয়, বিশ্বের যে-কোনো পদার্থই সাহিত্যে সুস্পষ্ট; তাই ব্যক্তি, জীবজন্তু গাছপালা নদী পর্বত সমুদ্র ভালো জিনিস মন্দ জিনিস বস্তুর জিনিস ভাবের জিনিস সমস্তই ব্যক্তি।"[৯]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সৃষ্টির (শিল্পবস্তুর) দিকের আসল কথাই হ'লো ক্যারেক্টার। ব্যক্তিই ক্যারেক্টার। রূপের ব্যক্ততাই আসল কথা। "সাহিত্য-বিচার" প্রবন্ধে ('সাহিত্যের পথে') তিনি বলেছেন যে, সাহিত্য-বিষয়ের এই ব্যক্ত রূপের মূল্যবিচারই প্রকৃত সাহিত্য-বিচার। রূপের এই-যে ব্যক্ততা, এরই নাম প্রকাশ। এই দিক থেকেই তিনি বলেছেন, "সৃষ্টি মাত্রের আসল কথা হচ্ছে প্রকাশ।" ওই প্রবন্ধেই একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টাকে তিনি এইভাবে বুঝিয়েছেন,

"চৈনচিত্র-বিশ্লেষণে প্রমাণ হতে পারে যে, তার কোনো অংশে ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্রব ঘটেছে, কিন্তু সেটা নিছক ইতিহাসের কথা, সারস্বত বিচারের কথা নয়। সে চিত্রের ব্যক্তিত্বটি দেখো, যদি রূপ-ব্যক্ততায় কোনো দোষ না থাকে তা হলে সেই-খানেই তার ইতিহাসের কলঙ্কভঞ্জন হয়ে গেল।"[১১]

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নিজস্ব রূপ আছে। রবীন্দ্রনাথ বারবার 'বিষয়ের নিজত্ব' বা 'বিষয়ের আত্মতা'র কথা বলেছেন। বিষয়ের নিজস্ব রূপ —এইটেই যদি শেষ কথা হয়, তা হ'লে আর্ট নিজের বাইরে অপর কোনো সত্তার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে, এ-কথা বলার কোনো অর্থ হয় কি? নিজত্বই যেখানে আসল কথা, সেখানে রূপের সম্পূর্ণতার জন্য সে নিশ্চয়ই অপর কারো মুখাপেক্ষী নয়। তা যদি হয়, রূপ যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ ই হয়, তা হ'লে আর্টকে সত্য হ'তে হবে, এই দাবির মূল্য কী? শিল্পবস্তু জগৎ ও জীবনকে প্রকাশ করে, না, নিজেকেই প্রকাশ করে?

দেখতে হবে, নিজেকে প্রকাশ করা অর্থ কী? 'নিছক নিজত্ব' কথাটার অর্থ স্পষ্ট নয়। 'নিজত্ব' প্রত্যেক জিনিসেরই আছে। 'নিছক নিজত্ব'কে চরম ধরলে, সু-সাহিত্য কু-সাহিত্য অ-সাহিত্য — এদের মধ্যে কোনো তফাৎ করার উপায় থাকে না। যা ব্যর্থ, যা অপ-সাহিত্য কিংবা যা পুরোপুরি অ-সাহিত্য, কেউ-ই আপন নিজত্বকে লুকিয়ে রাখে না, সকলেই নির্ভুলভাবে আপন নিজত্বকে প্রকাশ করে। নিজত্ব থাকা সত্ত্বেও, নিজত্বকে প্রকাশ করা সত্ত্বেও কোনোটা আর্ট, কোনোটা নয়। নিছক নিজত্ব নয়, আরো একটা-কিছু আছে. যা দিয়ে বুঝতে পারি, কোন্‌টা আর্ট কোন্‌টা আর্ট নয়।

শিল্পবস্তুর সামগ্রিক কোনো নিজত্ব নয়, রহস্যময় কোনো অনির্বচনীয় আত্মতা নয়, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বিষয়ের আত্মতার কথা, বিষয়ের ব্যক্ত রূপের কথা — বলেছেন সাহিত্য-বিষয়ের ব্যক্তির কথা। এরা 'কেউ বা সুস্পষ্ট, কেউ বা অস্পষ্ট'। এইখানেই ব্যক্ততার মাপকাঠি। রূপটা সুস্পষ্ট সুপ্রত্যক্ষ সুনিশ্চিত হওয়া চাই। যাকে আমরা মেনে নিতে বাধ্য হই। "রূপের স্পষ্টতায় যে সুপ্রত্যক্ষ সেই রূপবান।...বিষবৃক্ষে হীরা রূপবান। হীরা আমাদের ঘুমোতে দেয় না। সে সুন্দর বলে নয়, গুণবান বলে নয়, রূপবান বলে।" ('পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি', র।১০।৫৮৮-৯) 'সাহিত্যের পথে'র "ভূমিকা"য় (র।১৪।২৯২) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইংরেজিতে যাকে বলে real, সাহিত্য আর্টে সেটা হল তাই, যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য।"

এই বাধ্যতা কিসের? উপলব্ধির। উপব্ধিতে এমন কোনো মাপকাঠি, এমন কোনো আদর্শ তা হ'লে নিশ্চয়ই আছে যার দরুন আমরা কখনো মানতে বাধ্য হই, কখনো হই না। "মন যাকে বলে এই তো নিশ্চিত দেখলুম" ('সাহিত্যের পথে'র "ভূমিকা")। এই-যে নিশ্চিতি, এর ভিত্তি কী? মন কখন বলে নিশ্চিত দেখলাম? এই নিশ্চিতি-বোধ নিশ্চয়ই মনের খেয়ালের সৃষ্টি নয়?

মনের সত্য-বোধই এই নিশ্চিতির ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন, সাহিত্যের বিষয় মানুষ, সাহিত্যের বিষয় জগৎ ও জীবন। কিন্তু জীবনের নিজেরই তো রূপ আছে — বহু বিচিত্র রূপ-সম্ভার। "জীবন মহাশিল্পী। সে যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলছে।"[১২] গভীরভাবে অনুধাবন ক'রে দেখলে এই কথাই মনে হয় যে, জীবনের এই রূপই আমাদের সত্য-বোধের ভিত্তি। আমাদের মন তাকেই স্বীকার ক'রে নেয়, তাকেই নিশ্চিতরূপে জানে, যাকে সে সত্যরূপেও জানে।

সাহিত্যে 'রূপ' আর 'সত্যতা' অবিচ্ছেদ্য। রূপের মধ্যেই সত্য ব্যক্তিত্ব অর্জন

করে, সত্যকে অবলম্বন ক'রেই রূপ নিশ্চিতি পায়। সাহিত্য যে-রূপকে প্রকাশ করে তা আসলে জগৎ ও জীবনেরই রূপ। সেইজন্যেই সে-রূপের আর-এক নাম সত্য — truth। জীবনের প্রত্যক্ষতা সঞ্চারিত হয় ব'লেই সাহিত্যের বিষয় এমন সুপ্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে। সুপ্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সত্যই যুগপৎ truth এবং beauty।

"জীবনের আপন কল্পনার ছাপ নিয়ে আকা হয়েছে যে-সব ছবি তারই রেখায় রেখায় রঙে রঙে সকল দেশে সকল কালে মানুষের সাহিত্য পাতায় পাতায় ছেয়ে গেছে। সাহিত্যে যেখানে সত্যকার রূপ জেগে উঠেছে সেখানে ভয় নেই। চেয়ে দেখলে দেখা যায়, কী প্রকাণ্ড সব মূর্তি, কেউ-বা নীচ শকুনির মতো, মন্থরার মতো, কেউ-বা মহৎ ভীমের মতো, দ্রৌপদীর মতো—আশ্চর্য মানুষের অমর কীর্তি জীবনের চির-স্বাক্ষরিত।" ("সাহিত্যের চিত্রবিভাগ", 'সাহিত্যের স্বরূপ', র৷১৪৷৭৩৫-৬)

'জীবনের চির-স্বাক্ষরিত' — আশা করি এই কথাটাই যথেষ্ট।

এ-মতবাদকে 'অনুকরণবাদ' নামে চিহ্নিত করলে নিশ্চয়ই ভুল করা হবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন ("সাহিত্যের সামগ্রী", 'সাহিত্য', র৷১৩৷৭৪৩) "তাহা আবিষ্কার নহে, অনুকরণ নহে, তাহা সৃষ্টি।" বাস্তবের হুবহু অনুকরণের কথা তিনি কখনোই বলেননি; সে-প্রশ্নই ওঠে না। শুধু এইটুকু মনে রাখলেই আমাদের চলবে যে, অনুকরণ-বাদের মর্মগত তত্ত্বটি যে-সত্যনিষ্ঠার দিকে, যে-রিয়ালিজমের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব তার প্রতি খুব বিমুখ নয়।

১ "সাহিত্যবিচার", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৩৩৭

২ "তথ্য ও সত্য", 'সাহিত্যের পথে', র।১৪।৩১৫

৩. "সাহিত্যসৃষ্টি", 'সাহিত্য', র।১৩।৭৯৩

৪. রোমাণ্টিকতার অন্যতম পুরোহিত নোফালিসের একটি উক্তি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে : "The more personal, local, peculiar, of its own time, a poem is, the nearer it stands to the centre of poetry."

৫. রোমাণ্টিসিস্ট সাহিত্যতত্ত্বের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ফ্রে. শ্লেগেলের একটি উক্তি এখানে উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে : "It is precisely individuality that is original and eternal thing in men", এবং সেই কারণে "The cultivation of this individuality, as one's highest vocation, would be a divine egoism"।

৬. "সাহিত্যসৃষ্টি", 'সাহিত্য', র।১৩।৭৯৩

৭. "বিশ্বসাহিত্য", 'সাহিত্য', র।১৩।৭৭১

৮. "সাহিত্যসৃষ্টি" 'সাহিত্য', র।১৩।৭৯৩

৯. র।১৪।৩৩৬

১০. র।১৪।৩৩৭

১১. র।১৪।৩৩৮

১২. "সাহিত্যের মূল্য", 'সাহিত্যের স্বরূপ', র।১৪।৪৫৩

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-রচনাবলী	জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ ১৫ খণ্ড
Sadhana	Macmillan
Creative Unity	,,
Personality	,,
Man	Andhra University
Religion of Man	Allen & Unwin
Religion of an Artist	Visva-Bharati

অন্যান্য গ্রন্থকার

অতুলচন্দ্র গুপ্ত, 'কাব্যজিজ্ঞাসা' (বিশ্বভারতী)

আনন্দবর্ধন-অভিনবগুপ্ত, 'ধ্বন্যালোক ও লোচন', অনু. ও স. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং কালীপদ ভট্টাচার্য (এ. মুখার্জী)

প্রবাসজীবন চৌধুরী, 'রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন' (,,)

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'বাংলা সমালোচনা পরিচয়' (,,)

—, 'রবীন্দ্রনাথ' (এম. সি. সরকার)

—, "সাহিত্যতত্ত্ব বিচারে রবীন্দ্রনাথ", 'রবি প্রদক্ষিণ', স. চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (বসুধারা)

Aristotle, *The Art of Poetry*, tr. I. Bywater (O.U.P.)

Beardsley, M., *Aesthetics : from Classical Greece to the present*, (Macmillan, N.Y.)

Bosanquet, B., *The History of Aesthetics* (Allen & Unwin)

Bradley, A. C., *Oxford Lectures on Poetry* (Macmillan)

Cassirer, E., *Essay on Man* (Yale University)

Coleridge, S. T., *Biographia Literaria*, ed. J. Shawcross (O.U.P.)

Croce, B., *Aesthetics*, tr. D. Ainslie (Peter Owen)

De, S. K., *History of Sanskrit Poetics* (Firma K. L. M.)

Hospers, J., *Meaning and Truthin Arts* (Univ. of N. Carolina Press)

Kane, P. V., *History of Sanskrit Poetics* (Nirnayasagar)

Kant, I., *Critique of Judgment*, tr. Meredith (O.U.P.)

Keats, J., *Letters*, ed. M. B. Forman (O.U.P.)

Langer, S., *Feeling and Form* (Charles Scribner's Sons)

Osborne, H , *Aesthetics and Criticism* (Routledge & Kegan Paul)

Plato, *Republic*, tr. Cornford (O.U.P.)

Rader, M., ed. *A Modern Book of Aesthetics* (Holt, Reinhert & Winston)

Schiller, F., *On the Aesthetic Education of Mankind* (Routledge & Kegan Paul)

Sen Gupta, S. C., *Towards a Theory of the Imagination* (O.U.P.)

Sparshott, F. E., *The Structure of Aesthetics* (Routledge & Kegan Paul)

Weitz, M., ed. *Problems in Aesthetics* (Macmillan)

Wellek, R., *A History of Modern Criticism*, vols I & II, (Yale University)

Whitehead, A. N., *Process and Reality* (Macmillan)

Wordsworth, W., Preface (1800), *The Lyrical Ballads* (O.U.P.)

নির্দেশিকা

অথর্ববেদ ৫১
'অন ইস্থেটিকএডুকেশন অব ম্যান' ৫৮
"অব ট্র্যাজেডি" ৭৭
অভিনবগুপ্ত ৬৯, ৭০, ২৪৭
অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী ৬, ১১০
আইনফ্যূহলুঙ্গ (Einfühlung) ২৯
আইনস্টাইন ৯, ১০, ১০৬, ২০২
'আত্মপরিচয়' ৭
আনন্দবর্ধন ৬৯, ৭০
'আনা কারেনিনা' ১৫২
"আধুনিক কাব্য" ১৮, ৯০, ২৪৯
'আধুনিক সাহিত্য' ৭, ৩৪, ১৫৯, ১৯৬, ১৯৯, ২০২, ২১২, ২১৪, ২৩১
"আমি" ১৬৭
আর্ট ফর আর্টস্ সেক ২৩, ৯২
আলোয়ার ৫৮
'ইন্ট্রোডাকশন টু মেটাফিজিক্স' (অনু. হিউম, টি. ই.) ৪৩
ইস্থেট্, ইস্থেট্-কান্ট্ ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৯২, ১০৭, ১১২
ইয়ং ৩২
উজ্জ্বলনীলমণি ৫০
উপনিষদ্, ঔপনিষদিক ২, ৪, ৪৬, ৪৮, ১৪৪, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ২২১
"উপহার" ১০৯
"উর্বশী" ১৫২
একজিস্টেন্শিয়ালিস্ট ৬৭
এম্প্যাথি ২৯
এম্পিরিক্যাল ৩১
এ্যাডিসন ৩২
এ্যাব্সার্ড ৬৭
এ্যারিস্টট্‌ল, অ্যারিস্টট্‌ল, এ্যারিস্টট্‌ল-পন্থী ৫২, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৮, ৬৯, ৭৫, ৭৮, ৭৯, ৮৩, ৮৫, ৯৭, ১০৫, ২৩৬
"ওড্ টু এ নাইটিঙ্গেল" ২২৬
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, ওয়ার্ডস্বার্থ, ওয়ার্ডস্বার্থীয় ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৯, ৪৩, ২৪৬, ২৪৯
'ওয়েটিং ফর গোডো' ১৫২
ওয়াইল্ড, অস্কার ১৮১, ২০২
'ঋতুসংহার' ১৮৪
'কঙ্কাবতী' ২১৪
কবিকঙ্কণ, কবিকঙ্কণ চণ্ডী ২০, ২১
"কবির কৈফিয়ৎ" ৪৮
'কনসেপ্ট অব রস, দি' ২৩১
'কল্পনা' ১৮৪
কাণ্ট ৩২, ৩৩, ৩৫, ৫৩, ৫৪, ৫৫
"কাদম্বরী চিত্র" ২১২, ২১৩
কার্লাইল ২০২
"কাব্যের উপেক্ষিতা" ১৫২, ২১৩
'কালান্তর' ১৯৩
কালিদাস ৭০, ১৬১, ২৪৭
'কিং লিয়ার' ১৫২
কীট্স্ ৩৩, ৩৬, ৭৪, ৯২, ৯৩, ১৬১, ১৮৪, ২০৩, ২২৬, ২৫০
"কুমারসম্ভব" ২২৭
"কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা" ১৫২, ২১৩
"কুমারসম্ভবগান" ১৮৪
কেসিরের, আর্নস্ট ১০৯
কোল্‌রিজ ৩০, ৩৩, ৩৪, ৩৫
কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ২৩১
"কৃষ্ণচরিত্র" ১৫২, ২১৪, ২১৫

ক্রাচ, জে. ডবলিউ. ৭৭
'ক্রিয়েটিভ ইউনিটি' ৭
'ক্রিয়েটিভ ইভলিউশন' (অনু. মিচেল, আর্থার) ১৫
ক্রেন, আর. এস. ২৩১
ক্রোচে ১৬১, ২৩১
'গীতবিতান' ৫৮, ১২৪
গ্যেটে ১৩৬, ১৩৯, ১৬১, ২০২, ২১৩, ২৩৭
'গৃহদাহ' ১৫২
'গ্রীক ট্র্যাজেডি' ৭৭
'চণ্ডালিকা' ১৫২
"চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি" ২৮, ৪৩, ২১২
চ্যাপ্‌ম্যান ১০৪
চিকাগো গোষ্ঠী ২৩১
'চৈতালি' ১৮৪
'চৌরপঞ্চাশিকা' ১৮৪
'ছবি ও গান' ২১৭
'ছিন্নপত্র', 'ছিন্নপত্রাবলী' ৭
জগন্নাথ ৪১
জনসন ৩১
'জাপানযাত্রী' ৭
'ট্র্যাজিক ফ্যালাসি, দি' ৭৭
ডারউইন ৫১, ১৪৬
"ডি প্রোফণ্ডিস" ২১২
"তথ্য ও সত্য" ৫৮, ১০৯, ১২৪, ১৩০, ১৯৬, ২৫৬
'তপতী' ২১৮
তৈত্তিরীয় ২, ৪৬
"দেখা" ৪২
'ধ্বন্যালোক' ৬৯
নব্য-এ্যারিস্টট্‌লীয়-গোষ্ঠী ২৩১
"নষ্টনীড়" ১৫২
নিউ ক্রিটিক, নিউক্রিটিসিজম ২৩১
নীট্‌শে ৪৩, ৬২
নোফালিস ২০২, ২৫৬
'নৌকাডুবি' ২১৭, ২১৮
'পত্রপুট' ১৪০
'পথের পাঁচালী' ১৫২
'পদ্মানদীর মাঝি' ১৫২
'পঞ্চভূত' ৭
'পরিশেষ' ১৩০
'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী' ('যাত্রী') ৭, ২৫২, ২৫৪
'পারসোনালিটি' ৫, ৭
"পূর্ণতা" ৫৮
'পূরবী' ৫৮, ১৬৭
'পেরি হুপসুস' (Peri Hypsous) ৪৩
'প্রবাসী' ১৭৪
'প্রভাতসংগীত' ২১৭
"প্রণাম" ১৩০
'প্রসেস এ্যাণ্ড রিয়ালিটি' ৫
প্রাইমারী ইম্যাজিনেশন ৩৪
'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' ২১২
'প্রাচীন সাহিত্য' ৭, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ২০০, ২১২, ২১৩
প্লেটো ৫২, ৫৮, ৭৮, ৯৬, ৯৭, ২০২, ২৩৬
'ফুলজানি' ২১৪
ফ্রয়েড ৫১, ৫২, ১৪৬
ফ্রস্ট্, রবার্ট ১০৩
ফ্রাঁস, আনাতোল ১৮০
'বউঠাকুরাণীর হাট' ২১৮
বঙ্কিমচন্দ্র, "বঙ্কিমচন্দ্র" ৩৪, ১০৯, ১৫৯, ১৯৬, ২০২, ২১৪, ২১৫, ২২৬
"বনলতা সেন" ১৫২
'বলাকা' ১৮৪
"বসন্ত রায়" ২১২
'বাংলা ভাষা পরিচয়' ৭
বাণভট্ট ২১৩
বায়রন, বাইরন, বায়রনিক ২৪৩, ২৪৯
বাল্মীকি ৭০, ১০১, ১০৩, ১০৫, ১৭৬, ২২৯, ২৪৭

'বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া' ৪৩
'বার্থ অব ট্র্যাজেডি, দি' (অনু. ফ্যাডিম্যান, সি) ৪৩
"বাস্তব" ১৮৬, ১৮৯
বেকন ৩১
বের্গসঁ ১১, ১৫, ২৮, ৪৩, ১৬১
"বিকারশঙ্কা" ২৩১
'বিচিত্র প্রবন্ধ' ১০১
বিদ্যাপতি ২২৬
"বিহারীলাল" ২১৪
বিশ্বনাথ ২৪৭
"বিশ্বসাহিত্য" ১৬০, ১৯০, ২৫৬
'বিষবৃক্ষ' ২২৬, ২৫৪
'বিসর্জন' ১৫২
'বিবিধ প্রসঙ্গ' ৭
বৃহদারণ্যক ৪৬
ব্লেক ৩৩, ৩৫, ৩৬
ব্রহ্মসূত্র ৪৬
ভামহ ১০৭
'ভারতী' ২৩১
"ভাষা ও ছন্দ" ১০১
"ভুবনমোহিনীপ্রতিভা অবসর-সরোজিনী দুঃখসঙ্গিনী" ২১২
মধুসূদন ৩৪, ৭৬, ২২৬
মনু ১০৯
মন্দির ১০১
'মডার্ন টেম্পার, দি' ৭৭
মহাভারত ১০৯, ১৭৫
"মানবপ্রকাশ" ২৫, ২৫০
"মানবসত্য" ১৬০
'মানসী' ১০৯, ১৮৪, ২১৩
'মানুষের ধর্ম' ৭, ৫১, ১৪৫, ১৬০
মারিতঁ্যা ১০০
মারী, মিডল্‌টন ১৮২
'ম্যান' ৭
"ম্যান্‌স ইউনিভার্স" ৮
মিল ২০৩, ২৭৬
মীরাবাই ৮৫
'মেঘনাদবধকাব্য' ৭৬, ২০২, ২১২
'মেঘদূত' ১৫২, ১৮২, ১৮৪, ২১২, ২১৩
'মুক্তধারা' ১৫২
যাজ্ঞবল্ক্য ১৩
'যুগান্তর' ২১৪
'রঘুবংশ' ৭০
"রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত" ১৯৩
রসগঙ্গাধর ৪১
'রক্তকরবী' ১৫২
'রাজসিংহ' ১৫২, ২১৪, ২১৫
'রাজা' ১১৫
'রাজা ও রাণী' ২১৭, ২১৮
'রামায়ণ' ১০৩, ১৭৬, ১৮৩, ১৮৪ ২১২, ২৪৭
রাসীন ১৮০
রাস্কিন ৩৩
রিচার্ডস্‌ ৯৯, ১০৭
রিপ্রোডাকটিভ ইম্যাজিনেশন ২৭
'রিলিজিয়ন অব এ্যান আর্টিস্ট, দি' ৫, ৭
'রিলিজিয়ন অব ম্যান, দি,' ৫, ৭, ৮, ১৫, ৪২, ২০২
রুশো ২০২
"রূপকার" ৭১, ২২৮
রেনল্ডস্‌ ৬২
রেনেসাঁস ৩০, ১৭৩, ২৩৫
লঙ্গাইনাস ৪৩
'ল'স্‌' (Laws) ৫৮
লাঙ্গে, কন্‌রাড ৫২, ৫৬
ডুবো, লা'বে ৭৩
'লিপিকা' ১৮৪
ল্যাঙ্গার, সুজান ১০৯
'লেটার্স্‌', কীট্‌স্‌ ৩৬
লেস্‌কি, এ্যাল্‌বিন ৭৭
'লোকসাহিত্য' ৭, ২১২, ২১৪
লোচন ৬৯, ৭০

হাচিসন ৫৪
হ্যাজলিট ৬৩
হিউম ৩২, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৭
হিষ্টরিক্যাল ক্রিটিসিজম ২৩১
হেগেল, হেগেলীয়ান ১০৭, ১৬১, ২৩৭
হোম ৫৪
হোমার ৯৫, ১৮৪
হোয়াইটহেড ২, ৩, ৫, ১৬৪
'শকুন্তলা' ২০০, ২১৩, ২৪৭
শঙ্কর শঙ্করাচার্য, ৪৭, ৫৭, ৫৮
"শাজাহান" ১৮৪
'শান্তিনিকেতন' ৭, ৪২, ২৩১
শারীরক ভাষ্য ৫২
'শিক্ষা' ৭
শিলার ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ১৬১, ২৩৭
"শুভবিবাহ" ১৯৯
শেক্‌স্‌পীয়ার ১৮০, ২২৭
শেলি, শেলীয় ৬৩, ৩৯, ২০৩, ২৪৯
শেলিং ১০৭
'শেষলেখা' ১৬৭
শোপেনহাওয়ার ৬২, ২৩৭
'শ্যামলী' ১৬৭
'শ্যামা' ৬৬
শ্লেগেল ৬৩, ২৫৬
'সমালোচনা' ৭, ৪৩
"সত্য ও বাস্তব" ৪১
সহজিয়া ৫৮, ১৬২
"সঞ্জীবচন্দ্র" ২১৪
'সাধনা', 'সাধনা'-'বঙ্গদর্শন' ৭, ২১২, ২১৬, ২৩১
সাধারণীকরণ ১৯৪, ২৪৭
'সাহিত্য', "সাহিত্য" ৩, ৬, ১৫, ২৫, ৭৬, ৮৩, ৮৫, ৮৯, ৯০, ১০৯, ১১২, ১২৫, ১৩০, ১৪০, ১৮৭, ১৮৮, ১৯০, ১৯৭, ২৪৮, ২৫০, ২৫২, ২৫৫, ২৫৬
"সাহিত্যতত্ত্ব" ২৫, ৪২, ৭২, ৭৭, ১০৯, ১৩০, ১৬৭, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৯, ২৩৫, ২৪৬
"সাহিত্যধর্ম" ১৮, ২৫, ৯০, ১৬৭
"সাহিত্যবিচার" ১৩০, ১৭৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৮, ১৯০, ২০৭, ২৫৩, ২৫৬
"সাহিত্যরূপ" ১৮, ২৫, ৭৩, ১৬০, ২২৬, ২২৭
"সাহিত্য সমালোচনা" ১৮, ২২৯
"সাহিত্যসম্মিলন" ২২৯
"সাহিত্যসৃষ্টি" ৭৬, ১৩০, ১৪০, ২৫৬
"সাহিত্যে নবত্ব" ১৮
"সাহিত্যের চিত্রবিভাগ" ২৫, ১০৯, ২০১, ২৫৫
"সাহিত্যের তাৎপর্য" ২৫, ৪২, ৪৩, ৮৫, ৯০, ১০৯, ১৪০, ২২৭, ২৫২
"সাহিত্যের বিচারক" ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৯০, ১০৯, ১৪০, ১৮৭, ১৮৮
"সাহিত্যের মূল্য" ২৫, ২০১, ২২৭, ২৩০, ২৫৬
"সাহিত্যের পথে" ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ১৮, ২৫, ৪২, ৭৩, ৪৮, ৫৮, ৭২, ৭৩, ৯০, ১০৯, ১১০, ১২৪, ১২৫, ১৩০, ১৫১, ১৬০, ১৮৫, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ১৯৯, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩১, ২৩৫, ২৪৬, ২৪৯, ২৫৩, ২৫৬
'সাহিত্যের পথে', "ভূমিকা" ৮, ১০, ১৫, ১৬, ৭১, ৭৭, ১০৯, ১১২, ১২৩, ১২৪, ১৩০, ১৬৭, ১৭৪, ১৮৬, ১৮৯, ১৯৬, ১৯৯, ২৫৪
"সাহিত্যের প্রাণ" ১৩০
"সাহিত্যের সামগ্রী" ৯০, ২৪৮, ২৫৫
'সাহিত্যের স্বরূপ' ২৫, ৪১, ১০৯, ১৮৫, ১৮৮, ১৯০, ২০১, ২২৭, ২৩০, ২৫৫, ২৫৬
সিডনি ৩১
সূফী ৫৮, ১৬২

“সৃষ্টি” ৫, ১০৯
‘সেকেণ্ড বার্থ, দি’ ৫
সেকেণ্ডারী ইম্যাজিনেশন ৩৪
‘সোনার তরী’ ২১৩
“সৌন্দর্য ও সাহিত্য” ২৫, ১১২, ১২৪
“সৌন্দর্যবোধ” ১২৪
স্ক্যালিজার ৩১, ১৭৩
‘ষ্টাডিজ ইন ফিলসফি’ ২৩১
স্নেল, আর. ৫৮
স্পিঙ্গার্ন, জে. ই. ২৩১
স্পেন্সার, হার্বার্ট ৫১
স্যাফট্‌স্‌বেরি ৫৪